লালন ফকির
কবি ও কাব্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর গ্রিফিথ স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ

নব ব্যারাকপুর

পুস্তক বিপণি

২৭ বেণিয়াটোলা লেন

কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
ঝুলনযাত্রা ১৩৬৭

The Baūl Poet Lālan : His Life and Works
[*Lalan, a mystic poet of Bengal*]
By Sanat Kumar Mitra M.A.

প্রচ্ছদ :
শ্রীমুরারি গুহ

প্রচ্ছদচিত্র :
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত লালনের রেখাচিত্র

প্রচ্ছদ আলোকচিত্রশিল্পী :
শ্রীঅজিত দাশগুপ্ত

ষ্টুডিও রূপা ॥ ৪০ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

অলঙ্করণ :
শ্রীতপন কর
কুমারী মহুয়া মিত্র

সাহিত্য প্রকাশের পক্ষে শ্রীমিতা দেবী কর্তৃক ৩০/১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীহরি প্রিন্টার্স ১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা ৪ হইতে শ্রীমতী রেখা দে কর্তৃক মুদ্রিত।

এপার এবং ওপার বাংলার মধ্যে প্রবীণতম ও অগ্রণী লোক সংস্কৃতিবিদ

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অপরাপর গ্রন্থ ঃ

* বীর বালকের কথা * বাংলার নারী * হো-চি-মিন * কমরেড লেনিন * 'প্রভাতী তারা' ডেভিড হেয়ার * বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পরিচয় * রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য * পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা * কর্তাভজা : ধর্মমত ও ইতিহাস [সম্পাদিত] * চন্দ্রগুপ্ত [সম্পাদিত] * লোকরহস্য [সম্পাদিত] * বাঘ ও সংস্কৃতি [সম্পাদিত]

● নিবেদন ●

শত্রুদের অসূয়া, গুরুজনদের আশীর্বাদ, এবং বন্ধুজনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে বাউল কবি লালন ফকির সম্পর্কিত আমার এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। বইটির প্রকাশ-পথে যে অসংখ্য বাধা দেখা দিয়েছিলো, তাকে যে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করা যাবে সেকথা আমি ভাবি-ই নি ; কারণ ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে বইটি লেখা শেষ হলেও মুদ্রিত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে এর প্রায় চার বছর সময় লেগেছে, যদিও তার মধ্যে বছর দেড়েক পড়ে ছিলো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কারের পরীক্ষা-কার্যের জন্যে। যাই হোক, আজ আমার কৃতারম্ভ কর্ম যে শেষ হয়েছে সেই আনন্দে অনেক অসম্পূর্ণতা ও দুঃখ ঢাকা পড়ে গেলো।

লালন সম্পর্কে আমার কৌতূহল এবং তাকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত একটি গবেষণা-কর্মে আত্মনিয়োগ করার পটভূমি-বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা বোধহয় এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে দুই বাংলার মধ্যে সর্বপ্রবীণ, আমাদের মধ্যে আজও জীবিত লোক-সংস্কৃতিবিদ্ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের সত্তর বছর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে কোলকাতার 'দৈনিক সত্যযুগ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ রচনা করি। দীর্ঘকাল ধরে অবজ্ঞাত এবং পণ্ডিতম্মন্য উন্নাসিকদের দ্বারা অবহেলিত এই সংস্কৃতি-সাধক সম্পর্কে স্বতঃজাত শ্রদ্ধায় যে অর্ঘ্য সেদিন রচনা করেছিলাম, তা দু-এক জন নিষ্ঠাবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রখ্যাত মাসিকপত্র 'চতুষ্কোণে'র তৎকালীন যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার রায়। তিনি ঐ পত্রিকার 'সংস্কৃতি' বিভাগে মনসুরউদ্দীন সম্পর্কে একটা ছোট লেখা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেন। অন্যজন হচ্ছেন 'পরিচয়' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীতরুণ সান্যাল। তিনি একদিন আমায় ডেকে বললেন যে, আমি যেমন মনসুরউদ্দীন সম্পর্কে 'সত্যযুগ' ও 'চতুষ্কোণ'-এ লিখেছি বাউল কবি লালন সম্পর্কে—ঐরকম একটি লেখা তাঁদের 'পরিচয়' পত্রিকায় দিই না কেন ? আমি রাজি হলাম।

কিন্তু এ-বিষয়ে আমার যা জানা ছিলো এবং যে-সমস্ত বই আমার

সংগ্রহে ছিলো তা-থেকে সেদিন দেখলাম : ১. এতকাল যতটুকু হয়েছে, তা কেবল লালন ফকিরের পূজো ; ২. লালন সম্পর্কে কেউ-ই কোনো গবেষণা করেন নি ; ৩. তাঁর সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা ওলোট-পালোট গাল-গল্পকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তাই একনিষ্ঠভাবে কিছু করবার আশায় দুই বাংলা থেকেই আরও বই সংগ্রহ করার প্রয়োজন্ হলো। ওপার বাংলা থেকে অকৃপণভাবে বই পাঠাতে আরম্ভ করলেন শ্রদ্ধেয় মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব স্বয়ং, বন্ধুবর আবুল আহ্সান চৌধুরী এবং আরও অনেকে। এরই মধ্যে পথে-ঘাটে দেখা হলেই অধ্যাপক সান্যাল তাগাদা দিতে থাকেন। শেষে তাঁকে একদিন জানালাম যে, আপনার আগ্রহে লালন সম্পর্কে যে ছোট প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তা এখন একটি পরিপূর্ণ গবেষণার চেহারা নিয়ে ফেলেছে এবং তা আপাতত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুরস্কারের আশায় জমা দিয়েছি। সব শুনে তরুণবাবু আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করলেন।

এর পরে দেড় বছর কেটে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানা গেলো যে আমার উক্ত লালন গবেষণা দুর্লভ গ্রিফিথ পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অন্যতম পরীক্ষক শ্রদ্ধেয় ড. শ্রীনীহাররঞ্জন রায় আমার কাজকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন যে এটি মুদ্রণের সময় যেন লালনের রচিত গানগুলিও যুক্ত করা হয়। সেই নির্দেশ মেনে এখানে লালনের রচিত প্রকৃত [আমার বিবেচনায়] গান গুলিকে যথাযথরূপে মুদ্রিত করলাম।

এখানে আরো দুটি বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন দেখি। এক. এই গ্রন্থে আমি লালনের সাধনতত্ত্ব বা বাউলতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করিনি। কারণ আমি মনে করি যে এই বাউলদের লেখা গানগুলি পড়ে বা বাইরে থেকে বাউলদের সঙ্গে মেলামেশা করে বাউলতত্ত্ব জানা যায় না। এঁরা নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষা এঁদের একেবারে কাছের-জন না হলে আদৌ দেন না। বহুদিনের বাউল জীবনাচরণ দ্বারা বাউল গুরুর যথার্থ আস্থাভাজন না হলে এ-সমস্ত বিষয়ে কিছুই জানা সম্ভব নয়। তাই আমি এখানে ঐ-সমস্ত গূঢ় সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে মূর্খের আলোচনাকে সযত্নে পরিহার করেছি। এতে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পেলেও বাংলার

বাউল সাধনা ও 'লালনের মতে যে একটি গুহ্য ব্যাপার'কে অশ্রদ্ধা দেখাইনি।
দুই. আমার গবেষণা-পত্রটিকে বর্তমান গ্রন্থ-রূপ দিতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক পরিবর্তন করতে হয়েছে। এবং সব শেষ করেও মনে হচ্ছে বোধ হয় শেষ হলো না। লালন-বিষয়কে আরও কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করলে বুঝি আরও ভালো হতো। নানা কারণে সেই আরও-ভালো হওয়াকে পরবর্তী সংস্করণের জন্যে কুণ্ঠিত আশার হাতে তুলে রাখলাম!

১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী কোলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউটে 'ইণ্ডিয়ান ফোকলোর কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন সভাপতি। আমি সেখানে লালন-সম্পর্কে একটি 'পেপার' পাঠ করি, যার অনুষঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত লালনের স্কেচটিও সভায় প্রদর্শিত হয়। এই ছবির জন্যে এবং আমার বক্তব্যে কিছু কিছু নতুন তথ্য পরিবেষিত হওয়ায় তিনি আমাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। আজ এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশের মুখে তাঁর সস্নেহ অভিনন্দন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলার এই যে, ঐ অনুষ্ঠানের পরে তিনি 'লালন ও তাঁর গান' [১৩৮৫] নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীরায় হচ্ছেন মূলত সৃজনশীল সাহিত্যিক, তাই তাঁর গ্রন্থে ভাবের আবেগ ও স্মৃতিকথার সরসতাই প্রাধান্য পেয়েছে। গবেষকের তথ্য বিশ্লেষণ বা তত্ত্বের নৈষ্ঠিক সিদ্ধি তাঁর কাম্য নয়; সে চেষ্টা বা সাধও তাঁর গ্রন্থের মধ্যে পরিস্ফুট হয়নি। সে কারণে তাঁর গ্রন্থের বক্তব্যগুলিকে [যার কিছু প্রবন্ধাকারে পূর্বেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো] আমার তথ্য ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার তর্কে টেনে আনি নি।

এই গ্রন্থ রচনার সূচনা থেকে মুদ্রিত রূপ পাওয়ার মধ্যকার পথে বিভিন্ন সময়ে আমি বহুজনের কাছ থেকে নানাভাবে উপদেশ এবং সাহায্য পেয়েছি। এঁদের মধ্যে আমার শিক্ষাগুরু ড. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর শিক্ষাই আমাকে বঙ্গীয় সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে নিঃশঙ্ক পদক্ষেপ করতে সব সময়েই অনুপ্রেরণা দান করে থাকে।

সর্ববিষয়ে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং কর্মপ্রচেষ্টায় উৎসাহদানকারী, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ড. শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত ও দিদিভাই অধ্যাপয়িত্রী ড শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তকে এই গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও

ভালোবাসা জানাই। এই আন্তরিক বিনতি সমানভাবে প্রাপ্য আমার আর এক অগ্রজ-প্রতিম শুভাকাঙ্ক্ষী এবং 'রবীন্দ্র-ভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার অধ্যাপক ড. শ্রীঅরুণ বসু ও বৌদি অধ্যাপয়িত্রী শ্রীমতী অর্চনা বসুর। তাঁদের শুভেচ্ছা আমাকে আগামী দিনে আরও কর্মঠ করুক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত লালনের স্কেচটি সংগ্রহ এবং আমার গ্রন্থে মুদ্রিত করার ব্যাপারে 'রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটি' এবং সেখানকার সম্পাদক শ্রীঅসীমকুমার ঘোষ মহাশয়ের উদার সাহায্য ও সৌজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। শান্তিনিকেতনের উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ড. শ্রীসুরজিৎ সিংহ মহাশয়ের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তিনি রবীন্দ্র-সংগ্রহের লালন-খাতাখানি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে তাঁর স্নেহপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় রবীন্দ্র-ভবনের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি ও অপরাপর সুযোগ দিয়ে আমাকে চির-বাধিত করেছেন। 'বিশ্বভারতী'র বাংলা বিভাগের রীডার ড. শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী এবং রবীন্দ্র-ভবনের অবেক্ষক শ্রীসনৎকুমার বাগচী এই দুই বন্ধু এবং তাঁদের গৃহিণীদের কাছেও আমার ঋণের অবধি নেই, মামুলি ধন্যবাদে বেঁধে তাঁদের ছোট করতে চাই না। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রানুরাগী আশ্রমিক ও সাহিত্যসেবী শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব মহাশয়ের কাছ থেকেও আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি তাঁকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার সুহৃদগণের মধ্যে অনেকে, যেমন: আজহারউদ্দীন খান, ড. শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী ড. শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত, কবি ও অধ্যাপক শ্রীপলাশ মিত্র, ড. শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শ্রীদুলাল চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীদিলীপ-কুমার নন্দী, অধ্যাপক শ্রীসঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ ড. শ্রীঅশোক কুণ্ডু এই গ্রন্থটিকে মুদ্রিতরূপে দেখার জন্যে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক, তাই আমার বিষয়ে তাঁদের কৌতুহল ও উৎসাহ স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রতর্কনীয়। প্রখ্যাত সাহিত্য-ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু এবং বন্ধুবর শ্রীঅসীমরঞ্জন কর আমার সারস্বত সেবাকে সব সময়েই প্রীতি-উষ্ণ আনুকূল্য দান করে থাকেন; এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

আমার কয়েকজন অনুজপ্রতিম প্রিয়জন আছেন; যেমন : ড. শ্রীস্বপন বসু, ড. শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্তী, শ্রীপল্লব মিত্র, শ্রীপরিতোষ পাল, শ্রীতপন কর, শ্রীআনন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীরথীন চক্রবর্তী [বুলবুল], শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার, এঁরা সব-সময়েই অধীর আগ্রহে, অপেক্ষা করে থাকেন আমার সম্পর্কে যে কোনো শুভ খবর পাবার আশায়। তাঁদের সেই দুর্লভ আন্তরিকতাকে এই গ্রন্থ প্রকাশের শুভক্ষণে সস্নেহচিত্তে অভিনন্দিত করি।

আমার কলেজ-গ্রন্থাগারের তিন কর্মকর্তা শ্রীঅমিত ব্রহ্ম, শ্রীজয়দেব কর্মকার, শ্রীহারাধন ভট্টাচার্যকেও এই সুযোগে প্রীতিজ্ঞাপন করি।

আমার গ্রিফিথ পুরস্কার প্রাপ্তিতে যে একটিমাত্র সংস্থা প্রীতি-প্রণোদিত হয়ে আমাকে সম্বর্দ্ধিত করেছিলো, সেই 'আকাদেমী অব ফোকলোর'-এর পরিচালক সমিতি, সদস্য ও ছাত্রছাত্রীদের এই উপলক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শ্রীমুরারি গুহ বিশেষ যত্নের সঙ্গে প্রচ্ছদটি এঁকে দিয়েছেন এবং প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীঅজিত দাশগুপ্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা লালন-স্কেচটির ফটো যত্ন সহকারে তুলে দিয়েছেন— উভয়কেই আমার প্রীতি জ্ঞাপন করি। মুদ্রণকার্যের ব্যাপারে শ্রীকৃশো মিত্র আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

৬ শ্রীসনৎকুমার মিত্র

'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দির দ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
যে দেখা বানিয়ে দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে দুয়ার তুলে,
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষের সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে,—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।'

[রবীন্দ্রনাথ : 'পত্রপুট' : পনেরো]

সূচীপত্র

● লালন পদাবলী : মানব বন্দনা ●

মানুষ অবিশ্বাষে পাইনে রে সে মানুসোনিধি।
এই মানুষে মিলতো মানুষ চিনিতাম জদি॥
অধার চান্দের জতোই খেলা
সর্ব্ব উত্তম মানুষ নিলা
না বুঝে মন হোলি ভোলা
মানুষ বিরদি॥
জে অংঙ্গের অবাঅব মানুষ
জানো না রে মন বেহুষ
মানুষ ছাড়া নয় সে মানুষ
অনআদির আদি॥
দেখে মানষ চিন্যাম না রে
চিরদিন মায়ারো ঘোরো
লালন বলে এদিন পরে
কি হবে গতি॥

[খাতা ১ : পৃষ্ঠা ৪৯ : সংখ্যা ৮৮]

• বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য •

লালন ফকির
কবি ও কাব্য

পূর্বসূত্র

এক.

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ বছর [১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ] তখন তিনি 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় [বৈশাখ, ১২৯০। পৃঃ ৩৪-৪১] একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'বাউলের গান'। ঐ প্রবন্ধে তিনি ঐ সময়ে প্রকাশিত 'সঙ্গীত সংগ্রহ/বাউলের গাথা' নামে একটি পুস্তিকার সমালোচনা করেছিলেন। ঐ সমালোচনায় যথার্থ রূপে যে বাউলের গান বা তত্ত্ব সে সম্পর্কে প্রায় কোন কথাই ছিল না। কিন্তু যে কথাটি ছিল তা যেমন কবির কাব্য-জীবনের আসল কথা, তেমনি বাঙালী মাত্রেরই যথার্থ প্রাণের ভাষা।

রবীন্দ্রনাথের অচলিত রচনাবলীর অন্তর্গত সামান্য বিষয়ের এই প্রবন্ধটির উল্লেখ এখানে এভাবে কেন করা হলো? কারণ, এর মধ্যে দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্য এই যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম, যিনি সেই অল্প বয়সেই 'অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের' অন্তরতম প্রদেশে জাত সরল বাউল গানগুলি সম্পর্কে প্রকাশ্য আলোচনা করলেন। কেবল আলোচনা করলেন তাই-ই নয়, এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত বাঙালীকে এই দেশীয় গান-কবিতা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে লিখলেন : 'বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' এখানে, এই বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অগ্রগামী। তাই বা কেন, তিনি নিজেও 'অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের' সৃষ্ট সাহিত্য–যা আধুনিক পরিচিতিতে 'লোকসাহিত্য' নামে খ্যাত তার উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহ-দ্বারা 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও' নীতিকে সার্থক করে তুলেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্র-প্রতিভার একেবারে উন্মেষ-লগ্নে, যখন তিনি সবে মাত্র তাঁর চিন্তায় সাবলম্ব লাভ করতে সুরু করেছেন, ভাষায় আপন শক্তির ইঙ্গিত পাচ্ছেন, তখনই 'বাংলার বাউল সঙ্গীত' নিয়ে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যানুযায়ী রচনা নির্মাণ করলেন।

এখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে

বাঙালীর নিজস্ব এবং হৃদয়জ অকৃত্রিম সঙ্গীত সম্পদের অন্যতম বাউল গান নিয়ে একটি আলোচনা করেছেন। যে সংকলন অবলম্বনে এই আলোচনা, তার দিকে এবং উক্ত রবীন্দ্র-লেখার প্রতি তাকিয়ে মন্তব্য করা যায় যে, বাংলার এই সমস্ত সরল ও মধুর এবং সাধারণ রস-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ সেই সময় বা তৎপূর্ববর্তী কালে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে একেবারে ঊন ছিল না। থাকলে 'সঙ্গীত-সংগ্রহ/বাউলের গাথা' গ্রন্থটিই আদৌ প্রকাশিত হতো না। আরো লক্ষণীয় যে আজকের চরম ইতরতার মধ্যে বাস করে এবং কৃত্রিম বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে—দেখে নয়, সেদিনের গ্রাম-বাংলা তথা শহর কোলকাতারও আকাশে বাতাসে সহজ-সরল-অশিক্ষিত জনের সহৃদয়-সঙ্গীত,—এক কথায় সামগ্রিক 'লোক-ঐতিহ্যে'র বাতাবরণটি অত্যন্ত সাবলীলভাবেই আশ্লিষ্ট ছিল। তাই উক্ত 'বাউলের গাথা'র সংকলক যেমন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক সংস্কারের বসেই তাদের প্রতি আগ্রহ পোষণ করেছেন। অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের কোলকাতাস্থ জীবন এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে পারিবারিক জমিদারীর অন্তর্গত বাউল, বাউল গান বা লোক-সংস্কৃতির অপরাপর উপাদান বা উপকরণের প্রায় দৈনন্দিন সজীব ও বহমান যোগাযোগের কথাও এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি', প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা বারে বারে উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী রবীন্দ্র-রচনা-পাঠকের কাছে এই তথ্যগুলি নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নয়।

এই সূত্র ধরে অগ্রসর হয়ে দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত সীমানার মধ্যে নির্বিশেষ বাউল বা বাউলের সাধনা ও গানের ব্যাপক উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু কোন বিশেষ বাউলের নাম বা তাঁদের কারুরই গানের কোন আলোচনা এই পর্যায়ে করেন নি। বাউলদের কথা এত অল্প বয়সেই এত বড় করে বলার পরেও তিনি এখানে বা আরও অনেক দিন পর পর্যন্ত নির্বিশেষ উল্লেখের স্তর থেকে বিশেষের প্রসঙ্গে বা পরিচিতিতে

না আসার কারণ হিসাবে দু-টি ধারণায় পৌঁছাতে ইচ্ছা করে। ক) রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁদের পারিবারিক জমিদারীর অন্তর্গত এই সমস্ত বিশিষ্ট বাউলদের নাম তখনও পর্যন্ত শোনেন নি, অথবা, খ) তাঁর পরিবারের বিশিষ্ট শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার এই সমস্ত বাউলদের জীবনচর্যা সম্বন্ধে প্রচারিত কাহিনী তাঁদের সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হতে নিরুৎসাহিত করেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের থেকে বারো বছরের বড়ো জ্যোতিদাদা জমিদারীর কাজে অথবা জমিদারীতে গিয়ে 'শিলাইদহ বোটের উপর' চেয়ারে বসিয়ে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উক্ত প্রবন্ধ রচনার ছ-বছর পরে [২৩ বৈশাখ ১২৯৬/৫ই মে ১৮৮৯] লেড পেনসিল দিয়ে লালন ফকিরের একটি রেখা চিত্র [sketch] এঁকে নিয়ে আসেন [এই গ্রন্থে ঐ রেখাচিত্রের ফটো অনুলিপি মুদ্রিত হয়েছে]।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁদের জমিদারীর অন্তর্গত —এমন কি তাঁদের কুঠিবাড়ির অতি নিকটে বসবাসকারী "দশ হাজারের উপর 'শিষ্যসেবিত' এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই"[১] যে লালন ফকিরের নাম, তাঁর সম্বন্ধে আর কোন বাক্য, আর কোথাও উচ্চারণ করলেন না। এবং এর এক বছর পাঁচ মাস বারোদিন [১৭ই অক্টোবর ১৮৯০] লালন 'মানবলীলা সম্বরণ' করেন। এবং লালনের এই লোকান্তরের পরে আমরা লালন সম্পর্কে সর্ব প্রথম যে লিখিত তথ্য পাচ্ছি, তা ৩১শে অক্টোবর ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর চৌদ্দ দিন পরে প্রকাশিত—পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে।[২]

এরপর লালনের উল্লেখ এবং তার গানের নমুনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার [ইংরেজী ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট-সেপ্টেম্বর : পৃঃ ২৭৫-৮১] 'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী, সরলা দেবী। নাম 'লালন ফকির ও গগন।'[৩] এখানেও ঠাকুর পরিবারের উজ্জ্বল ও সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়।

আরও প্রায় পাঁচ বছর পরে লালন প্রসঙ্গ অন্য একটি প্রবন্ধে উল্লেখিত হতে দেখা যাচ্ছে। প্রবন্ধটি মরহুম ওয়ালীর [Maulavi Abdul Wali] লেখা, নাম : ' On Curious Tenets and Practices of a Certain class of Faquirs of Bengal.'[8]

পরে ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে [এপ্রিল-মে ১৯১৫] প্রখ্যাত সাহিত্য-মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতায় 'হারামণি' নামে একটি বিভাগের উদ্বোধন হয়। এই বিভাগের প্রথম ক্ষেপেই সম্পাদক প্রকাশ করলেন[৫] : 'নিম্নে প্রকাশিত গানটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারী শিলাইদহের পোষ্ট ডাক-হরকরা গগন গাহিয়া গাহিয়া ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করিত। এই গানটি ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত। এই সঙ্গে গানটির স্বরলিপি ও চিত্র প্রকাশিত হইল—সে দুটিও ঠাকুর মহাশয়দেরই রচিত' [চিত্র—গগন ঠাকুর, স্বরলিপি—দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর]। এখানে 'মনের মানুষের সন্ধান' শিরোনাম দিয়ে গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে/আমার মনের মানুষ যে রে' গানটি উদ্ধৃত হয়। পরের মাসে [জ্যৈষ্ঠ ১৩২২] ঐ একই পত্রিকার ৩২৪ পৃষ্ঠায় ঐ গানটিরই পরিপূর্ণ ও সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত হয় [গগন ঠাকুরের আঁকা জল রঙের ছবিটিরও ফটো-প্রতিলিপি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে]।

এতক্ষণ আমরা যে সংবাদ পরিবেষণ করলাম তার উদ্দেশ্য হচ্ছে : প্রথমত, একেবারে নাম ধরে 'লালনচর্চা'র প্রাথমিক ইতিহাসটিকে বুঝে পাওয়া এবং দ্বিতীয়ত, লালন-গীতির উক্ত উদাহরণগুলি যা পরবর্তীকালের ব্যাপক লালন-জিজ্ঞাসা বা সামগ্রিক ভাবে বাউল-কর্ষণার আদি গঙ্গা-ভগীরথের সম্মান পেয়েছে, তার উৎস সন্ধান করা। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই কয়েকটি বিষয়ের পারস্পরিকতার উল্লেখ করতেই হয় :

ক. রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র উক্ত 'হারামণি' পর্যায়ে কয়েকটি গান প্রকাশ করলেন বটে ; কিন্তু কোথাও লালনের নাম উল্লেখ বা তাঁর পরিচয় প্রদান অথবা তাঁর সংগ্রহ

প্রকাশের সূচনায় কোন সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত মন্তব্য যুক্ত করলেন না। এমন কি গানগুলি কোথা থেকে, কি ভাবে সংগৃহীত হয়েছে তারও উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ, তিনি গানগুলিকে কোন 'ব্যক্তি' লালনের না মনে করে সমগ্র বাউল সম্প্রদায়ের 'নির্বিশেষে লুপ্ত' একজনের বলে গ্রহণ করলেন।

খ. ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাউলের গান' প্রবন্ধ-র সময় থেকে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নানা ভাবে অর্থাৎ, তাঁর চিন্তায়, মানসিকতায়, প্রবন্ধে, গানে, গানের সুরে এবং ১৯০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে'র উদ্বোধনে এবং উদ্দীপনা সঞ্চারে ব্যাপকভাবে বাউল-অনুষঙ্গকে[৩] ব্যবহার করা, অথচ লালনের কোন নাম বা তাঁর সম্বন্ধে পৃথক কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়া।

এর পর আমরা রবীন্দ্র-জীবনীকারের জবানীতে জানতে পারছি : "বিলাত হইতে ফিরিবার [কবি বিলাত থেকে বোম্বাই হয়ে কোলকাতা ফেরেন ৫.১১.৯০ তারিখে] কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্র-নাথকে জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিতে হইল। গত কয়েক বৎসর হইতে মাঝে মাঝে জমিদারি পরিদর্শনের জন্য স্থানে স্থানে যাইতে হইতেছিল বটে, কিন্তু পরিচালনার ভার তখনো তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় নাই। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদা-প্রসাদের মৃত্যুর [রবীন্দ্রনাথের বিয়ের দিন এঁর মৃত্যু হয়] পর জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে রাজকার্যো-পলক্ষে ব্যাপৃত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী বিয়োগের [কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তারিখ ১৯শে এপ্রিল ১৮৮৪ খ্রী.] পর সাংসারিক কাজকর্মে বীতস্পৃহ,.........সুতরাং জমিদারির কাজকর্ম হয় জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ, না হয় কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপর বর্তাইতে বাধ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ

দার্শনিক ও কবি, তাঁহার পক্ষে বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশোনা করা অসম্ভব ছিল, সুতরাং...জমিদারির তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অবশেষে রবীন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল, তখন ঠাকুর এষ্টেট সমস্তই এজমালিতে ছিল,...দেবেন্দ্রনাথের আদেশে রবীন্দ্রনাথকেও বাইশ বৎসর বয়স হইতে কলিকাতার সেরেস্তায় বসিয়া জমিদারির কাজকর্ম শিখিতে হইয়াছিল;..."[৭] এখানে উদ্ধৃতি দীর্ঘভাবেই নেওয়া হলো। কারণ এর থেকে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। তা হলো :

১· রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের একেবারে শেষে প্রাথমিক ভাবে সমগ্র ঠাকুর পরিবারের জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব লাভ করলেন।[৮] এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব-উত্তর বঙ্গের শিলাইদহ [পরগণা : বিরাহিমপুর], পাতিসর [পরগণা : [কালিগ্রাম] সাজাদপুর [পরগণা : ঐ][৯]-এর কাছারিগুলিতে তত্ত্বাবধানের কাজে বেরিয়ে পড়েন।

২· কিন্তু পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে অবস্থিত তাঁদের এই পারিবারিক জমিদারির অঞ্চলগুলিতে এই প্রথম নয় এর আগেও তিনি বহুবার গিয়েছেন; বিশেষ করে কোলকাতার কাছে প্রথম যে কাছারি সেই শিলাইদহে তো একেবারে কৈশোরকাল থেকেই তাঁর যাতায়াত চলছিলো। তবে, সেটা পিতার সঙ্গে প্রথম বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে অবশ্যই নয়।[১০] এইরকম প্রথমবারের শিলাইদহে গমন সম্পর্কে তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে [প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪৭, মৃত্যুর বছর-খানেক আগে] লিখেছেন : "জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে] যেতে হ'ত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়েছিলেন, আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তখনকার পক্ষে এটা ছিল বেদস্তুর, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত 'বাড়াবাড়ি' হচ্ছে। তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন—ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাশের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ছিল আকাশে বাতাসে চ'রে বেড়ানো মন, সেখান থেকে আমি

খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরও উপরের ক্লাসে উঠেছিল, আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে" [পৃঃ ৬২]। অর্থাৎ আমরা এখন বলতে পারি যে কৈশোরকালের[১১] অপরাহ্ণবেলা থেকে যৌবন পেরিয়ে বার্দ্ধক্যের মাঝামাঝিকাল পর্যন্ত সেই শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ বহুবার গিয়েছেন[১২], যেখানে 'লালন ফকিরের নাম কাহারও শুনিতে বাকী নাই।'

৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-বিয়োগের [১৮৮৪ খ্রীঃ] পর সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে জমিদারি দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম হলেও ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে তাঁকে শিলাইদহে দেখা যাচ্ছে। এর মাস ছ-সাতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও সপরিবারে শিলাইদহে গিয়েছিলেন।

৪. এর পরে বেশ কিছুকালের জন্যে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে বাস করেছিলেন [১৮৯৮ খ্রীঃ। মাঝামাঝি সময়ে বা ১৩০৫ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে]। সেখানে প্রায় বছর তিন-চার কাটিয়ে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি মূলত জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ উপলক্ষে শিলাইদহে স-পরিবারের বাস কবি তুলে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহের যোগাযোগ এবং সম্পর্কের এই সুবিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা যে করা হলো এর উদ্দেশ্য কি এবং এর সঙ্গে বাউল কবি লালন ফকিরের সম্পর্ক কোথায়? —এই প্রশ্নের উত্তরে এ-কথাই বলা দরকার যে বিগত কয়েক দশক ধরে এবং অধুনাতন বাংলার বাউল এবং তৎ-প্রসঙ্গে লালন ফকিরকে নিয়ে যে আলোচনা ও সংগ্রহ ইত্যাদি হয়ে আসছে তার সূচনাটি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে—সেকথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। এবং এই জন্যেই লালনের জীবনবৃত্ত ও সাহিত্য-প্রতিভার আলোচনার সূচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহের সম্পর্ক-বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলো। অধিকন্তু, লালনের জন্ম ও সাধন-স্থান রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক জমিদারির সন্নিকটস্থ বা চৌহদ্দির মধ্যে এবং এই শিলাইদহ, তার অন্তর্গত পদ্মানদী রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিভা-বিকাশ এবং জীবন-দর্শন গঠনে বিশিষ্টতম ভূমিকা গ্রহণ

করেছিলো। এই কারণেই এই দুই কবির জীবন-নাট্যের এবং মানস-স্ফূর্তির প্রেক্ষাপট বা চারণক্ষেত্ররূপী-শিলাইদহ [ব্যাপক অর্থে] সম্পর্কে এমন বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজন হলো। এছাড়াও আরো একটি বিষয় আছে। তা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও লালন নিয়ে উভয়পক্ষের ভক্তদের মধ্যে নানা স্বাদু গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে।[১৩] রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ গমন, সেখানে বসবাস এবং এ-সকল সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়েই সে সবের সত্যাসত্য নির্ণয় সম্ভব বিবেচনায় উক্ত আলোচনাকে যতদূর সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ করা হয়েছে।

এর সঙ্গে আরও আছে; রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে লালন-রচিত ২৯৮টি গান সমৃদ্ধ দুটি খাতা রয়েছে। কবি তার থেকে লালনের ভনিতা সহ মোট সাড়ে উনিশটি গান 'প্রবাসী'-র পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন।[১৪] খাতায় লেখা ভাষা ও বানান 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হবার সময় শুদ্ধ রূপ লাভ করলেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম লালনের অতগুলি গান মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করলেন। এমন কি 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাধির উপরে একটি ছোট পাকা স্মৃতি-মন্দির তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন, সম্ভবত ১৩১১ সালে'।[১৫]

লালন সম্পর্কে এই অপ্রত্যক্ষ পরিচয় অথচ তাঁর বা তাঁদের ভাব ও রসাস্বাদনের অসীম আগ্রহ,—রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁদের নাম ধরে ডেকে আলোচনা নাই করে থাকেন, তথাপিও, তাঁর মধ্যেকার 'নতুন বাউল' বা 'রবীন্দ্র-বাউল'টি শিলাইদহের মাটিতেই ঐ বাউল-ফকিরদের জীবন-সঙ্গীতের বীজাশ্রয়ে জন্ম নিয়ে সেইখানেই বেড়ে উঠেছিলো। এবং এই কথা মনে রেখেই আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনে শিলাইদহের সম্পর্কটি এমন বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করার চেষ্টা পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য উপস্থিত করা যায়। তা এই যে, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের বাস তুলে দিয়ে তাঁর জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে যে দ্বিতীয় ঠিকানা গড়লেন সেই বীরভূম-শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডলেও বাউল-সাধনা এবং

সঙ্গীত-রসের অঙ্গবাসটিও বেশ চড়া রঙেই ছোপানো ছিলো।

শিলাইদহ—লালন ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আরও একটি তথ্য আমরা এখানে উপস্থিত করবো। সেটি হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্র-নাথের অন্তরঙ্গ ও প্রিয় জ্যোতিদাদা ৯ই মে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে শিলাই-দহের জমিদারিতে গিয়ে পদ্মার বোটের ওপর চেয়ারে বসিয়ে লালনের একটি স্কেচ করেন। [আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য]। এরই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এক বছরের শিশুপুত্র রথীন্দ্রনাথ [জন্ম : ২৭ নভেম্বর, ১৮৮৮], ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে কবি সপরিবারে শিলাইদহে যান [১৮৮৯ এর ২৭ নভেম্বরের কাছাকাছি সময়ে]।[১৬] এরই ছ-বছর পরে কবির বোনঝি সরলা দেবী তদ্‌সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় 'লালন ফকির ও গগন' নামে একটি প্রবন্ধে [অনুসূত্র দ্রষ্টব্য] লালনের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ আটটি ও গগনের ছুটি গান মুদ্রিত করেন। এবং এর একুশ বছর পরে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ রবীন্দ্র-ভাবিত ও শান্তিনিকেতনের আশ্রম-সদস্য শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কবিগুরুর সঙ্গে শিলাইদহে গিয়ে অন্যান্য বহু ছবির মধ্যে লালনেরও একটি স্কেচ অঙ্কিত করেন।[১৭] যদিও নন্দলালের এই স্কেচ আঁকার ছাব্বিশ বছর আগে লালনের মৃত্যু হয়েছে এবং যে কোন কারণেই হোক এঁর আঁকা স্কেচটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ছবি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অবয়ব বিশিষ্ট।

দুই.

আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি যে বাঙালী তথা ভারত-বাসীর একমাত্র পরিচয় কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর যৌবনের উপবন যে শিলাইদহে বসবাস করে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-ফসল ফলিয়েছিলেন, তারই চৌহদ্দির মধ্যে অন্যতম মরমী কবি আপনার মনের মানুষ খুঁজে খুঁজে সারা হয়েছেন। এমন যোগাযোগ কদাচিৎ

ঘটে। তাই ইতিহাসের দিক থেকে লালন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ঘটনাগত সম্ভাব্যতা তথ্য-ঋদ্ধ হতে পারে কি না, সে বিষয়ে চিন্তা না করেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের দেখা হওয়া নিয়ে এক কৌতূহলোদ্দীপক গল্প রচনা করা হয়েছে। এই গল্প-কাহিনীর আদি রচয়িতা হচ্ছেন জলধর সেন। তিনি তাঁর 'কাঙ্গাল হরিনাথ' [১৯১৩] গ্রন্থে [প্রথম খণ্ড : পৃঃ ২৩-২৪] রবীন্দ্রনাথ ও লালনের মধ্যে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ এনে লেখেন : 'শুনিয়াছি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠিতে লালন একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্যন্ত গান চলিয়াছিল, ইহার মধ্যে কেহই স্থান ত্যাগ করিতে পারে নাই।'

এর দু-বছর পরে 'প্রবাসী'র পাতায় রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যেরা লালনের গান প্রকাশ করেন। ফলে, লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং সাক্ষাতের কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার একটা অবলম্বন পেয়ে গেল। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সূত্রে বাউলের ধর্ম ও সাহিত্য-সাধনার অনির্বচনীয়তার উল্লেখ করতে থাকেন। লোকে ভাবতে থাকে, বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ফলে তাঁর তার ভাব-শিষ্য হয়ে পড়েছিলেন। এরই সঙ্গে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লালনের খাতা নিয়ে যাওয়া ও বিশ্বকবি-খ্যাতির পেছনে ঐ খাতার অবদানের কথা প্রচারিত হতে আরম্ভ করেছে। এইভাবে ধীরে ধীরে যখন লালন ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সংস্কার আরও নানা ঘটনা এবং গল্পের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, সেই সময়ে ঠাকুর এস্টেটের একজন একনিষ্ঠ ও সাহিত্যরসবোধ সম্পন্ন কর্মচারী শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে [প্রথম প্রকাশ : ১৩৫২] লালন ফকিরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মোলাকাৎ-এর একটি চমৎকার গল্প রচনা করলেন। গল্প হিসেবে এবং সাহিত্য-রস- রসিকতায় এটি তুলনাহীন। কিন্তু এর সত্যতা

বা ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে শচীনবাবুর অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থের প্রকাশক স্বয়ং পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন: 'এই কাহিনীটির নায়ক রবীন্দ্রনাথ না হতেও পারেন। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সঙ্গেই হয়ত সাঁইজির এভাবে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল'।[১৮] আর শচীনবাবু নিজে বলছেন: 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল কি না তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, প্রাচীনেরা বলেন—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়'।[১৯]

অতএব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের মোলাকাতের গল্পের এখানেই মৃত্যু হলো। আমরা পূর্বে তথ্য দিয়ে ও বাস্তবে এই গল্পের জন্মলাভ সম্ভব নয় তাও বলে এসেছি। এই কারণেই বলা হয়েছে যে কেবল লালন নয়, সমগ্র বাউল-রসমণ্ডলকে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি—চর্মচক্ষে চাক্ষুস করার মধ্যে দিয়ে নয়, ভাব-ইন্দ্রিয় দ্বারা নিজের ঐতিহ্যে-সাঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। এই জন্যেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই নিজে বলেছেন 'নতুন বাউল' বা 'রবীন্দ্র বাউল'।[২০]

১. এই উদ্ধৃতি 'হিতকরী' থেকে নেওয়া হয়েছে।

২. পাক্ষিক এই 'হিতকরী' পত্রিকার পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে: "বাং ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস [১৮৯০ সালের এপ্রিল] থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস। 'হিতকরী' রজনীকান্ত ঘোষ কর্তৃক কুমারখালী মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হতো।…হিতকরীতে সম্পাদকের নাম থাকতো না। সহকারী সম্পাদক হিসেবে রাইচরণ দাসের নাম ছাপা হতো। তবে বেশ বোঝা যায় মীর মশারফ হোসেনই এই পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন"… আবুল আহসান চৌধুরী: 'লালন স্মারকগ্রন্থ': ঢাকা ১৯৭৪: পৃ: ৬। দ্র. অনুসূত্র ক.

৩. 'ভারতী' [প্রথম প্রকাশ, ১২৮৪ শ্রাবণ]। সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন: 'এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া

জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন' [পৃ: ৮৩]।

৪. দ্র. The Journal of the Anthropological Society of Bombay [Vol. V No. 4. Bombay 1900]। এই প্রবন্ধটি ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হলেও পঠিত হয়েছিল উক্ত সোসাইটির ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বরের অধিবেশনে।

৫. 'প্রবাসী'র এই 'হারামণি'র প্রসঙ্গটি অন্যসূত্রে পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচিত হয়েছে।

৬. ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে 'বাউল' নামে ৩২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির আখ্যাপত্রের প্রতিচিত্র দ্রষ্টব্য।

৭. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-জীবনী' : ১ম খণ্ড [১৩৬৭] পৃ: ২৭৫-৬।

৮. 'এই ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ঐ চার জমিদারির দেখাশুনার [ইন্সপেকশান] ভার পেলেন। তার পাঁচ বছর পরে ঐ কয়টি জমিদারির সর্বময় দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হল মহর্ষিদেবের ব্যবস্থায় [পাওয়ার অব এ্যাটর্ণী বাই দেবেন্দ্রনাথ ট্যাগোর। ৮ই আগষ্ট ১৮৯৬ খ্রী:]' দ্র. শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী : 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ : কলকাতা ১৯৭৪ : পৃ: ৯-১০।

৯. দ্র. চিঠিপত্র : ১ম খণ্ড। কালিগ্রাম থেকে লেখা। ১৮৯০-এর ডিসেম্বর।

১০. রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে [ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩] চার মাস বাদে ফেরেন ২৭শে জুনের কাছাকাছি সময়ে। এবং প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৮। এই বিলাত যাওয়ার জন্য জাহাজে চড়বার আগে ৪ মাস আমেদাবাদে এবং ২ মাস বোম্বাইতে কাটান।

১১. সম্প্রতি সংগৃহীত তথ্য অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে যে কবি ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ১৫ বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম শিলাইদহে যান। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে এই সময়ে বিশ্বনাথ শিকারীর সঙ্গে বাঘ শিকারের গল্প আছে [পৃ: ৬২]। আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য ৭নং পাদটীকা এবং ৮নং পাদটীকাস্থ গ্রন্থের যথাক্রমে ২৫৮ পৃষ্ঠা এবং ৩৮৫-৯২ পৃষ্ঠা।

১২. '...এই অনুশাসনের বলে শেষ পর্যন্ত ত্রিশ বছরের যুবক রবীন্দ্র-

নাথ এই অঞ্চলে আসতে বাধ্য হলেন, তারপর থেকে দশ বছর কাল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা শিলাইদহ বললে ভুল হয় না—যদিচ সর্বদা নানা কাজে তাঁকে স্থানান্তরে যেতে হত। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে স্থায়ীভাবে সেখানে চলে এলেন—তবু তাঁর যোগ ছিন্ন হল না শিলাইদহের সঙ্গে। সেই যোগ একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল ১৯২১ সালে যখন আবার সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে শিলাইদহ ও বিরাহিমপুর পরগণা পড়লো সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের অংশে।' দ্র. শ্রীপ্রমথনাথ বিশি : 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' : পকেটবুক সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ : পৃঃ ১৪, ২১, ২২।

১৩. ঠাকুর এস্টেটের প্রাক্তন কর্মচারি রবীন্দ্রভক্ত শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় কবির 'লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাতে'র গল্প করেছেন এবং এই গল্প আজও অনেকে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিশ্বাস করেন; অপরপক্ষে লালনভক্তেরা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লালনের গান চুরি করে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গল্প ফেঁদে থাকেন।

১৪. অনুসূত্রে আমরা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হারামণি' বিভাগের সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য উপস্থিত করেছি।

১৫. দ্র. ৮নং পাদটীকা : পৃঃ ১৭০।

১৬. দ্র. ১১নং পাদটীকা।

১৭. এই সময়ে শিলাইদহে গিয়ে অঙ্কিত স্কেচ ও ছবির বেশ কিছু, আঁকার তারিখ সহ মুদ্রিত রয়েছে দেখি শ্রীশচীন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের অধুনা প্রকাশিত [১৯৭৪] 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের নানা পৃষ্ঠায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আচার্য নন্দলাল পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ বসু মহাশয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জেনেছি যে শিল্পাচার্যের এই লালন প্রতিকৃতি সম্পূর্ণতই কাল্পনিক এবং তার পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচ না দেখাই সম্ভব। শচীনবাবুও গ্রন্থকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লালন-স্কেচটি দেখেন নি।

১৮. শ্রীশচীন্দ্র অধিকারী : 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' : ১৯৭৪ : পৃঃ ১৭১।

১৯. আবুল আহসান চৌধুরী : 'লালন স্মারকগ্রন্থ' [ঢাকা : ১৯৭৪] : পৃঃ ৭৮-৯।

২০.

খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকালের আধুনিক। হাল আমলের কলেজে পাসকরা যেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরেজী পোড়ো বাউলের রচিত গান আছে, দেখেছি তা, তা অস্পৃশ্য। আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি। সেগুলা স্পষ্টতর রবীন্দ্র-বাউলের রচনা।' দ্র. অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংকলিত 'হারামণি' : [ঢাকা ১৯৭২] : পৃ. ১৯৫।
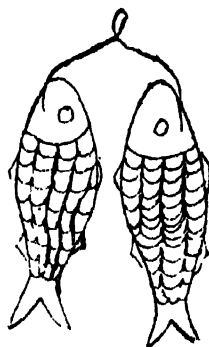
লালন ফকির ঃ কবি
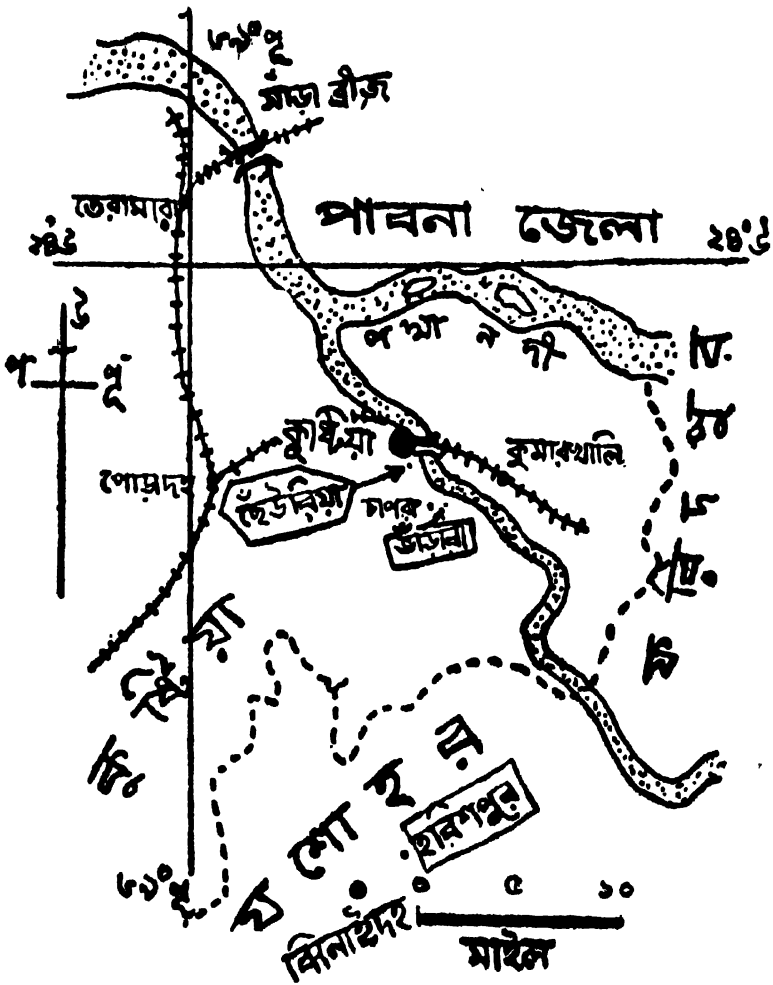
কুষ্টিয়া জেলার একটি মানচিত্র। এই গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠা থেকে ৩২ পৃষ্ঠার আলোচনা অনুধাবন করতে এই মানচিত্র সহায়ক হবে মনে করে এটি এখানে মুদ্রিত হলো।

ড. শ্রীসুধীর চক্রবর্তীর সৌজন্যে

'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল'

গত ১৯৭৪-এর শেষে এবং ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথমাংশে এপার এবং ওপার বাংলায় বাউল-কবি 'মহাত্মা লালন ফকির'-এর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হওয়ার কয়েকটি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এ-কথা আমাদের জানা আছে যে মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পরিবারস্থ লোকজনের আগ্রহে ও অনুসন্ধিৎসায় বাংলার উচ্চ শিক্ষা এবং রুচির কাছে দেশের মরমী হৃদয়ের বাউল গান এবং সেই গানের অন্যতম প্রধান বাণী-সাধক বাউল-কবি লালনের পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এবং এ-কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, তারই ফল হিসেবে বৃহত্তর বঙ্গ-জনগোষ্ঠীর মনের মানুষ লালনের উক্ত দ্বিশত -জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ব্যাপক উৎসব পালনের প্রচেষ্টা দেখা গেছে।

এখন স্বভাবতই ধরা যাচ্ছে যে যেহেতু ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে লালনের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেহেতু এ-প্রসঙ্গে এটাই মনে রাখা আছে যে এর দু-শ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে লালনের জন্ম হয়েছিল। এখানে আমাদের আলোচ্য এই যে, লালনের জন্ম বৎসর কেন ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ ধরা হলো? তার প্রমাণ কি? সত্যই কি তাঁর ঐ সালে জন্ম হয়েছিল—ইত্যাদি।

এ-কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, লালনের জন্ম সাল নিয়ে একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করার কোন বাস্তব প্রমাণ—যাকে আমরা 'পাথুরে প্রমাণ' বলি, তা কারুরই হাতে নেই। তবে লালনের মৃত্যুর চৌদ্দদিন পরে পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিলো যে মৃত্যুর দিন লালনের বয়স হয়েছিলো ১১৬ বছর। সেই হিসাবে তাঁর জন্ম-তারিখ হচ্ছে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ। এখানে এ-কথা জানানো প্রয়োজন যে লালন-সম্পর্কে উক্ত সম্পাদকীয়তে লেখকের কোন নাম ছিল না। এ প্রসঙ্গে আমাদের এ-ও

জানা প্রয়োজন যে উক্ত পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকাটির পরিচয় কি ? অনুসন্ধানে জানা যাচ্ছে যে : "পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকা বাংলা ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস [১৮৯০ সালের এপ্রিল] থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন লাহিনী পাড়া নিবাসী শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস। 'হিতকরী' রজনীকান্ত ঘোষ কর্তৃক কুমারখালী মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হতো।...হিতকরীতে সম্পাদকের নাম থাকতো না। সহকারী সম্পাদক হিসেবে রাইচরণ দাসের নাম ছাপা হতো। তবে বেশ বোঝা যায় মীর মশারফ হোসেন-ই এই পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। হিতকরীর সর্বত্রই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নামের অন্তরালে মূলতঃ তিনিই পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন।"[১]

এই পত্রিকাই লালনের মৃত্যুর পরে আবিষ্কার করলেন যে 'লালন ১১৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ' করেন। এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়ে আছে যে লালন সম্বন্ধে চিন্তিত ফসলের মুদ্রিত প্রতি-রূপের একেবারে আদি-গঙ্গা-ভগীরথ হচ্ছে এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি। সেই কারণে এই প্রবন্ধের সূত্র ধরেই লালনের উক্ত জন্ম-তারিখের ধারণা শ্রীমতী সরলা দেবী, অক্ষয় মৈত্রেয়, শ্রীবসন্তকুমার পাল প্রমুখের মধ্যে দিয়ে আজ পর্যন্ত বয়ে এসেছে। কিন্তু একটা অন্ধ আবেগ এবং ইতিহাস-বোধ বর্জিত বিশ্বাসের [যুক্তি নয়] পাঁকে কিভাবে সত্যবুদ্ধি আটকে পড়ে এই ঘটনাটি তার একটি উল্লেখ-যোগ্য উদাহরণ।

এখন 'হিতকরী'র সেই আদি সম্পাদকীয় থেকে আজ পর্যন্ত সকলকেই আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, আপনারা লালনের ঐ বয়স এবং জন্ম-তারিখ কোথায় পেলেন ? কেন না, 'হিতকরী'র ঐ প্রবন্ধেই বিশেষ ভাবে উল্লেখিত আছে : 'ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপ-করণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে, না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।' অধিকন্তু, কেবল ঐ 'হিতকরী' নয় ১৮৯০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত পঁচাশী

বছরে যে-ই লালন সম্পর্কে কিছু লিখেছেন তিনিই এই কথাগুলি নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন : ক) লালন নিরক্ষর, খ) তিনি নিজে কিছুই বলতেন না, গ) তার শিষ্যেরাও ঠিক কিছুই জানতো না, ঘ) গুরু লালন সম্পর্কে অন্ধ ভক্তির যুক্তিহীন আবেগ-ই শিষ্যগণের মধ্যে প্রবল, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতএব আমরা কোন্ প্রমাণ এবং যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে স্থির হবো যে মৃত্যুকালে লালনের বয়স হয়েছিল—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ১১৬ বছর। ১১৭ বা ১০১ বা ৭৫ নয়।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে এখানে মন্তব্য করা যেতে পারে যে শতাধিক বছর বা তার থেকে কিছু কম-বেশী বয়স্ক মানুষ কিছু বিরল হলেও দুর্লভ নয়। কিন্তু এখানে কি প্রয়োজনে এবং কার স্বার্থে লালনকে ১১৬ বছর বেঁচে থাকতে হয়েছে। এবং এই বয়স-সীমা তো কোন যুক্তি এবং প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি। এইবারে আমাদের জিজ্ঞাস্য, 'হিতকরী'র ঐ সম্পাদকীয়ের লেখক কে ? এবং তিনি কার কাছ থেকে বা কি ভাবে লালনের বয়স জানলেন ? এর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আবুল আহ্সান চৌধুরী মহাশয় অনেক পারিপার্শ্বিক সাক্ষী-প্রমাণের দ্বারা [circumstantial evidence] সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা করেছেন যে এটি 'হিতকরী'র একাধারে সম্পাদক ও এজেন্ট এবং কুষ্টিয়ার প্রখ্যাত উকীল রাইচরণ দাসের রচনা।[৩] মোটামুটি ভাবে যুক্তি-আশ্রয়ী এই বিচারকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে। অধিকন্তু এই সম্পাদকীয় 'লালন-নিবন্ধ' যিনিই রচনা করে থাকুন না কেন, তিনি লালনের মৃত্যুর বেশ কিছু আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; এমনও মনে হয় যে লালনের ধর্মমত. তার ভাল-মন্দের বিষয়েও উক্ত প্রবন্ধ লেখক কিছু কিছু অবহিত ছিলেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কার কাছ থেকে এবং কি ভাবে লালনের ১১৬ বছর বয়সে মৃত্যুর সংবাদটি সংগৃহীত হলো তার কোন উল্লেখ ঐ নিবন্ধের কোথাও নেই। তবে ঐ প্রবন্ধের সূচনায় লেখক ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহপ্রাপ্ত লালনের দু-জন শিষ্যের [শীতল ও ভোলাই] এবং

শেষে 'শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মাণিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভালো লোক'এর নাম করেছেন।[৪]

মনে হয় এঁদের কারোর কাছ থেকেই লালনের মৃত্যুর পর 'হিতকরী' সম্পাদক বা তাঁর পক্ষে অন্য কেউ গিয়ে লালন সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে সংগ্রহের পর তৎসহ আপন অভিজ্ঞতার মিশেল দিয়ে এটি রচনা করেছেন। এবং সেই শিষ্যেরাই লেখককে বহু পরিমাণে সাহায্য করেছেন, যাঁরা 'অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।' অতএব সংবাদপত্রের এই রিপোর্টকে কেন যে পরবর্তী আলোচক ও গবেষকগণ বিনা যুক্তিতে ও নির্দ্বিধায় ঐতিহাসিক তথ্যরূপে গ্রহণ করলেন তা বোঝা কঠিন। এর সঙ্গে আরও কিছু অতিরিক্ত কৌতুক যুক্ত হয়েছে।

১. 'হিতকরী'র ঐ প্রবন্ধের পর ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র [ইংরেজী ১৮৯৫-এর আগষ্ট-সেপ্টেম্বর। লালনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে] সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী 'লালন ফকির ও গগন' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[৫] বলা যেতে পারে যে, 'হিতকরী'র ঐ সম্পাদকীয়ের পরে এটি দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রবন্ধ, যাতে লালন প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। এই প্রবন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'ভারতী'র সম্পাদিকা মারফৎ যা জানিয়েছিলেন তা নিছকই গল্পকথা,—কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি বা সুদৃঢ় তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি 'কুমারখালীতে অনুসন্ধান করিয়া' যা জানিয়েছেন তাতে 'হিতকরী'র গল্পের অতিরিক্ত প্রায় কিছুই নেই। মৈত্রেয় মহাশয় তাঁর আহৃত সংবাদের সূচনাতেই স্বীকার করেছেন : 'লালন ফকিরের সকল কথা ভাল করিয়া জানি না, যাহা জানি তাহাও কিম্বদন্তীমূলক।[৬] শিষ্যেরাও বেশী কিছু সন্ধান বলিতে পারেন না।' এর পরই মৈত্রেয় মহাশয় লিখেছেন যে লালন জাতিতে কায়স্থ, ১০।১২ বছর বয়সে তাঁর বসন্ত হয়েছিল. পথে তিনি তাঁর তীর্থযাত্রী সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এক

মুসলমান ফকির তাঁকে উদ্ধার করেন......ইত্যাদি, ইত্যাদি—বহুল প্রচারিত গল্প কাহিনী। এর পরে মৈত্রেয় মহাশয় আর একটি অদ্ভুত এবং যে কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে মারাত্মক ভ্রান্তিমূলক ও অপরাধজনক কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন: 'তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্ত ভাব দেখিয়া তাহাকে হিন্দু বলিয়া চিনতে পারা যাইত',—কি অদ্ভুত কথা! এই দেহ কান্তি কি কেবল হিন্দুরই একচেটিয়া। অর্থাৎ এর বিপরীত হলেই—অর্থাৎ, বেঁটে, ছোট কপাল, ঝিমানো চোখ, কাল গায়ের রঙ যাঁর, তিনিই মুসলমান হবেন। তা-ছাড়া অক্ষয়কুমার তো স্বচক্ষে লালনকে দেখেন নি; তবে তিনি এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কোথা থেকে পেলেন? এবং তা দিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির মতো লালনের হিন্দু origin-কে প্রতিষ্ঠিত করলেন?

২. বাংলার বাউল সম্পর্কে একালের অন্যতম বিশিষ্ট গবেষক ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'হিতকরী'কে অনুসরণ করে লালনের বয়স ও জন্ম তারিখ ধরেছেন। এবং তাঁর বিখ্যাত 'বাংলার বাউল গান' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: 'লালনের মৃত্যুর সমসাময়িক কালে প্রকাশিত স্থানীয় এক পত্রিকা কখনই বিশেষভাবে না জানিয়া নির্দিষ্ট একটা বয়সের উল্লেখ করিতে পারে না। সুতরাং লালন ১১৬ বৎসর বয়সেই মারা যান ইহা আমরা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারি'।[৬] উপেনবাবুর এই মন্তব্য একান্ত কাকতালীয় ঘটনা ও নড়বড়ে যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। উপেনবাবু যদি 'হিতকরী'র রিপোর্ট সবিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন তা-হলে মৃত্যুকালে লালনের ১১৬ বছর বয়স ধরার পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পেতেন না। এবং কেন যে পেতেন না তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি। অধিকন্তু, 'সমসাময়িক কালে প্রকাশিত স্থানীয় এক পত্রিকা'য় প্রকাশিত সংবাদ হলেই যদি তার প্রদত্ত সমস্ত তথ্যই অভ্রান্ত ও ধ্রুব হতো, তবে আজকের পত্র-পত্রিকাদিতে প্রত্যহ সম-

সাময়িক কালের এবং স্থানীয় যে সমস্ত ঘটনা বা সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তা আগামী দূর বা নিকট ভবিষ্যতে তো অপৌরুষেয় 'বেদ'-এ রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অতএব উক্ত যুক্তিসমূহ—বয়স ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে, কোনো ভাবেই মানা সম্ভব নয়।

পরিশেষে, আমরা একথা বলতে পারি যে লালন হয়তো দীর্ঘজীবী ছিলেন;—এবং অন্যান্য অনেক মানুষের মতোই লালনের পক্ষে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়তো এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়, তবুও সেই দীর্ঘজীবন কাঁটায় কাঁটায় একেবারে ১১৬ বছর, কোন্ প্রমাণ দিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত করবো। হাতে তো অনুমান নির্ভরতা ছাড়া অন্য কোন 'পাথুরে প্রমাণ' নেই। অতএব ভাবের ঘরে চুরি না করে আমরা লালনের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে এভাবে বক্তব্যকে উপস্থিত করতে পারি যে; লালন দীর্ঘজীবী ছিলেন, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে জন্মগ্রহণ করেন।"

১. "ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।": দ্র. 'হিতকরী'র সম্পাদকীয়: ৩১.১০.১৮৯০: পৃ. ১০১।

২. আবুল আহসান চৌধুরী [সম্পাদিত]: 'লালন স্মারক-গ্রন্থ' [ঢাকা : ১৯৭৪]: পৃ ৬।

৩. দ্র. প্রাগুক্ত গ্রন্থ: পৃ ৩-৬।

৪. 'হিতকরী'র এই প্রবন্ধে শিষ্যদের এই নামোল্লেখের মধ্যে দিয়ে সম্পাদকের সাংবাদিকতা-সুলভ শিথিলতা লক্ষণীয়। কারণ, প্রথমে সম্পাদক যে দু-জন শিষ্যের নাম করলেন তাঁরা লালনের ঔরসজাত পুত্রবৎ স্নেহ-প্রাপ্ত। কিন্তু প্রবন্ধের শেষে লালনের-শিষ্যদের মধ্যে 'ভালো লোকের' যে তালিকা পাওয়া গেল তার থেকে ঔরসজাত পুত্র-সদৃশ ভোলাই-এর নাম বাদ পড়ে গেল।

এছাড়াও ঐ প্রবন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার এই যে লালন দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর সম্পত্তির যে উইল করে যান তার থেকেও 'ভোলাই' বাদ হয়ে গেছেন। অধিকন্তু, সরলা দেবীর প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার

মৈত্রেয় যে লালন-জীবনী রচনা করেছেন তাতেও দেখা যাচ্ছে 'ভোলাই' লালন-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। এই শিথিল চিন্তা, তথ্যের এই এলোমেলো প্রয়োগ, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হলেও তা কখনও তথ্যনিষ্ঠ গবেষণার লক্ষণ এবং উপাদান হতে পারে কি?

৫. আমরা এই প্রবন্ধটি পরে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করেছি।

৬. 'কিম্বদন্তীমূলক' শব্দটি লক্ষণীয়। কিংবদন্তী কি ইতিহাস?

৭. দ্র. প্রথম সংস্করণ [১৩৬৪]: দ্বিতীয় খণ্ড: পৃ ৯।

৮. ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতা থেকে মৈত্রেয়ী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে এস. এম্. লুৎফর রহমান লিখিত 'লালন শাহের জীবন-কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে [পৃ ২১৫-২৯৩]। ঐ প্রবন্ধে প্রবন্ধকার লালনের 'প্রিয়তম শিষ্য দুদ্দুশাহের স্বহস্ত-লিখিত লালন-জীবনী বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি'-কে মূল প্রতিপাদ্য করে তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তকে গড়ে তুলেছেন। ফলে অনেক নিশ্চিত যুক্তি ও প্রমাণ তাঁর বক্তব্যের একদেশদর্শিতায় উড়ে গেছে। এবিষয়ে আমি অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করে ঐ প্রবন্ধ এবং দুদ্দুর তথা-কথিত স্বহস্ত-লিখিত পুঁথির সত্যাসত্য যাচাই করেছি।

২.

'আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম সদায় ভেবে মরি'

পূর্বে আমরা লালনের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে আলোচনা করে এসেছি। এবার আমরা তাঁর জন্মের প্রকৃত স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করবো এবং আশ্চর্যের কথা এই যে এ বিষয়েও বিগত পঁচাশী বছর ধরে এক এক জন লালন-জীবনী-রচয়িতা এক একটি নতুন নতুন স্থান নির্দেশ করেছেন বা আজও করছেন। ফলে জন্ম গ্রহণের জন্য লালনকে কুষ্টিয়া, নদীয়া, পাবনা, যশোহর—বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

লালনের জীবন-বৃত্ত আলোচনা—প্রসঙ্গে সেই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই যে-কথা মনে রাখেন নি তা— হচ্ছে লালনের জীবনের দু-টি ভাগ: এক. সন্ন্যাস-পূর্ব জীবন, এবং দুই. সন্ন্যাস-পরবর্তী জীবন। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই জীবনের তথ্যগত সমস্যা দু-রকমের। এবং এই ধরণের সন্ন্যাসীদের সংসারাশ্রম সম্পর্কে এমন প্রচণ্ড আসক্তিহীনতা যে তাঁরা কিছুতেই সেই জীবন বিষয়ে কিছু বলেন না বা বলতে চান না। সেই মৌনতা শিষ্য ও ভক্ত পরম্পরায় নানা ভাবে পল্লবিত হয়ে রোমান্স-কাহিনী রচনাতে সাহায্য করে, এবং যাঁর কাহিনী যত অতিপ্রাকৃত-রহস্য মণ্ডিত তাঁর গৌরব ও মাহাত্ম্য ততই উচ্চমার্গী এবং তিনি তত বড় মহাপুরুষ ও সাধক বা সিদ্ধপুরুষ।

যাই হোক, লালনের জন্মস্থান সম্বন্ধে সেই 'হিতকরী' [১৮৯০]-র যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কি কি মত পোষিত হয়েছে প্রথমে সেগুলি ক্রমানুসারে উল্লেখ করলে এই রকম দাঁড়ায়:

এক। 'কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইহার জাতি' [হিতকরী]।

দুই। "He [Lalan] was a disciple of 'Siraj Shah' and both were born at the village Harishpur, Sub-division jhenidah, District Jassore" [মৌলবী আবদুল ওয়ালী]।[১]

তিন। আর একটি মতে বলা হচ্ছে: কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপড়া গ্রামের ভৌমিকেরা তাঁহার স্বজাতীয়' [ভারতী][২]

চার। "লালন 'কুষ্টিয়ার' ভাঁড়ারা বা ভাণ্ডারিয়া গ্রামেরই লোক ইহা প্রাচীন অধিবাসীদের প্রায় সকলেরই জানা আছে" [বসন্তকুমার পাল]; ইনিই আরও একটু সরে গিয়ে বলেছেন: 'মনে হয় সাঁইজী আত্মীয়দিগের সহিত পৃথক হইয়া ভৌমিক মহাশয়দিগের বাটীর সন্নিহিত দাসপাড়া নামক বস্তিতে বাস করেন। ইহা ভাঁড়ারার মধ্যে; চাপড়ার সীমান্তে।

পাঁচ। অন্যেরা বলছেন: 'লালন ফকিরের জন্মস্থান তৎকালীন নদীয়া জেলায় অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার ভাঁড়ার গ্রামে' [ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন]।

ছয়। পরবর্তী গবেষণা জানাচ্ছে: 'পূর্বতন নদীয়া জেলার [বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের, অধুনা বাংলা দেশের কুষ্টিয়া জেলা] কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালী থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম হয় [ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য]।

সাত। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে বা আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রে লালন সম্বন্ধে কিছু গবেষণা হয়েছে। এবং তাঁরা দাবী করছেন যে: "আমরা যশোহর জিলার 'হরিশপুর'-কেই লালনের প্রকৃত জন্মস্থান বলে নির্ধারণ করছি।"[৩] ঐ দেশেরই অপর একজন লিখছেন: "কিন্তু লোক-বিশ্বাসের উর্দ্ধে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বর্তমান প্রবন্ধকার কর্তৃক আবিষ্কৃত বাউল গানের অতি পুরাতন একটি খাতায় লিপিবদ্ধ লালন পরিচিতির মধ্যে এ তথ্যের লৈখিক সমর্থন পাওয়া যায়।......এই বিচারে দেখা যায় পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত দুদ্দ্ শাহের পাণ্ডুলিপিতেও[৪] বলা হয়েছে:

'এগার শো উনআশী কার্ত্তিকের পহেলা:
হরিষপুর গ্রামে সাঁইর আগমন হইলা।'

যশোহর জেলাধিন ঝিনাইদহ কয়।
উক্ত মহকুমাধিন হরিষপুর হয় ॥......

...তাছাড়া হরিশপুর গ্রামে লালন শাহের একজন বংশধর এখনও জীবিত রয়েছেন। ইনি ছবিরণনেছা বিবি ওরফে 'ক্ষেপুর মা'। এই 'ক্ষেপুর মা' লালন শাহ্‌দের বংশের চতুর্থ সিঁড়ির কন্যা।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, লালন শাহের জন্মভূমি যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রাম"।[৫]

এখন ওপরের এই মন্তব্যগুলি বিচারের আগে একটি ভৌগোলিক জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে নেওয়া দরকার। তা-হচ্ছে এই যে : পূর্বতন সমগ্র নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা বা আধুনিক বাংলা দেশের কুষ্টিয়া জেলার জেলা-সদর শহর [পূর্বতন মহকুমা শহর] কুষ্টিয়া শহর ও রেলওয়ে স্টেশন পদ্মা থেকে উৎপন্ন দক্ষিণ-পূর্ববাহী নদী গোড়াই এর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই "কুষ্টিয়া রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব দিকে সেঁউড়িয়া নামক পল্লীতে সাঁইজীর আখড়া, সাঁইজীর শিষ্যগণ এই স্থানেই বাস করিতেছেন। এই আখড়াতেই বঙ্গের 'সমাজহারা' সাঁইজী সমাধিস্থ হইয়া শান্তি শয়নে অবস্থান করিতেছেন"।[৬] আবার এই লালনের জন্মস্থান বলে সর্বাধিক জনের দ্বারা স্বীকৃত যে জায়গা তা : "পূর্বতন নদীয়া জেলার [বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের, অধুনা বাংলা দেশ। কুষ্টিয়া জেলা] কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালী থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণ পূর্ব কোণে গোরাই [অথবা গোড়াই] নদীর তীরবর্তী ভাঁড়রা গ্রামে লালনের জন্ম হয়"।[৭] অতএব এই হিসাব মত দেখা যাচ্ছে যে লালনের জন্ম ও সাধনস্থানের মধ্যে মাত্র কয়েক মাইলের দূরত্ব। অপর পক্ষে অতি আধুনিক কালের গবেষণায় [যা বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গেই করা হয়েছে] লালনের জন্মস্থানকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই হরিশপুর গ্রাম লালনের সাধন স্থান থেকে ন্যূনাধিক কুড়ি মাইলের মধ্যে, ভিন্ন জেলা যশোহরের অন্তর্গত ঝিনাইদহ মহকুমায় অবস্থিত। লালনের প্রকৃত জন্ম-

স্থান অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে ওপরের বিভিন্নমুখী বক্তব্যগুলির বিচার করবার পূর্বে একটি বিষয় অত্যন্ত নির্দিষ্ট করে মেনে নিতে হবে যে, কিছু ত্রুটি বা প্রকৃত গবেষক-সুলভ যুক্তি-ক্রমহীনতা সত্ত্বেও একমাত্র 'হিতকরী'র প্রবন্ধ লেখকেরই লালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। পরবর্তী আর কারুরই নয়। সকলেরই প্রদত্ত সব সংবাদই পরোক্ষ বা অনেক হাত-ফেরতা হয়ে, কিংবা স্মৃতিকথা অথবা অনুমানের দরজা পেরিয়ে এসেছে। তাই একমাত্র 'হিতকরী'র বক্তব্যই যুক্তির স্থিতিস্থাপকতায় সম্ভাব্য কতক দূর পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধিকন্তু, একেবারে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত লালন-প্রসঙ্গ রচয়িতাই সোজাসুজি অথবা ঘুরিয়ে স্বীকার করেছেন যে: 'ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।'[৮] অতএব যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে একথা মানতেই হবে যে 'হিতকরী' লালনের বয়স ও জন্ম তারিখ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার সত্যতার দায় যতখানি, লালন-জীবনীর উপকরণের অভাবের কথা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার ভারও ঠিক ততখানি, কিংবা তারও বেশী।

এছাড়াও লালনের মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে যে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রথম ও তৃতীয় জন তাঁর জন্ম-গ্রামের নাম উল্লেখ করেন নি। অথচ তাঁর আত্মীয়রা কোথায় থাকেন তা বলতে ভোলেন নি। এর কারণ কি? আমার মনে হয়, যে তাঁরা লালনের জনস্থানকে নির্দিষ্ট করার মত তথ্য হাতে পান নি। এবং সেই সময়ে কেউ তা জানতোও না। তাই তাঁরা লালনের তিরোভাবের সদ্য সদ্য সময়ে কেবলমাত্র সত্যের মুখ চেয়ে যতখানি সম্ভব নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারপর যতই দিন গেছে, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যগুলি যতই নিশ্চিহ্ন হয়েছে, গল্পের ঘোড়াও ততই গাছের উঁচু ডালে গিয়ে উঠেছে। কারণ, লালন-শিষ্য বা ঐ

অঞ্চলের অপর সকলেই ঐ ফকিরের প্রতি পোষিত ভক্তির দ্বারা এতখানি আপ্লুত ছিল যে, তাঁরা কখনই যুক্তিনিষ্ঠ সত্য কথা বলতেন না, বা বলতে জানতেন না। এবং যদি বলতেন তবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লালনের খাতা অপহরণ ও তজ্জাত বিশ্বখ্যাতি সম্পর্কিত গল্পও সত্য হিসেবে গৃহীত হতো না। এবং এই থেকেই লালনের সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনের সবটুকুই কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে।[৯]

অথচ এই ভাঁড়রা গ্রামে প্রবেশ করে দেখা যাচ্ছে যে এখানে 'ইহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই'।[১০] অথবা 'যে স্থানে আমার বাড়ী তাহার অপর পাড়া অর্থাৎ ভাঁণ্ডারা বা ভাণ্ডারিয়া গ্রামে যে স্থানে সম্প্রতি দুঃখী সেখ চৌকিদার বাড়ী করিয়া আছে, ঠিক সেই স্থানেই সাঁইজীর জননী শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁহার পূর্ব-পুরুষের বিষয় ঠিক ঠিক বলিতে সক্ষম এমন কেহ আর [১৩৩২ বা তার সম-সময়ে] জীবিত নাই। তবে সাঁইজী এই গ্রামেরই লোক ইহা প্রাচীন অধিবাসীদিগের প্রায় সকলেরই জানা আছে। এই স্থানে সাঁইজীর বিশেষ কোন পরিচয় গ্রহণ করিতে না পারায় সেঁউড়িয়ার আখড়ায় যাই"।[১১]

এইভাবে লালনের মৃত্যুর সমসময়ে বা তার কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে তাঁর নিজের জন্ম স্থান বলে কথিত গ্রামে তাঁর বিষয়ে কিছুই খবর পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কারণ, সংগ্রহের মত কোন প্রকৃত তথ্য কোথাও কিছু নেই বলে। যা ছিল তা হচ্ছে ভক্তের তৈরী অলৌকিক এবং অমানবীয়-কল্প জীবন-কথা। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশেই ভক্তেরা একই ভাবেই তাঁদের উপাস্য দেবতাকে, গুরুকে, নির্মাণ করে নিয়ে থাকেন। লালনের ক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটবে তাতে আর বৈচিত্র্য কোথাও।

অবশ্য যাঁরা সিরাজ সাঁই [লালন-গুরু]-এর জন্মস্থান পূর্বোক্ত হরিশপুর ধরে নিয়ে লালনের জন্মস্থান এইখানেই নির্ণয় করেন, তাঁরা কিন্তু:

এক. সিরাজ সাঁই-এর জীবন-বৃত্ত সম্পর্কে নির্দিষ্ট এবং পাথুরে

প্রমাণ সম্বন্ধ কোন যুক্তি দিতে পারেন না। অবশ্য সিরাজ যে পাল্‌কী বাহক ছিলেন তা মোটামুটি ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। দুই বিভাগ-পূর্ব এবং উত্তর দুই বাংলার যাবতীয় লালন-জীবন গবেষণা তাঁর মধ্য-জীবনের দেশ ভ্রমণ বা তীর্থ দর্শন, বসন্ত রোগাক্রমণ[১২] ঘটনাগুলি যে ভাবেই হোক তাঁদের আলোচনার মধ্যে যুক্ত করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ লালন কোন সুদূর জন্মস্থান ও মুসলিম পরিবেশ [?] ছেড়ে জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের কোনো এক সময়ে [এই একটি বাস্তব বিষয়েও কেউই নির্দ্দিষ্ট তারিখ দিতে পারেন নি] কুষ্টিয়া শহরের নিকটে আশ্রম বা আখড়া নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন, তাঁর কোন সদ্-যুক্তি দিতে পারেন না।

এই সমস্ত বক্তব্য এবং তাদের দুর্বলতা ও অব্যাপ্তি দোষ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে, ছেঁউড়িয়ার আশ্রমের বাস্তব উপস্থিতি লক্ষ্য করে বলা যায় যে : লালন যেমন বাউল হয়ে গিয়েও সৎ-গৃহস্থের মত সংসার করে, পার্থিব সুখ ও সম্পদ ভোগ এবং সঞ্চয় করে পরবর্তী উত্তর পুরুষদের জন্য সঙ্গীত ও 'নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার' রেখে মর্ত্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন; ঠিক তেমনিই জীবন ও জগৎমায়ার আকর্ষণেই পূর্বাশ্রমের অতি নিকটেই ফকিরের আস্তানা গেড়েছিলেন। এ যেন একই সঙ্গে বৈরাগ্যের ও সন্ন্যাসের জোয়ার—ভাঁটা। সংসার সীমান্তেই, গৃহত্যাগীর তপোবন।

অর্থাৎ যদিও নিশ্চিত করে লালনের আদি জন্ম নিবাস নির্ণয় করার কোন পাথুরে সাক্ষ্য নেই, তথাপি যদি সাধারণ ভাবে স্বীকার করতেই হয় তবে তা এই যে, যশোহরের হরিশপুর নয়, কুষ্টিয়ার ভাণ্ডারা বা 'চাপড়ার জোড়া গ্রাম ভাঁড়রায়' লালনের জন্ম হয়েছিল।

১। 'On Curious Tenets and practices of a Certain class of Faquirs of Bengal'. : *The Journal of the Authropological Society of Bombay* : Vol V No. 4. : 1900 : p 217.

২। দ্র. অনুসূত্র 'খ'।

৩। মহম্মদ আবুতালিব : 'লালন শাহ, ও লালন-গীতিকা : ১ম খণ্ড [ঢাকা. ১৯৬৮] : পৃ. ১৬।

৪। অনুসূত্র 'ঘ' তে এই পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত করে দিয়ে তার যথার্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৫। মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত : 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ' [কলিকাতা : ১৯৭০] : অন্তর্গত প্রবন্ধ : এস. এম. লুৎফর রহমান : 'লালন শাহের জীবন-কথা' : পৃঃ ২২৭—৮।

৬। আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারক গ্রন্থ' [ঢাকা : ১৯৭৪] : পৃ. ১২।

৭। ড. উপেন্দ্রনাথ ভটাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' : কলিকাতা ১৩৬৪ : দ্বিতীয় খণ্ড : পৃ. ৬।

৮। দ্র. 'হিতকরী'-র প্রবন্ধ।

৯। ১৮৯০-তে আবদুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধে এবং আধুনিক পূর্ব পাকিস্তানের [অধুনা বাংলা দেশ] গবেষণায় এই বিষয়ে যা আলোচনা করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা অনুসূত্র 'ঘ' করা হয়েছে।

১০। দ্র. ৮নং পাদটীকা।

১১। দ্র. ৬নং পাদটীকা : পৃঃ ১২।

১২। যেহেতু লালন-গবেষকদের মধ্যে একমাত্র 'হিতকরী'র প্রবন্ধকার তাঁকে চাক্ষুস দেখার সৌভাগ্য লাভ করে লিখেছিলেন : 'ইহার মুখে বসন্তের দাগ বিদ্যমান ছিল'।—সেই কারণে পরবর্তী প্রত্যেকই লালন জীবনের এই দুর্ঘটনাকে কোন—না কোন ভাবে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন।

৩.

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' :

লালন-চর্চার ক্ষেত্রে লালনের জাতি পরিচয় অর্থাৎ তিনি হিন্দু না মুসলমান এই সমস্যাও অত্যন্ত ঘোর হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে, বা লালনের ফকির জীবনের আচার-আচারণ যিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এমন একমাত্র ব্যক্তির বক্তব্য লিখিত হয়ে আছে 'হিতকরী'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এই দিক থেকে তাঁর বক্তব্যই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। আমরা এখানে সেই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর সাহায্যে দেখতে পাচ্ছি যেঃ 'লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত; বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতি ভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে; কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন, ...ইনি নোমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়, তবে জাতিভেদহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন।' অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে বাউল-দরবেশ ইত্যাদি সাধন মার্গের ভক্ত বা-সাধকদিগের প্রকৃত পক্ষে যে উদার মানব-ধর্মকে আশ্রয় করা উচিত, লালনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু গবেষকের জিজ্ঞাসা এতে তৃপ্ত হতে পারে নি। সে চায় জানতে যে কোন ধর্মাবলম্বী পিতা-মাতার সন্তান ছিলেন লালন? অর্থাৎ ঋকৃথ হিসেবে তিনি বাংলার দুটি প্রধান ধর্ম, হিন্দু বা মুসল-

মান কোনটিকে লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে ১৮৯০-এর 'হিতকরী' থেকে আরম্ভ করে মৌলভী আব্দুল ওয়ালী সাহেব, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মতিলাল দাশ প্রমুখ স্বাধীনতা পূর্ব সমস্ত লালন-জীবনী পর্যালোচকই লালনকে কায়স্থের সন্তান [কুল—বাচি 'কর' বা 'ভৌমিক'] বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বিশেষ করে বিগত দশকে পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব বাংলায় [আধুনিক 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র] যে-কয়টি প্রধান প্রধান লালন চর্চা হয়েছে তার প্রায় সব কটিতেই বলা হয়েছে যে লালন মুসলমানের সন্তান। অধিকন্তু ঐ সব গবেষকেরা লালন, এমনকি তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই-এর সুদীর্ঘ বংশ-লতিকাও নির্মাণ করে ফেলেছেন।

একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে লালনের এই মুসলমান ঘরে জন্ম নেওয়ার বিষয়টি প্রতিপন্ন করার পেছনে পরোক্ষে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দুঃখজনক প্রবৃত্তিটি সক্রিয়। আমি এমন বলি না যে লালন হিন্দু বা কায়স্থই ছিলেন এবং যিনিই তাঁকে মুসলমান প্রমাণ করতে সচেষ্ট হবে তিনিই সাম্প্রদায়িক। আসলে, গৌড়-বঙ্গের এই সমস্ত লৌকিক ধর্মগুলির উৎস, সাধনতত্ত্ব এবং দার্শনিক পটভূমিকা সৃষ্টির সমাজ-ঐতিহাসিক বোধটি সম্যক্‌রূপে পরিচ্ছন্ন না থাকায় এমন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ও সমাজ-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং তৎপরবর্তী কালে তারই বিবর্তন ধারায় গৌড়-বঙ্গের এই সব লৌকিক ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলির জন্ম হয়েছিল' তার কথা মনে না থাকায় বাউল-ফকিরদের জাত বিচারে এমন ধাঁধা লেগেছে।

দ্বিতীয়ত, লালন বা এই সমস্ত ফকিরদের জাত বিচারের দ্বারা ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিক কিংবা ধর্মতাত্ত্বিক কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি? উত্তরে বলা যায় যে, কখনই না। কারণ এঁরা যে ধর্মমত অনুসরণ করেন বা যে সাধন মার্গের পথে চলেন সেখানে হিন্দুও নেই, মুসলমানও নেই—উভয় সম্প্রদায় থেকেই তাঁরা 'সমাজহারা'—তাই

তাঁরা বাউল। এমন কি জন্মসূত্রে তাঁরা যে সম্প্রদায়ের সংস্কারই ঋক্‌থ হিসেবে রক্তের ও মননের মধ্যে বহন করে নিয়ে আসুন না কেন, বাউল [ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে] সাধনার উচ্চতম কোঠাতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুকেই মনের মানুষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করে জাতের ফাতাকে সাধ-বাজারে বিকিয়ে দেন। মন 'বাসি করা' সাদা কাপড়ের মত না হলে, সংস্কার শিশুর মত বসনহীন না হলে কি বাউল হওয়া যায়? তবুও গবেষক বলবেন যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-ক্ষুব্ধ মন সত্য কি বা কোনটা, তা জানতে চেষ্টা করবে না? লালন হিন্দু না মুসলমানের সন্তান তা সত্য করে জানাই তো প্রকৃত গবেষকের কাজ। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে দ্বিমত পোষণ করলেও এখানে বিষয়টিকে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

এক. আমরা আগেই 'হিতকরী' কর্তৃক লালনের জাতি নির্ণয়ের চেষ্টার কথা উল্লেখ করে এসেছি। এছাড়াও 'হিতকরী' আরও বলছেন: 'তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইহার জাতি।'

দুই. মৌলভী আব্দুল ওয়ালি সাহেব বলেছেন: Here [at Siuarya] he lived, feasted, sang and worshipped and was known as Kayastha.'[২]

তিন. 'লালন জাতিতে কায়স্থ, কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপড়া গ্রামের ভৌমিকেরা তাঁহার স্বজাতীয়।'[৩]

চার. লালনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহাশয় লালনের জন্ম [?] ও সাধন-স্থান ভাঁড়রা ও ছেঁউড়িয়ার সন্নিকটে কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী থানার ধর্মপাড়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি তাঁর ১৩৩২ সনে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'ফকির লালন সাহ' এবং ১৯৫৪ [বাং ১৩৬১] খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'মহাত্মা লালন ফকির' গ্রন্থে যে পূর্ণাঙ্গ লালন-জীবন-বৃত্তানুসন্ধানের সূত্রপাত করেন তারই স্মৃতিচারণা করে সম্প্রতি লিখেছেন: 'সাঁইজী

কায়স্থ কুলে চাপড়ায় বিখ্যাত কর মহাশয়দের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।··· তাঁহার পিতার নাম মাধব কর। শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে।··· সাঁইজীর মাতামহের নাম ভস্মদাস। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম কৃষ্ণদাস ও রাজু দাস [রাজেন্দ্র হইতে অপভ্রংশ রাজু]। কন্যাত্রয়ের নাম রাধামণি, নারায়ণী ও পদ্মাবতী।··· পদ্মাবতীর একমাত্র তনয়ই এই প্রবন্ধের বর্ণিত মহাপুরুষ। ···সাঁইজীর বাল্য নাম লালন কর। তিনি যে পাড়ায় বাস করিতেন তাহা অদ্যাপি দাসপাড়া নামে খ্যাত।'

বঙ্গ-বিভাগ-পূর্ব সময়ের সমস্ত আলোচনাতেই মোটামুটি ভাবে উক্ত আলোচনাগুলির ধারা অনুসৃত হয়ে এসেছে। তারপর স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গে একান্ত ভাবে লালন-চর্চার পরিমাণ খুবই কম। মনে হয়, লালনের কর্মক্ষেত্র পাকিস্তানের অংশে পড়ে যাওয়াই এর অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এ বিষয়ে নানাদিক থেকে নানা ধরণের আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনার মৌল প্রতিপাদ্য ঐ দেশের দু-জন প্রধান লেখকের মধ্যে সংহত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তাঁদের একজন হচ্ছেন মুহম্মদ আবু তালিব এবং দ্বিতীয় জন হচ্ছেন এস. এম. লুৎফর রহমান।[৪]

ক. তালিব সাহেব বলেছেন : 'আমাদের সুধী সমাজ যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া গেছে, লালন মুসলিম-সন্তান। মুসলিম মাতা-পিতারই সন্তান।···পিতা দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান, মাতার নাম আমিনা খাতুন। গোলাম কাদির দেওয়ান তাঁর দাদার নাম'।[৫]

খ. লুৎফর রহমান সাহেব নানা সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করার পর [আমরা পরে তার যাথার্থ্য বিচার করেছি] বলেছেন : "লালন শাহ সত্যই যে মুসলিম-সন্তান এবং নিজেকে তিনি সকল ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে 'বাউল মতবাদী' বলে প্রমাণ করতে চাইলেও ইসলাম ধর্মের উত্তরাধিকার একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি তার প্রমাণ প্রাগুক্ত 'খাতনার জাত' উক্তির মধ্যে ও তাঁর স্বরচিত

গানের ভণিতা ব্যবহারের ধারার মধ্যে লুক্কায়িত। এ জন্যে তাঁকে প্রচ্ছন্ন মুস্লিম বলা চলে। অতএব ভণিতা বিশ্লেষণ, দুদ্দু শাহের বিবরণ, নবদ্বীপের ঘটনা, লালন-পরিচিতির বর্ণনা, দান-পত্রের উল্লেখ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের ইংগিত, সর্বোপরি লালন শাহের স্বরচিত কবিতায় বিধৃত উক্তি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে—লালন শাহ্ মুস্লিম সন্তান ছিলেন।"[৬]

এখন এই মতামতগুলিকে অনুসরণ করে লালনের জাত বিচারে অগ্রসর হওয়া যাক। প্রথমেই আমরা সর্বাধুনিক অন্বেষণে প্রাপ্ত তথ্যগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে তাঁর মুসলিম origin-কে বিচারের চেষ্টা করবো।

লালনের মুসলমান-সন্তান হওয়া প্রমাণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে: "তাছাড়া লক্ষণীয় যে, হিন্দু-পদকর্তা গুরুর নাম ব্যতীত যে-পদের ভণিতায় শুধু নিজের নামোল্লেখ করেছেন সে পদে নিজের নামের পূর্বে 'গোঁসাই,' 'পাগল', 'খ্যাপা' ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে এ-সব ক্ষেত্রে মুসলিম পদকর্তা-গণ নিজের নামের পূর্বে 'ফকীর', 'শাহ্' 'অধীন' প্রভৃতি শব্দ যোগ করেছেন।

"হিন্দু ও মুসলিম বাউল পদকর্তাদের এই ভণিতা ব্যবহারের ধারাটি মৌলিক"।[৭] এরপর প্রবন্ধকার লালন ও দুদ্দু শাহের তিনটি করে ভণিতার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখছেন: 'অতএব ভণিতা বিশ্লেষণ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, লালন শাহের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার মূলত ইস্লামী।' প্রথমত, লেখকের মন্তব্য আদৌ ঠিক নয়। কারণ পূর্বোক্ত আবু তালিব বা মতিলাল দাশ [কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত] সংগৃহীত দুই বৃহত্তম লালন গীতিকা-সংগ্রহ গ্রন্থ থেকে অসংখ্য ভণিতা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে, লালন কোথাও উক্ত প্রবন্ধকার-নির্দিষ্ট ভণিতা ব্যবহারে মুসলমান ঐতিহ্য নির্দেশক কোন প্রবণতার অধীন আদৌ হন নি। আমরা এখানে

উভয়ের সংকলন থেকে তিনটি করে উদ্ধৃতি দেবো আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে :

আবু তালিব-এর সংগ্রহ :

ক. 'যদি চেতনে-মানুষ পাই, তাহারে সুধাই
লালন বলে, ঘুচাই মনের দিশে ॥' [১ম খণ্ড : পদ ২২২]।

খ. 'লালন কয়, সবিনয় করে।
সে স্বভাব ঘটনা মোর হৃদয় মাঝে।' [ঐ : পদ ২৬১]।

গ. 'লালন বলে, মোর
পাপের নাহি ওর
আশা তাইতে পূর্ণ হ'ল না ॥' [ঐ : ১২১ নং পদ]।

মতিলাল দাশের সংগ্রহ :

ঘ. 'আপন মনোগুণে
বনে কেউ বাঁধে কুঁড়ে
লালন কয়, রিপু ছেড়ে
কেলি কোথায় ॥ [পদ সংখ্যা ৫৫]।

ঙ. ['তাইত] লালন বলে,
পেট ভরলে হয় কি আর গুরু গোঁসাই' ॥ [ঐ : ৫৬ পদ]।

চ. 'লালন বলে, করবি হায় হায়
ছেড়ে গেলে প্রাণ পাখি ॥' [ঐ : ৩৭৯ পদ]

অধিকন্তু, আমরা দুদ্দুশাহ রচিত গানেরও কয়েকটি ভণিতার উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাবো যে মুসলমান বাউল বলে স্বীকৃত এই কবি-সাধকও এ ব্যাপারে কোনো মুসলমান নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্য অনুসরণ করেন নি। আমরা এই উদ্ধৃতিগুলি বোরহান-উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত 'বাউল গান ও দুদ্দুশাহ' গ্রন্থ [বাঙলা একাডেমী : ঢাকা : ১৩৭১] থেকে সংগ্রহ করেছি। উদাহরণগুলি এই :

ছ. 'এ জনম দুর্লভ জেনে
ধর মানুষের চরণে
বিনয় করে দুদ্দু ভনে, কে দেবে তার ঠিকানা ॥' [পদ সংখ্যা ১৪]

জ. 'অন্ধ গোঁড়ামির বিকারে
শূন্যেতে ভরলি ঘটরে
দুদ্দু কয় সে আপন ধান্দায় এখনো ঘুরে বেড়ায় ॥' [পদ ১৮]।

ঝ. 'অখণ্ড ইক্ষু জ্বালের দ্বারায় গুড় কি চিনি তাতে
কিছুই প্রাপ্তি নয়।
দুদ্দু তাই পেলে রসিক নাম পাড়ায়,
শুধুই গরল উপার্জন।' [পদ সংখ্যা ২৫]।

ঞ. 'এলো রে ধর্ম কলি কাল
ছোট বড় এক হবে সকল
সেই আশাতে ফেলছি নয়ন জল, দুদ্দু সর্বদাই ॥' [পদ ১২৬]।

এখন মনে হয় আর ভণিতা-বিচারের প্রয়োজন হবে না। এবং এই ভণিতা-বিচার থেকে একথা আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে লালন অন্যান্য অনেক বাউলের মতই মূলত 'ইস্‌লামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার' রূপে পরিচিত কোন খণ্ডিত বা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন নি।

দুদ্দু শাহের যে 'কলমী পুঁথি'র সাহায্য নিয়ে লালনকে মুসলমান বলা হচ্ছে আমরা তার বিশ্বাস-যোগ্যতা সম্পর্কে [authenticity] সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করি। অনুসূত্র 'ঘ'-তে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বাহুল্য বোধে এখানে আর সে-সম্বন্ধে কিছুই বলা হলো না।

'নবদ্বীপের ঘটনা' এবং 'দান-পত্র' এগুলিও উক্ত দুদ্দু শাহের রচিত লালন-পরিচিতির মধ্যে গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে এবং দান পত্রটিও জাল বা ঐ ধরণের কিছু, পরবর্তী কালের অর্বাচীন রচনা— অধিকন্তু এ সম্বন্ধেও কোন প্রত্যক্ষ বা পাথুরে সাক্ষ্য নেই। অতএব

এ সম্পর্ক ধরে আমরা লালনের মুসলিম-সন্তান হওয়ার মতকে গ্রহণ করতে পারি না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা চিত্রের ইংগিত বলতে কি বোঝায়। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার নিজেই বলেছেন : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালন শাহের মূল চিত্রেও দেখা যায় তিনি মুসলমানের ন্যায় গুম্ফ রাখতেন।'[৮] আমরা এই গ্রন্থের যথাস্থানে লালনের অবয়বের রেখাচিত্রের অবিকল প্রতিচিত্র দিয়েছি এবং তাঁর এই চিত্রের সম্পর্কে আলোচনাও করেছি। এবং আমিই সমগ্র গৌড়বাসীর মধ্যে প্রথম, দীর্ঘ ৮৬ বছর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা উক্ত রেখাচিত্রটি, যা হারিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়েছিলো তাকে, জনসমক্ষে আবার প্রকাশ করলাম। সহৃদয় পাঠক বিচার করে দেখুন যে এই চিত্র অনুধাবনে লালনকে একজন সাধক বা ভক্তের অতিরিক্ত কোন মুসলমান বা হিন্দু-সন্তান রূপে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা যায় কি না ?

এইবার আমরা লালনের স্বরচিত কবিতায় বিধৃত উক্তি থেকে কি উদ্ধার করতে পারি দেখি ?

আজ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে ১৯৭৮, সমগ্র বঙ্গদেশের সমস্ত লালন-আলোচক উল্লেখ করেছেন যে, লালনকে যখনই তিনি কি জাত বা কোন জাতের সন্তান এই কথাটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তখনই লালন গানের মধ্যে দিয়ে তার উত্তর দিয়েছেন। এই গানটি বিখ্যাত। অনুসূত্র 'ক' এবং 'খ'-তে তাদের তিনটি পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্যে এখানে তাদের আর একবার উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হচ্ছে। মোটামুটি ভাবে মূল পাঠটি এই :

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।

১। কেউ মালা কেউ তজবী গলায়,
তাইতে ত জাত ভিন্ন বলায়,

যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার, রে ॥

২। যদি সুন্নত দিলে হয় মোসলমান।
নারীর তবে কি হয় বিধান।
বামন চিনি—পৈতা প্রমাণ,
বাম্‌নী চিনি কিসে রে ॥

৩। জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা,
লালন যে জেতের কাতা, [ফাতা]
ঘুচিয়েছে সাধ্‌-বাজারে।'

একমাত্র 'ভারতী' [১৩০২ সাল]-তে যে এগারটি গান সরলা দেবী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে তার নয় নম্বর উদ্ধৃতিতে উপরোক্ত দ্বিতীয় স্তবকটি ছাড় আছে। কেন তা জানি না—অথচ ঐ একই প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গানটির পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পরবর্তী কালেও, সর্বশেষে লুৎফর রহমান সাহেব পর্যন্ত দু-একটা বানান বা শব্দের এদিক ওদিক করা ছাড়া গানটির দেহ ও রূপ অবিকল রেখেও গানের দ্বিতীয় স্তবকটিকে প্রথমে এনেছেন এবং প্রথমটিকে দ্বিতীয়ে এনেছেন ; কেন এ রকম করলেন ? কিন্তু এরই মধ্যে আবু তালিব সাহেব সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে দ্বিতীয় স্তবকের 'যদি সুন্নত' শব্দ দুটিকে পরিবর্তন করে 'খাত্‌না'[৯] শব্দটি বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন ? বিগত আশী বছর ধরে যে গানের রূপ প্রায় অবিকৃত রয়েছে,—এমন কি আবু সাহেবের সংগ্রহ-গ্রন্থের দু-বছর পরে প্রকাশিত লুৎফর রহমান সাহেবের প্রবন্ধেও এই গানটির উদ্ধৃতিতে যে পরিবর্তন গৃহীত হয়নি, সেখানে কেন এই একটি শব্দে ভিন্নতা করা হলো ? এর পেছনে কি কোনো মোটিভ সক্রিয় ? স্বভাবতই সন্দেহ হয় যে 'খাত্‌না' শব্দটি লালনকে মুসলমান প্রমাণের প্রয়োজনেই ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।[১০]

এরপর তালিব ও লুৎফর সাহেব উভয়েই একটি গোটা গানের

উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ভণিতার সঙ্গে ঐ 'খাতনার জাত' শব্দের ব্যবহার দেখিয়েছেন। বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার জন্যে প্রথমেই ঐ গানটির উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন :

'সবে বলে, লালন ফকীর হিন্দু কি যবন।
লালন বলে, আমার আমি না জানি সন্ধান ॥

একই ঘাটে আসা-যাওয়া,
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া,
কেউ খায় না কার ছোঁওয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥

বেদ-পুরাণে করেছে জারী
যবনের সাঁই, হিন্দুর হরি,
লালন বলে, তাও বুঝতে নারি
দুইরূপ সৃষ্টি করলেন কিরূপ প্রমাণ ॥

বিবিদের নাই মুসলমানী,
পৈতা নাই যার সেও বাওনী
বোঝো রে ভাই দিব্যজ্ঞানী,
লালন তেমনি **খাত্‌নার জাত*** এক খান ॥'

লালনের মুসলমান প্রমাণাত্মক 'খাতনার জাত'-[১১] ভণিতা সমৃদ্ধ এই পদটি আমরা আবু তালিব সাহেবের পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ২৯৩ সংখ্যক গান থেকে সংগ্রহ করলাম।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত আবু সাহেবের উক্ত 'লালন-গীতিকা' সংগ্রহ প্রকাশের দু-বছর পরে ঐ একই দেশের অপর এক লালন গবেষক এস. এম. লুৎফর রহমান কর্তৃক পাঠান্তর সহ গানটিকে প্রকাশ করলেন। তাঁর পাঠটি নিম্নরূপ :

'সবাই শুধায় লালন ফকীর
হিন্দু কি যবন।

---

* স্থূলাক্ষর আমার : গ্রন্থকার।

কারে বা বলব আমি
না জানি সন্ধান ॥
বেদ-পুরাণে করেছে জারী
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
তাও তো আমি বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন—
তার কি প্রমাণ ॥
একই পথে আসা-যাওয়া
একই পাটুনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায় না কারো ছোঁওয়া
ভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥
বিবিদের নাই মুসলমানি,
পৈতে যার নাই সেও তো বাম্‌নি
[বোঝা রে ভাই দিব্যজ্ঞানী]
লালন তেম্‌নি—
খাত্‌নার জাত* একখান ॥

উভয়বঙ্গের সর্বপ্রবীণ এবং আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁর 'হারামণি' নামক গ্রন্থের প্রথম থেকে সপ্তম খণ্ডের মধ্যে লালনের প্রায় পাঁচশত গান প্রকাশ করেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত খাতার গানের সঙ্গে নিজের জোগাড় করা গানের সংখ্যা মিলিয়ে চার শত বাষট্টিটি গান নিয়ে 'লালন গীতিকা' নামক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন মতিলাল দাশ। এটিও একটি বৃহৎ লালন-গীতি-সংগ্রহ গ্রন্থ। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে এক-শ' ষাটটি লালনের গান প্রকাশ করেন [১ম সংস্করণ]। এ সংগ্রহটিও নেহাৎ ছোট নয়। এই মাত্র সেদিন [১৯৭১] পঞ্চান্নটি লালনের গান সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম তাঁর 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান' গ্রন্থে। এছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত লালনের গানের সংগ্রহ-গ্রন্থ আছে—তার কোথাও

* স্থূলাক্ষর আমার : গ্রন্থকার

কিন্তু ওপরের ঐ গানটিকে ঐ ভাবে,—অর্থাৎ 'খাতনার জাত' শব্দ-দুটি সহ সংগৃহীত হতে দেখছি না। এমন একটা প্রয়োজনীয় গানের এই রকম দীর্ঘ আত্মগোপন এবং হঠাৎ আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিক কারণেই গানটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করে [এ-প্রসঙ্গে লালনের গানগুলি যেখানে সংগৃহীত হয়েছে তার ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

দ্বিতীয়ত, এই গানের যে ভাব ও বক্তব্য তা কিন্তু লালনের জন্ম-গত জাতি নির্ণয়ের প্রশ্নের উত্তরসূচক যে গানটি অপরাপর সংকলন গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে তাদের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন; একমাত্র শেষ চরণ ব্যতীত।

তৃতীয়ত, সমগ্র গানটির মর্ম এবং বক্তব্যের যে ক্রম ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পরিণতিতে পৌঁচেছে তাতে শেষ চরণটি যেমন আকস্মিক তেমনি সমগ্র ভাব-তাৎপর্যের বিচারে একেবারে বেমানান। একটু রস প্রাজ্ঞতার দৃষ্টিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে।

চতুর্থত, লুৎফর রহমান সাহেব তাঁর প্রবন্ধে[১২] লালনের 'জাতি ও বংশ-পরিচয়' নির্ণয়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর মুখ দিয়ে পরপর চারটি গান-এর উদাহরণ দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রথমটি সুপরিচিত এবং বিখ্যাত ও সমস্ত সংগ্রহ গ্রন্থেই সংকলিত—বাকী তিনটি কোথাও পাওয়া যায় না। এমন কি আবু তালিব সাহেবের সংগ্রহেও নয়। এই সংশয়ের উত্তরে বলা যায় যে লুৎফর সাহেব প্রবন্ধটি খুবই আধুনিক [১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থবদ্ধ]; অতএব সদ্য সংগৃহীত হয়েছে এগুলি। তাই যদি হবে তবে আরও সম্প্রতি কালে [১৯৭৪] মনসুর উদ্দীন সাহেব যে পাঁচ-শ তেষট্টিটি লালন-গীতি-কার বর্ণানুক্রমিক সূচী তৈরী করলেন তার থেকে লুৎফর সাহেবের উক্ত তিনটি গানই বা বাদ পড়লো কি ভাবে, অধিকন্তু বৃদ্ধ মনসুর সাহেব যে রহমান সাহেবের সর্বাধুনিক লালন-জিজ্ঞাসা এবং তার অভিনবত্ব সম্পর্কে কিছু জানেন না, এমনও নয়।

পঞ্চমত, লালন কোন জাতির ছেলে জিজ্ঞাসার উত্তরের পর তিনবার গানের মধ্যে দিয়েই[১৩] 'বিশ্ব-মানবতার প্রবক্তা লালন শাহ, মানব-জাতির কোনো বিভাগ-উপবিভাগের' হাতেই নিজের জন্ম রহস্যটির বন্ধন-সূত্র ধরিয়ে দেন নি, অথচ মাত্র দু-এক জনের সংগ্রহে ব্যবহৃত একটি মাত্র গানের শেষ চরণে এই ভাবে নিজেকে ভেদবুদ্ধির খাদে স্বেচ্ছায় নিক্ষেপ করবেন, এও কি সম্ভব ? লুৎফর রহমান নিজেই বলছেন : 'গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর এ শ্রদ্ধাহীনতা নিছক ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।…যিনি মানব ধর্মে বিশ্বাসী, মানুষের কখনো জাতি-বিচার সম্ভব নয় বলে যাঁর ধারণা… তিনি এই জবাব দিতে পারেন না।' এবং তাই বলতে হয়, আবু তালিব ও লুৎফর সাহেব কর্তৃক ব্যবহৃত উক্ত 'খাত্‌নার জাত' শব্দটি লালনের নয়—ওটি ওর দেহে স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্রক্ষিপ্ত। এমন কি গানটিকে ভেজাল বলতেও বিশেষ দ্বিধা হয় না।

এখন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও একটা জবাবের অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। ১৩৬১ বঙ্গাব্দে শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত, সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ লালন-জীবন চর্চাকারী বসন্তকুমার পাল রচিত গ্রন্থ 'মহাত্মা লালন ফকির'-এর ১৯ পৃষ্ঠায় আবু তালিব ও লুৎফর রহমান সাহেবের ব্যবহৃত উক্ত গানের কিয়দংশ সংগৃহীত আছে। তার রূপটি এই :

'সবে বলে লালন ফকির, হিন্দু কি যবান,
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
তবে কেউ খায় না কারও ছোঁয়া
ভিন্ন জল কোথাতে পান,
বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতা যার নাই সেও তো বাম্‌নী
দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানী
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কিরূপ প্রমাণ।'

এরপর পাল মহাশয় লিখছেন যে : 'অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।' ইনি না পারলেও ওঁরা পেরেছেন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে এবং কাব্য-বক্তব্যের রস-নিষ্পত্তিকে নিহত করে। কেমন ভাবে-এখন তা বিচার করা যাক্।

বসন্তবাবু গানটির যে অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করতে পারেন নি, উক্ত দুই জনে তা করেছেন। তা হচ্ছে চার চরণের একটি স্তবক ['বেদ পুরাণে ইত্যাদি]। লালনকে যদি প্রতিভাবান কবি বলা যায় তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে 'পোনা মাছের ঝাঁক আসা'র মত তাঁর মধ্যে গানের আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই আসতো ; তথাপি তার ভেতরেও কাব্যিক যুক্তি শৃঙ্খলা অবশ্যই ছিলো। এবং তারই সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করা যায় যে, সমাজ-আচার ও ব্যবহারিক দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমান পুরুষের মধ্যকার ধর্ম-চিহ্নগত পার্থক্য সৃষ্টি করা গেলেও, প্রাকৃতিক কারণেই উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে কোন ভিন্নতাসূচক চিহ্ন নির্মাণ করা যায় নি ; অতএব 'হে দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন সমাজ-প্রবক্তা' এই দুই পৃথক পৃথক 'প্রকার' সৃষ্টি প্রমাণিত হবে কি ভাবে, পুরুষে পুরুষে ধর্ম-ভেদ দেখানো গেলেও নারীর ক্ষেত্রে এই ভেদ-চিহ্ন কি ? অর্থাৎ প্রকৃতির ক্ষেত্রে তো সবাই এক, সবাই সমান।

অপরপক্ষে, তালিব আর রহমান সাহেব বসন্তবাবু অতিরিক্ত স্তবকের যে তিনটি চরণ সংগ্রহ করলেন এবং যার শেষ চতুর্থ চরণে বসন্তবাবুর সংগ্রহের শেষ চতুর্থ চরণটি জুড়ে গেল তাতে কিন্তু অর্থ-অসঙ্গতি সৃষ্টি হলো। কোনো প্রতিভাবান কবির পক্ষে এমনটি রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, এক. বেদ-পুরাণ হিন্দুর হরির কথা জারী করতে পারে, যবনের সাঁই-এর কথা জারী করবে কেন ? দুই. সমস্ত বাউল গানে এবং সমগ্র লালন-ভাবনায় যবনের সাঁই, হিন্দুর হরি তো দুই পৃথক রূপ নয়, উভয়েই এক। অতএব যদি এই পার্থক্য সৃষ্টির তাৎপর্য লালন বুঝতেই না পারেন তবে দুই জাতির সৃষ্টি হওয়ার প্রামাণিকতা যাচাই এর প্রশ্ন আসে কেন ?

তিন এছাড়াও যদি তর্কের খাতিরেই ধরে নেওয়া যায় যে, উক্ত স্তবকটি যথার্থই প্রক্ষিপ্ত বা জাল নয়, তবুও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথম দুটি স্তবকে মানুষের ভেদবুদ্ধিকে লালনের সংশয়-জিজ্ঞাসা দিয়ে খণ্ডন ও মানববোধ দিয়ে স্তিমিত করা হয়েছে,—'খাতনার জাত' কথাটির দ্বারা সমগ্র পদের সাধারণ-বিষয়কে বিশেষ বিষয়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত না করে পূর্ণাঙ্গ আলঙ্কারিক প্রয়াসকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পরন্তু, এ কেমন কাব্য-বুদ্ধি যে, দীর্ঘ দুটি স্তবকে যে ভেদ-প্রবণতাকে যুক্তি বিদ্ধ করে আসা হলো, শেষে সেই বিভেদের কোলে আত্মসমর্পণ করে সমগ্র কবিতার সঙ্গে কবির ভাব এবং দার্শনিকতাও মরণ বরণ করলো।

অতএব, আগে যা বলে এসেছি এখনও তাই বলছি যে, এই 'খাতনার জাত' শব্দটিকে এখানে বাইরে থেকে এনে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিষিদ্ধ এলাকায় বিনা অনুমতিতে নিঃশব্দে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়ার মতো।

এই কাজ করে তাঁরা কিন্তু মনের দিক থেকে নিরঙ্কুশ থাকতে পারেন নি। সুধী সমাজের পোষিত সমস্ত ধারণা ও যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়েও তাঁরা তাই বারে বারে সজোরে বলেছেন: 'বাউলেরা কোন জাত বিচার মানে নি। কোন বিধিবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার আওতায় তারা থাকতে চায়নি। কে হিন্দু, কে মুসলমান এ নিয়ে কোন কলহও দেখা দেয়নি তাদের মধ্যে। শাস্ত্রের অনুশাসন তারা প্রত্যাখ্যান করেছে একটি সুন্দর জীবনবোধের জন্য'।[১৪]

অতএব আমরা এমন কোনো আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক প্রমাণ পাচ্ছি না, যা দিয়ে বলতে পারি যে লালন মুসলমানের সন্তান ছিলেন।

তবে কি তিনি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাও জোর করে বলার পক্ষে নিশ্চিত, যাকে পাথুরে প্রমাণ বলে, তাও নেই। অবশ্য এই দীর্ঘ আশী বছরের মধ্যে যত লালন-চর্চা হয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র 'হিতকরী'র প্রবন্ধ লেখকই লালনকে চাক্ষুস দেখে-

ছিলেন, তাঁর সঙ্গে লালনের ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। অতএব তাঁর বক্তব্য সাধারণ ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এবং এভাবে গ্রহণ করেও সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, যেই তাঁরা বাউল হয়ে—বিশেষ করে লালনের 'মত পরম ধার্মিক ও সাধু'[১৫]—'শাস্ত্রবিধি নিয়ন্ত্রিত সমাজের হৃদয়হীন ভেদ বিচারের কলুষ থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেছেন—সেই সমাজকে পরিপূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের কাছে এই সমাজ শুধু মাত্রই শাস্ত্রের লিখন, মানবিক প্রীতি-রসের মিলনভূমি নয়। তাই, নিষ্প্রাণ বিধানের চেয়ে সজীব হৃদয় যাঁদের নিকট বড় ও মূল্যবান, তাঁরা প্রচলিত সমাজ সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়ে হৃদয়কে খর্ব করে করতে পারেন না। ঐ সম্পর্কের পরিবর্তে তাঁদের আছে এক নির্মোহ ভাবের জগৎ ও সম্পর্ক। সেখানে শাস্ত্রের লিখনের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং অসহ্য।'[১৬]

১। এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সমাজ-ইতিহাসভিত্তিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : শ্রীসনৎকুমার মিত্র : 'পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা' : কলিকাতা ১৯৭৫ : পৃ. ৭৬-৭৯।

২। 'The Journal of the Anthropological Society of Bombay' : Vol. V. No. 4. : Pombay 1900 : p. 212.

৩। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : দ্র. অনুসূত্র 'খ'।

৪। এ প্রসঙ্গে কুষ্টিয়ার সরকারী কলেজের ইংরেজী অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম কৃত 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান' [কুষ্টিয়া : ১৯৭১] গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করতে হয়। ইনিই উক্ত দু-জন গবেষকের সমধর্মী মত পোষণ করেন।

৫। 'লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা' : ১ম খণ্ড : ঢাকা ১৯৬৮ : পৃ. ১১।

৬। মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত : 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ' : [কলিকাতা ১৯৭০] : পৃ. ২৩৮, ২৪১।

৭। প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪০-২৪১।

৮। প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪১।

৯। দ্র. মুহম্মদ আবু তালিব : 'লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা' : ২য় খণ্ড ১৯৬৮ : ২৯২ সংখ্যক পদ : পৃ. ২৬৮।

১০। দ্র. প্রাগুক্ত : ১ম খণ্ড ১৯৬৮ : পৃ. ২৯।

১১। এই শব্দটি প্রসঙ্গে লুৎফর রহমান বলেছেন : 'খাত্না' প্রথা একমাত্র ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যেই প্রচলিত। তাহলে কি লালন মুসলিম-সন্তান ছিলেন?' প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, এই সব মতের বিরুদ্ধতা এবং আমার মতের পোষকতা সম্প্রতি লক্ষ্য করছি বন্ধুবর আবুল আহসান চৌধুরী রচিত 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক' [ঢাকা : ১৯৭৪] গ্রন্থে। দ্র. পৃ. ৮১-৬।

১২। দ্র. ৬নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ২২৮-২৩৫।

১৩। প্রাগুক্ত।

১৪। দ্র. ৪নং পাদটীকা : পৃ. ২০০।

১৫। 'হিতকরী'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ। দ্র. অনুসূত্র 'ক'।

১৬। ড. অরবিন্দ পোদ্দার : 'মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ'।
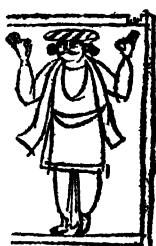
ঠিক কত বছর বয়সে লালন সন্ন্যাস গ্রহণ করে বাউল হন তার হদিশ উদ্ধার করা আজ একান্ত ভাবেই কঠিন। এ নিয়ে গল্প কথা রচনা করা সহজ, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস নির্মাণ করা দুঃসাধ্য। এমন হওয়ার কারণ আমরা আগের অধ্যায়গুলিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। তবে একথা ঠিক যে বাউল ধর্মে প্রবৃত্ত হয়েই লালন কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করলেন, আগে কোন প্রস্তুতিই ছিল না-এমন কথা মনে করলে, বস্তুনিষ্ঠাকে অসম্মান করা হয়। সন্ধ্যে বেলায় প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সকাল বেলায় সল্‌তে পাকাবার প্রস্তুতি থাকে, ঠিক তেমনি কবি-লালনের কাব্য-প্রতিভার একটি পূর্বকাণ্ড ছিলোই ছিলো: আজ তার জন্ম পত্রিকা খুঁজে পাওয়া না গেলেও।

এহেন বাউল-কবির গানের একটি মাত্র মুদ্রিত রূপ দেখা গেল তাঁর [লালনের] মৃত্যুর চৌদ্দ দিন পরে পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকার পাতায়। আমরা অনুসূত্র 'ক'-তে তার উল্লেখ করেছি। এর আগে মীর মশারফ হোসেনের 'আত্ম-জীবনী' বা 'সঙ্গীত-লহরী' অথবা সতীশচন্দ্র মজুমদারের 'কুড়ানো সঙ্গীত'-এ হয়ত দু-চারটে লালন-গান উদ্ধৃত থাকতেও পারে, তবে তাও ঐ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়েই।[১] অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাইশ বছর বয়সে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতী'র পাতায় যে বাউল গানের সংকলন গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন সেই গ্রন্থে খুব সম্ভব লালনের গান সংকলিত ছিল না,—থাকলে আলোচনা কালে উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে ঐ গানগুলির স্বভাব-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তার উল্লেখ অবশ্যই করতেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথের উক্ত পুস্তক-সমালোচনা প্রবন্ধের শেষে দু-তিনটি নিজস্ব সংগ্রহ থেকে যে গানের উদ্ধৃতি

দিয়েছেন তাদের বাউল গান বলা যেতে পারে না, সাধারণ ভাবে বৈষ্ণবগীতি বা গ্রাম্য-সঙ্গীত বলা গেলেও।

'হিতকরী'র পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে ১৩০২ 'ভারতী'র পাতায় সরলা দেবীর আলোচনায় লালনের আটটি গান উদ্ধৃত হলো। অনুসূত্র 'খ'-তে আমরা তারও উল্লেখ করেছি। এরপর কুড়ি বছর লালনের গানের কোন মুদ্রিত রূপ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে লালন বা বাউল গানের ভাব-সুর ও ভাষামৃত পানে বাঙালীর কি অরুচি দেখা দিয়েছিল? উত্তরে বলা যায় যে, না। কারণ, 'বাংলা সাহিত্যের উদ্যান কোণে এই জাতি-গৌরবহীন বনফুল বিনম্র সৌন্দর্যে ফুটিয়া তাহার [যে] স্নিগ্ধ সৌরভ বিলাইতেছি'ল[২] তা আদৌ অনাঘ্রাত ছিল না। এর সবচেয়ে বড় ও গৌরবজনক উদাহরণ হলো ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের মুখে রবীন্দ্র-নাথ বাউলের সুরে নিজের কথা বসিয়ে জাতির হৃদয়ে দেশবন্দনার রাখী বাঁধলেন। ঐ সালেই ৩২ পৃষ্ঠার একটি গীতি-পুস্তিকা প্রকাশিত হলো: নাম: 'বাউল'। এই পুস্তিকার সব গান পরে তাঁর গীতি-সংকলন 'গীতবিতানে'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত পুস্তিকাটি আজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে; এই বিবেচনায় উক্ত পুস্তিকাটির আখ্যাপত্রের প্রতিচিত্র একটি এখানে সংবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

এরপর থেকে 'প্রবাসী'র পাতায় 'হারামণি'র সন্ধান প্রাপ্তির সময় ব্যবধান হলো দশ বছর। সেখানে লালনের ভণিতা যুক্ত সাড়ে তেইশটি গান মুদ্রিত হলো। এই ব্যবধানকালের দশ বছর রবীন্দ্র-নাথ তথা বাঙালীর শিক্ষিত রস-রুচি কি এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিল? আবারও বলি, না। অন্তত বাঙালীর প্রতিনিধি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ: এক. তাঁর নানা আলোচনায় বাউল গানের ভাব বা প্রসাধন-সৌকর্যের উল্লেখ করছেন,[৩] দুই. নিজ জমিদারী এস্টেটের কোন এক কর্মচারীকে দিয়ে? লালনের গান সংগ্রহ করাচ্ছেন।[৪]

একক প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের লালন-গীতিকা সংগ্রহকেই সর্ববৃহৎ বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের এই সংগ্রহ সম্বন্ধে অবশ্যই

করে ফেলেছেন। কেন না, দেখা যাচ্ছে যে 'প্রবাসী'র পাতায় ১৩১৪ সালের ভাদ্র [১৯০৭ খ্রীঃ] থেকে তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের সূচনা হলে তার প্রথম দিকেই লালনের একটি বিখ্যাত গান : 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।'—উদ্ধৃত হয়েছে।[৬] এরপর সাংসারিক জীবনের ব্যস্ততা, গীতাঞ্জলির পর্ব, বিলাত ও আমেরিকা যাত্রা ও নোবেল পুরস্কার ইত্যাদির আতান্তর শেষ হয়ে স্থির হওয়া মাত্রই তিনি লালন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এবং এই প্রসঙ্গে একথা মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে যে 'প্রবাসী'র পাতায় ১৩২২ থেকে [এপ্রিল ১৯১৫] 'হারামণি' বিভাগের সূচনার পেছনে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ-ই ছিল সর্বাধিক।[৭]

এইভাবে অন্য দু-একজন এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে লালনের যে প্রায় শ-তিনেক গান আমাদের হাতে এলো ; তারই সূত্র ধরে চার-শ পাঁচ-শ হাজার হাজার লালনের গান আমাদের হাতে আসতে লাগলো। এই সমস্ত গ্রাম্য গায়কের বা রচয়িতার গানগুলি কোনো দিনই তাঁদের দ্বারা সুনির্দিষ্ট লেখ্য রূপ পায় নি। অধিকন্তু লালনের নিজের বা তদ্‌নিকটস্থ শিষ্যদের অক্ষর জ্ঞান ছিল না। ফলে, প্রথম অবস্থায় সেগুলির পরিমাণ যতখানি নির্দিষ্ট এবং আকৃতি অবিকৃত ছিলো ক্রমে যতই দিন যেতে লাগলো গায়েনের মুখে, সংগ্রাহকের আগ্রহে ততই তাদের বিকৃতি ঘটতে থাকলো। কথায় আছে : 'সাত নকলে আসল খাস্তা'। তাই যতই নকল এবং নকলের নকল হাতে থাকলো ততই লালনের গানের সংখ্যায় হাজার হাজারের আধিক্য ঘটতে থাকলো।

অধিকন্তু, বাউলেরা বা লালন, যেই হোন না কেন তাঁরা তাত্ত্বিক কবি, কবি তাত্ত্বিক নন, গান তাঁদের তত্ত্ব প্রচারের মাধ্যম মাত্র, কাব্য সৃষ্টি তাঁদের মূল লক্ষ্য নয়।[৮] এই কারণে প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান বাউল সাধক নিজেদের সাধন তত্ত্বকে প্রচার করার উদ্দেশ্যে যে গান বেঁধেছেন তাদের আন্তরধর্ম মূলত এক ; সেই দিক থেকে তাদের একজনের রচনা থেকে অন্যের রচনার সাধারণ পার্থক্য নির্ণয় করা

কঠিন। তাই, ভণিতা পাল্টে পদ কর্তার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়া খুবই সহজ। অনেক সময় ঐ সব ভাবুক রচয়িতারা স্বেচ্ছায়ই রচনা শেষে ভণিতা না দিয়ে নিজের রচনাকে মহাকালের স্রোতে নাম-গোত্রহীন ভাবে ভাসিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলেছেন : "এই সব বহু গানে ভণিতা নাই। অনেক গানে গানের রচয়িতার নামও জানা নাই। এ কথায় আমি এক বৃদ্ধ বাউলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এরূপভাবে রচয়িতাদের কথা ভুলিয়া যাওয়া কি ভাল'? তিনি তখন কিছু বলিলেন না। একটু পরে খাল ও নদীর দিকে......দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই যে নদীর নাও ভরা পালে চলিয়াছে ইহাদের কি পথ চিহ্ন কিছু আছে? আর ঐ খালের ঠেকা-নাওর পথই কাদায় কাদায় আঁকা রইল। ইহার কোনটি সহজ ও স্বাভাবিক? আমরা সহজ পথের পথিক। আমরা এই কৃত্রিম পথ-চিহ্ন রাখিয়া যাওয়াকে বড় মনে করি না'"।[৯] এই জন্যেই আজ পর্যন্ত লালনের গান হাজার হাজার সংগ্রহ করা যায় বলে উৎসাহী গবেষকেরা দাবী করছেন।

আমরা আরও জানি যে: 'বাউল গানের মূল বিষয়বস্তু একটি ধর্ম তত্ত্ব ও সেই ধর্ম সাধনার ক্রিয়া-কলাপ। ইহার পরিধি সংকীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। ব্যক্তিগত ভাবানুভূতির উৎসারণ বা কোনো বিশিষ্ট দৃষ্টি ভঙ্গীর রূপায়ণের সম্ভাবনা ইহার মধ্যে নাই।.. এখানে কবির ব্যক্তি মানসের স্বাধীন অভিব্যক্তির স্থান নাই।......কেবল ভাষা ও উপস্থাপনের মধ্যে যাহা প্রভেদ, তাহার দ্বারাই একের গান হইতে অন্যের গানের যাহা কিছু পার্থক্য সূচিত হয়।'[১০]

প্রসাধন কলার এই বিভিন্নতা দেখেই লালনের গানকে অন্যের গান থেকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেকাজও অত্যন্ত কঠিন এবং সেদিকে গলদও প্রচুর। কারণ এই বাউলেরা যেহেতু 'সহজ পথের পথিক', সেহেতু তাঁরা তাঁদের কাব্যদেহ প্রসাধনের জন্যে ব্যবহার করেন পথে পাওয়া বা দেখা সহজ জিনিষ—'পাখী', 'খাঁচা' 'নৌকা', 'উজান', 'ভাঁটি', চাঁদ', 'সূর্য', পদ্ম ইত্যাদি। অতএব আবেগ

এবং অনুভূতির টানে সকলেরই ঝুলি থেকে প্রায় একই ধরণের শব্দ, চিত্র, বা রূপকল্প প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

এরই মধ্যে লালনের যেটুকু বিশেষত্ব তা তাঁর ঐ প্রথম সংকলিত কিঞ্চিদধিক তিন শত গানের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে। তার চেয়ে বেশী বা তার পরের গান যা লালনের নামে চলছে বা চালানোর চেষ্টা হচ্ছে তার মধ্যে ভেজালই প্রধান। বিষয়টি আমরা 'কবি' পর্যায়েই আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ লালনের দু-টি গান : 'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে সে কি আর জপে মালা' এবং 'এমন মানব-জনম আর কি হবে,' উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : 'প্রাকৃত বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়াল ঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত লাঞ্ছনধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার সম্পদ্ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায়'[১১] প্রকাশিত হয়। এই আলোচনা যদিও ভাষা ও ছন্দকে অবলম্বন করে তথাপি এর মধ্যে দিয়ে লালনের, অধিকন্তু সমগ্র বাউল গানের স্বভাব সৌন্দর্যটি ধরার চেষ্টা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আর এক প্রবন্ধে লালনের একটি এবং গগন হরকরার একটি গানের প্রথম চরণের সুত্র ধরে ['খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী' এবং 'আমি কোথায় পাব তারে'] যে আধ্যাত্মিক ভাব ব্যাখ্যা করেছিলেন তার দ্বারা তাঁদের গানগুলির চিরায়ত মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইমূল্য তাঁদের গানের সাহিত্য রসেরও মূল্য। তিনি লিখেছেন : "সেইজন্যেই ওই বাউলের দলই বলছে :

'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী
কমনে আসে যায়।'

আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।'

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে'।"[১২]

এই বড় ভাবকে তারা এক সহজ-সরল সাহিত্য-মাধ্যমে প্রকাশ করে। লালন সহ সমস্ত বাউল কবির অধিকাংশ গান বিশ্লেষণ করলে আমরা সহজেই যা পাই তা হচ্ছে : 'গুরুর নিকট অকপট আত্মসমর্পণ, মানবের হৃদয়স্থিত ভগবানের নিকট দৈন্য, সাধন-ভজনে অক্ষমতার জন্য নৈরাজ্য, সাধন মার্গে ব্যক্তিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতা'[১৩] এবং তা প্রকাশের মধ্যে যে ভাবানুভূতির কারুণ্য, যে মাধুর্য, যে অপকট সারল্যের সৌন্দর্য আছে তা-ই এগুলিকে সাহিত্য-গুণোপেত করে তুলেছে। এবং এইখানেই লালন সহ অন্যান্য সকল বাউলের গানের ঔৎকর্ষ।

১। সম্প্রতি আবুল আহসান চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বাংলা দেশের ঢাকা থেকে মীর মশারফ হোসেন কৃত 'সঙ্গীত লহরী' [প্রথম প্রকাশ : ১৮৮৭ খ্রীঃ] পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। ঐ কাব্যগ্রন্থের ৮৯ সংখ্যা গানে এইভাবে লালনের নামোল্লেখ দেখতে পাচ্ছি :

'আরে ভাই না পাই দিশে, কলির শেষে,
কিসে, কার মন মজেছে।
ফিকিরচাঁদে, আজব চাঁদে,
রসিকচাঁদে সব মেতেছে।
কোথা আর পাগল কানাই, লালন গোঁসাই,
সব সাঁই এতে হার মেনেছে।'

২। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' : ১ম খণ্ড ১৩৬৪ : পৃ. ১১০।

৩। দ্র. 'ছন্দ' গ্রন্থ পরিবর্ধিত সং ১৯৬২ : পৃ. ৬,৫১, ১৩৮। এ বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে।

৪। ১৩০১ এ পঠিত 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধের ছড়াগুলি এই সময়েই সংগৃহীত হতে থাকে। দ্র. রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থ।

৫। দ্র. শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী : 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' [১৯৭৪] পৃ. ২০৫-০৬।

৬। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে 'রবীন্দ্র-ভবনে' রক্ষিত 'লালন-খাতায়' এই গানটিকে সংগৃহীত হতে দেখা যাচ্ছে না।

৭। এই বিভাগের প্রথম সংগৃহীত গান গগন হরকরার। সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে চিত্র-শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঐ গানের স্বরলিপিকার হচ্ছেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮। দ্র. মুহম্মদ আবু তালিব-প্রণীত 'লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা' প্রথম খণ্ড : ঢাকা ১৯৬৮ : পৃ. ১৭১।

৯। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন : 'বাংলার বাউল' : কলিকাতা ১৯৫৪ : পৃ. : ৬৪।

১০। দ্র. ২নং পাদটীকা : পৃ. ১০৯, ১১১-২।

১১। দ্র. ৩নং পাদটীকা : পৃ. ১৩০-১।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'শান্তিনিকেতন' : ২য় খণ্ড [১৩৬৬] : পৃ. ৩৩০-১।

১৩। দ্র. পাদটীকা নং ২ : পৃ. ১১১-২।
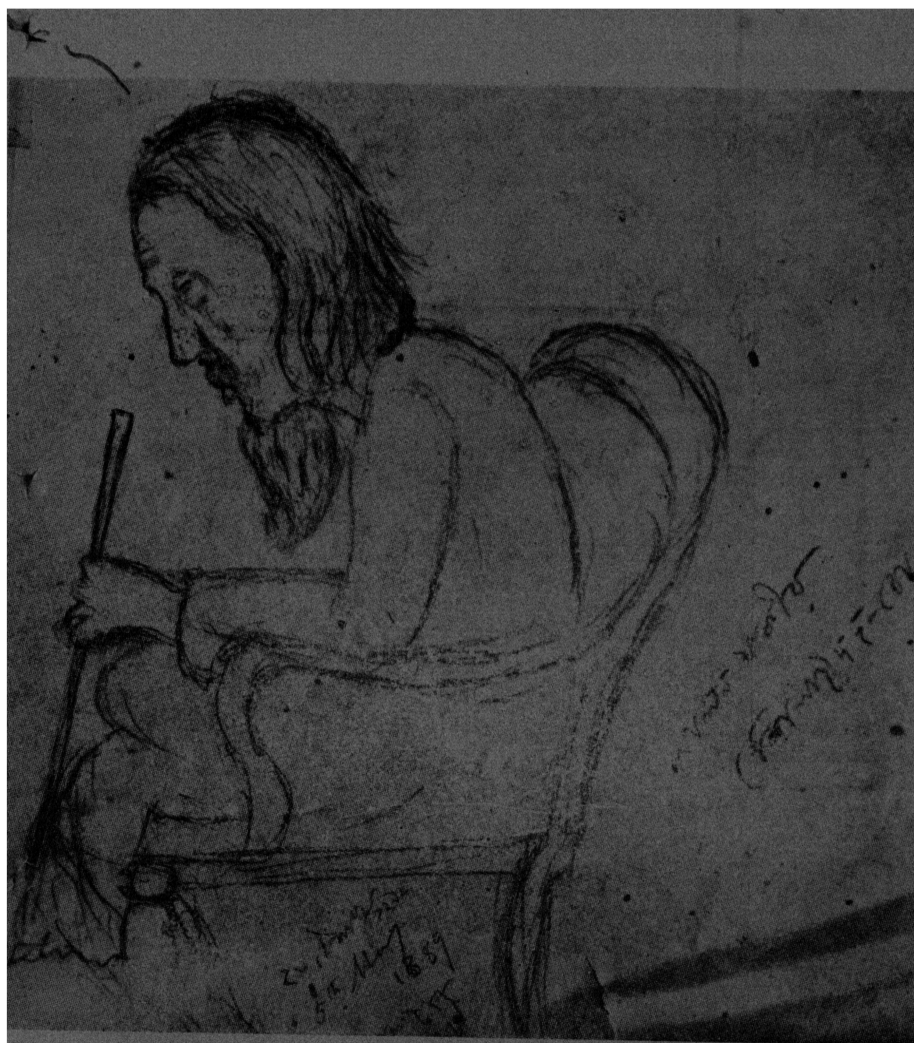
১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত লালন ফকিরের ছবি।

['রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটি'র সৌজন্যে]
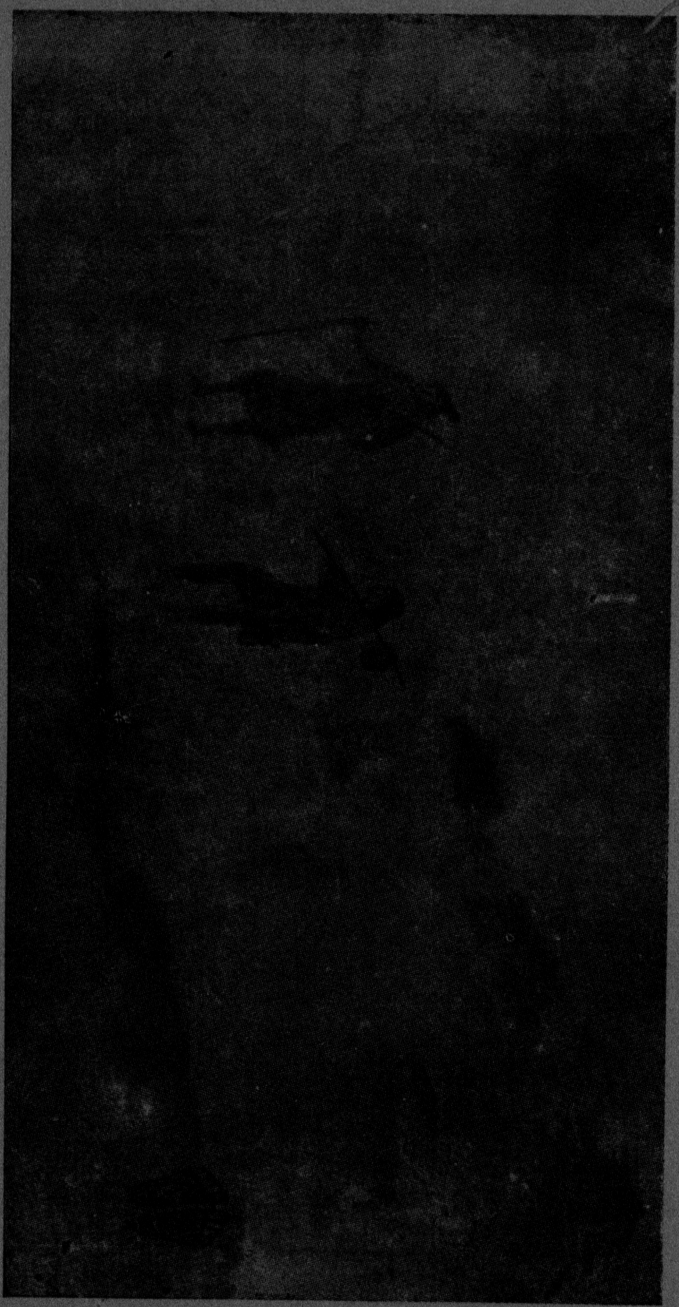
"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!"—গগন হরকরা।

[শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত ও তাঁহার সৌজন্যে মুদ্রিত।]

'ইহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি'। লালনের মৃত্যুর চৌদ্দ দিন পরে 'হিতকরী' একথা লিখেছেন। এর আগে বা পরে যত কেউ লালনের জীবন,—কর্ম,—কাব্য বা সাধনা বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের কেউ একথা লিখতে পারেননি। অর্থাৎ আর কারুরই লালনের মরদেহকে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য রায় বাহাদুর জলধর সেন কাঙ্গাল হরিনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে লালনকে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১] তিনি তাঁর গানও শুনেছেন, তবে তাঁর সঙ্গে যে জলধরের কোনো আলাপ হয়েছিল বা তিনি তাঁর পরিচয় কিছু জানতে পেরেছিলেন এমন কথা কোথাও বলেন নি। এমনকি লালনের অবয়বের কোন বর্ণনাও তাঁর কাছ থেকে তেমন পাওয়া যায় না।

'হিতকরী'র পাঁচ বছর পরে সরলা দেবীর[২] প্রবন্ধের অনুবন্ধে লালনের পরিচয় দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন: 'শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র পুস্তকে ইহার একটি প্রতিকৃতি দেখিয়াছি তাহাই লালনের পাথির দেহের একমাত্র ছায়া- অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই একমাত্র আদর্শ'. অতএব আরও একজন লালনকে প্রত্যক্ষ করে সেই দেখাকে উত্তর-পুরুষের কাছে জমা রেখে গেছেন;—তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে উক্ত প্রবন্ধকার লালনের অসম্পূর্ণ

প্রতিকৃতি দেখলেও তাঁকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এমন কোন উল্লেখ নেই। অথচ তিনি লালনের অবয়বের একটি প্রায় পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন।৩

যাই হোক, আমরা—লালনের উত্তর পুরুষেরা, অক্ষয়কুমারের লেখা থেকে জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা লালনের একটি অসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। এখনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত লালনের সেই ছবি কেমন দেখতে বা তা কোথায় আছে?

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের পর অর্থাৎ ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী'র পাতায় রবীন্দ্রনাথের সংকলিত ও লালনের কয়েকটি গান মুদ্রিত হবার পর আমরা যতগুলি উল্লেখযোগ্য লালন-আলোচনাত্মক প্রবন্ধ-গ্রন্থ পেয়েছি তার মধ্যে এই বঙ্গ থেকে প্রকাশিত [১৩৬৪ সাল] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে লালনের একটি রেখা-চিত্র [Sketch] আর্ট-প্লেটে ছাপা আছে। এবং ছবিটির নিচে লেখা আছে :

> "সুবিখ্যাত বাউল-গুরু ফকির লালন শাহ্‌
> 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত স্কেচ হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত' [শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সৌজন্যে প্রাপ্ত]।"

পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত [১৯৫৮] 'লালন-গীতিকা' নামে একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখে সব শেষে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন : 'প্রচ্ছদপটে যে চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি স্কেচ হইতে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত' [পৃ ৸০]।

[এই সঙ্গে ঐ ছবিটির একটি প্রতিচিত্র এইখানে দেওয়া হল]।
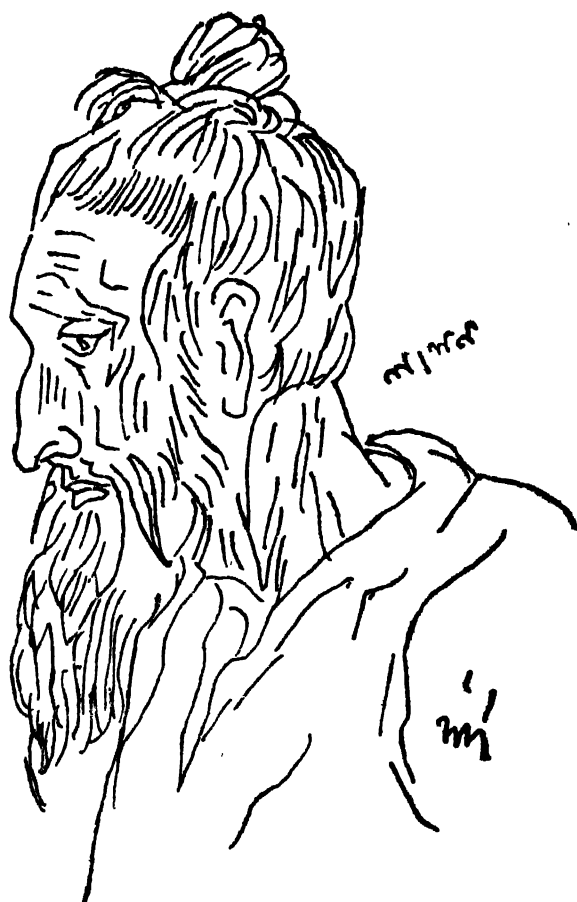
আচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক ১৯১৫ তে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে আপন কল্পনা মিশিয়ে ১৯১৬ সালে শিলাইদহে গিয়ে আঁকা রেখাচিত্র।

শ্রীবসন্তকুমার পাল ১৩৬১ [ইং ১৯৫৪] সালে প্রকাশিত তাঁর 'মহাত্মা লালন ফকির' গ্রন্থে, শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' [প্রথম সং ১৩৫২], এবং ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এরই পরিবর্ধিতরূপ 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ঐ একই রেখা-চিত্র মুদ্রিত করেছেন।

এই ছবির দেখাদেখি ওপার বাংলার কয়েকটি লালন বিষয়ক বইতে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটিয়ে নন্দলালের ঐ স্কেচটিকেই ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে।

এখন নন্দলালের আঁকা এই স্কেচটি সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ফাল্গুনী' নাট্যকাব্যটির প্রথম অভিনয়ের [১৬ই মাঘ ১৩২২] তিনদিন পরেই উত্তরবঙ্গে চলে যান [১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ২ বা ৩ ফেব্রুয়ারী নাগাদ]। "কথা ছিল, পাতিসর যাইবেন কিন্তু 'অত্যন্ত শ্রান্ত বলে পাতিসরে না গিয়ে শিলাইদহে গেলেন"।[৪] এবার তাঁর সঙ্গে গেলেন[৫] তিনজন শিল্পী। নন্দলাল বসু, মুকুলচন্দ্র দে ও সুরেন্দ্রনাথ কর। এইখানে বসে নন্দলাল অনেকগুলি স্কেচ আঁকেন। তার মধ্যে 'লালন ফকিরের' সেই ছবিটি আজ বিখ্যাত হয়ে আছে। স্বাভাবিক ভাবেই নন্দলাল লালনকে চাক্ষুষ দেখেন নি বা দেখা সম্ভব নয়। অতএব হয় তিনি শিলাইদহে ঘুরে বেড়ানো যে কোন বাউলকে দেখে তাঁর সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে ঐ স্কেচটি করেছেন, অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে স্কেচটির কথা অক্ষয় মৈত্রেয় উল্লেখ করেছেন তার সাহায্যে, শিলাইদহে দেখা যে কোন এক জন বাউলের ধারণার সঙ্গে নিজের কল্পনার যোগ করে, ঐ স্কেচটি এঁকেছেন। এখন এই সংশয় থেকে নিরসন হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচটিকে দেখা বা খুঁজে বার করা। কিন্তু সবাই এটাই জেনে আছেন যে নন্দলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচটি দেখে নিজেরটি আঁকার পরই প্রথমটি হারিয়ে গেছে বা আর পাওয়া যাচ্ছে না। এই সেদিন কুষ্টিয়ার প্রাক্তন হাকিম জানালেন যে : 'সেই প্রতিকৃতির সন্ধান এখনও মেলেনি।[৬]

কিন্তু না, সব খবরই বে-ঠিক, কেউ-ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা স্কেচটি দেখেননি একমাত্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ছাড়া। এবং তারপর এই দীর্ঘ ছিয়াশী বছর পরে আমি আবার তাকে প্রকাশ্যে লোক-চক্ষুর সামনে হাজির করলাম [সঙ্গের প্রতিচিত্রটি দেখুন]।[৭] এখন নিশ্চয়ই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে যে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের সঙ্গে নন্দলালের স্কেচের কোন সম্পর্ক নেই। এবং নন্দলালের লালন-চিত্র সম্পূর্ণরূপেই স্বকল্পিত। এই প্রসঙ্গে একান্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে আজ পর্যন্ত কোন গবেষকই কষ্ট করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আসল স্কেচটির সন্ধান না করে উড়ো খবরে বিশ্বাস করে প্রচার চালিয়ে এসেছেন যে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচ হইতে নন্দলাল বসু লালনের এই স্কেচটি এঁকেছেন'।

এখানে আরও মনে হচ্ছে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা এই স্কেচটি রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় দেখেন নি। কারণ, ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে 'হারামণি' বিভাগে, রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত গগন হরকরার একটা গান, দীনেন্দ্রনাথকৃত স্বরলিপি সহ ছাপা হয়েছিল। সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা একটি রঙিন ছবিও ছিল [এই সঙ্গে তারও প্রতিচিত্র দেওয়া হলো]। ছবিটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে ঐ ছবিতে এক বাউল এবং তার পাশে একজন ডাকহরকরা দণ্ডায়মান। চিত্রকর গগনেন্দ্রনাথ গগন বাউলকে মনে রেখে ঐ ডাকহরকরাকে, এবং লালনের প্রতিরূপকে কল্পনায় তৈরী করে পাশের ঐ বাউলটিকে এঁকেছিলেন। কিন্তু যেহেতু কেউ-ই লালনকে চাক্ষুষ দেখেননি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবিটির কথা কারও জানা নেই, তাই গগনেন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে কল্পনার সাহায্য নিয়ে একটা বাউলের চেহারা যেমন হওয়া উচিত এখানে তেমনি ভাবেই আঁকতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যদি প্রকৃত লালনের জীবন্ত চেহারা বা ছবির সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকতো, তবে মনে হয় পরপর এক বছরের আড়াআড়ি সময়ে দু-দুজনকে তাঁর কাছ থেকেই লালনের যথার্থ অবয়ব রচনায় এমনভাবে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে দিতেন না।

যাই হোক, সুদীর্ঘ কাল ধরে বহুজনের পোষিত ভুল আজ লালনের যথার্থ অবয়ব দেখে সংশোধিত হবে আশা করি।

১। দ্রষ্টব্য 'কাঙ্গাল হরিনাথ' [প্রথম খণ্ড : ১৯১৩]।

২। 'ভারতী' পত্রিকার প্রবন্ধ : দ্রষ্টব্য অনুসূত্র 'খ'।

৩। প্রাগুক্ত।

৪। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-জীবনী' : দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬১ : পৃ. ৪৩৯।

৫। প্রাগুক্ত গ্রন্থের ৪০৩ পৃষ্ঠায় যে তথ্য আছে তা ভুল। নন্দলাল মহাশয়েরা ১৯১৬ সালেরই ফেব্রুয়ারি মাসে কবির সঙ্গে শিলাইদহে গিয়েছিলেন। কারণ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' [১৯৭৪] গ্রন্থে এমন কতকগুলি স্কেচ আছে যাতে স্পষ্ট করেই তারিখ লেখা আছে 'ফটিক মজুমদার' ১২।২।১৬ ; 'নিমাই ঠ্যাঁটা' ৪।২।১৬ ; 'রামগতি মাঝি' ১০।২।১৬ 'প্রজাদের মধ্যে মেছের সরদার' ১৪।২।১৬ ইত্যাদি। এই স্কেচগুলি সবই নন্দলাল বসুর আঁকা। অতএব এই প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অস্বীকার করি কি করে?

৬। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় : 'লালন দ্বিশত বার্ষিকী' : শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৩৮১ : পৃ. ২৮।

৭। এই চিত্রটি কোলকাতাতেই একটি সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সেই সংগ্রহশালায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা প্রায় সব ছবিই আছে। লালনের ঐ ছবিটির পেছনের পৃষ্ঠায় আঁকা রয়েছে 'কীর্তন গায়িকা হরিমতি'র ছবি। আঁকার তারিখ ৩০শে এপ্রিল ১৮৮৯। উক্ত সংগ্রহশালায় ছবির যে তালিকা আছে তাতে লালনের এই ছবির সংখ্যা হচ্ছে ১৯১৪। দ্র. Catalogue of Mukul ch. Dey's Collections of paintings & drawings. Vol. IV.

Sl. No. 1914···Jyotirindranath Tagore···Portrait of Lalan Fakir. Pencil—11½″+8½″—5th May 1889.

বাউল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে
পি, রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৴০ আনা।

১৯০৫-এ প্রকাশিত স্বদেশী গান সম্বলিত পুস্তিকার আখ্যাপত্র

পাক্ষিক পত্রিকা।

লালনের মৃত্যু-সংবাদ সম্বলিত 'হিতকরী' পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা।

অনুসূত্র

ক.

'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদকীয় ও বাউল কবি লালন

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামে বাউল কবি ও সাধক লালন ফকিরের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর চৌদ্দ দিন পরে ৩১ শে অক্টোবর ১৮৯০ 'হিতকরী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার ১০১ পৃষ্ঠায় 'মহাত্মা লালন ফকীর' নামে একটি সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই 'হিতকরী' পত্রিকাটির পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। আমরা লালন সম্পর্কিত উক্ত পত্রিকার নিবন্ধটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম। 'হিতকরী'র ঐ সংখ্যায় [১ম ভাগ ১৩ সংখ্যা] তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। তারা যথাক্রমে : "১। 'জমিদার', ২। 'মহাত্মা লালন ফকীর,' ৩। 'ইন্‌কম ট্যাক্‌স'।" অনেকে মনে করেন যে এই সম্পাদকীয়টি কুষ্টিয়ার উকিল রাইচরণ দাসের রচনা। প্রবন্ধটি এই :

॥ মহাত্মা লালন ফকির ॥

"লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য ; শুনিতে পাই ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫।১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন ; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভালবাসিতেন না। শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান

হইত না। আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন; সম্প্রদায়ের ধর্ম-মতানুসারে ইঁহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে বাউল-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের এই নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্য-গণের না হউক নিজের মত বিশ্বাস অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধু-সেবা ও বাউলের দলে যে কলঙ্ক দেখিতে পাই লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি সাধুসেবায় অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভি-চার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহাপাপ। তবে প্রত্যেক সৎ-নিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে। বাউল, সাধুসেবা ও লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটি গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান জননের পথ এককালে রুদ্ধ। 'শান্ত-রতি' শব্দের বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে উৎকৃষ্ট ভাব বুঝায়, ইহারা তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে। এই জঘন্য ব্যাপারে এ দেশ ছারেখারে যাইতেছে তৎসম্বন্ধে পাঠক-বর্গকে বেশী কিছু জানাইতে স্পৃহা নাই।

"শিষ্যদিগের ও তাহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকীরের বিচার হইতে পারে না। তিনি এ সকল নীচ কার্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম-জীবনে উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম সাধনে

তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাহাকে মুসলমান মনে করিত; বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে; কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা 'সাঞ' এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নোমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদবিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণবধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ-সাধনের কথা ইঁহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। লালন ফকীর নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকীর ছিলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে; ইনি সংসারী ছিলেন; সামান্য জোতজমা আছে; বাটীঘরও মন্দ নহে। জিনিষপত্রও মধ্যবর্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার বলিয়া মরিয়া যান। ইঁহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি ফরমমাত্র করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজে শেষকালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরাই ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা [মহোৎসব] দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও

আলোচনা হইত। তাহাতে তাঁহার ৫।৬ শত টাকা ব্যয় হইত।

"ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থগমনকালে পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকীর হয়েন। ইঁহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ববৎ সাধন করিতেন; মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। এই সময়ের রচিত কয়েকটি গান আমাদের নিকট আছে। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইঁহার সহিত ধর্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫ টার সময় শিষ্যগণকে বলেন 'আমি চলিলাম।' ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই; গঙ্গাজল হরে রাম নামও দরকার [হয়] নাই; হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে. শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্যে

শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মানিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন। ভরসা করি, ইহাদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না, লালন ফকীরের অসংখ্য গান সর্বত্রে সর্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহার নাম, ধর্ম, মত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

গান।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখ্‌লেম না এই নজরে

১। কেউ মালায় কেউ তছবি গলায়,
তাইতেঁ যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে॥

২। যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামণ চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামণি চিনি কিসে রে॥

৩। জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন সে জেতের ফাতা
ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে॥

খ.

'ভারতী' পত্রিকার প্রবন্ধ ও বাউল কবি লালন

লালনের মৃত্যুর বছর পাঁচেক বাদে,—পূর্বে মুদ্রিত 'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদকীয়ের পরে 'ভারতী' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩০২ বঙ্গাব্দে ২৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ২৮১ পৃষ্ঠার মধ্যে 'লালন ফকির ও গগন' শিরোনামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই 'ভারতী' পত্রিকাকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর মুখপত্র বলা যায়। এই 'ভারতী' পত্রিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের [১ম খণ্ড: সংশোধিত সং ১৩৬৭ পৌষ] ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "ইতিমধ্যে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ি হইতে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের ইচ্ছা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ভালো করিয়া জাঁকাইয়া তোলা। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইচ্ছা সাহিত্য সেবা ও চর্চা এবং তদুপযুক্ত মাসিক পত্র প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার নাম দেন 'সুপ্রভাত'; সে নাম সকলের পছন্দ না হওয়ায় 'ভারতী' নাম রাখা স্থির হইল। জ্যোতিরিন্দ্রের নাম কখনো 'ভারতী'র সম্পাদকীয় তালিকায় স্থান না পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতী ছিল তাঁহার মানস কন্যা। দ্বিজেন্দ্র নাথ হইলেন সম্পাদক ও ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে [১৮৭৭ জুলাই] ভারতীর প্রথম সংখ্যা বাহির হইল।" পরে এই পত্রিকার সম্পাদিকা হন দ্বিজেন্দ্র-অনুজা স্বর্ণকুমারী দেবী [১৮৫৬-১৯৩২] কিন্তু ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে স্বর্ণকুমারী অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর কন্যাদ্বয় হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ভারতীর সম্পাদনা-ভার যুগ্মভাবে গ্রহণ করেন। এই বছরেই ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতী'তে সরলা দেবীর উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের সঙ্গে গগন হরকরার দুটি এবং লালনের আটটি

এবং অজ্ঞাতনামা কবির একটি গানের সংগ্রহ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের অনুবন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সংগৃহীত লালন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় যুক্ত হয়েছে। 'ভারতী'র উক্ত প্রবন্ধ ঐ পত্রিকার বাইরে এদেশে আর কোথাও মুদ্রিত হয়নি। তাই কৌতূহলী পাঠকদের কুতূহল নিবারণার্থে এখানে সমগ্র প্রবন্ধটি হুবহু মুদ্রিত হলো :

"বাঙ্গালীর আর কোন সম্বল থাকুক আর নাই থাকুক সে ভাবের রাজা। সেই ভাব কাহাতেও বা কবিত্বরূপে কাহাতেও বা ভগবদ্ভক্তি রূপে বিকশিত হয়। যে কবি, ভগবানই মুখ্যরূপে তাঁহার আরাধ্য নহেন, মর্ত্যের কোন দেবী মধ্যস্থ হইয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া ভগবানে নিবেদন করেন। যে ভক্ত তাহার ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, ভগবান বই আর তাহার প্রণয়পাত্র নাহি। যে প্রণয় সম্বোধন কবি মানবীতে প্রয়োগ করেন, তাহা ভক্ত ভগবানে প্রয়োগ করিয়া ভগবানকে তাঁহার সমুচ্চ অনায়ত্ত মহিমা-শিখর হইতে নামাইয়া আনিয়া মানব হৃদয়কুটীরের অতি অন্তরঙ্গ প্রদেশে আসীন করে। তাহার মান, অভিমান, সুখদুঃখের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত। তাই ভক্ত নিরাকার উপাসক, কবি সাকার। আমাদের দেশটি এই নিরাকার উপাসনার ভাবেই ওতঃপ্রোত, তাই অন্য দেশে যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা শুধু মর্ত্য ইতিহাসের একটি খণ্ড ঘটনা বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারিত এদেশের ভাবুকেরা তাহাকে আধ্যাত্মিক না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। যে উচিত-জ্ঞানে বিল্বমঙ্গলের প্রেমের আতিশয্যে তাহার প্রণয়িনীরও মনে উদয় হইল এত প্রেমের যোগ্য শুধু ভগবান, তাহার ন্যায় সামান্যা নারী নহে, এ প্রেম ভগবানেই ন্যস্ত হওয়া কর্তব্য ; সেই উচিত জ্ঞান হইতেই বোধকরি আমাদের দেশীয় ভক্তেরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে আধ্যাত্মিক মহিমায় উন্নীত করিয়াছেন। আশ্চর্য এই এদেশের নিম্নস্তরের সমাজেই এই নিরাকার উপাসনার অধিক প্রচার। বাউলের গান তাহার প্রমাণ।

এইরূপ একটি ভগবদপ্রণয়ী চার বৎসর পূর্বে কুষ্টিয়া অঞ্চলে জীবিত ছিলেন। কুষ্টিয়ার সন্নিহিত প্রদেশে সামান্য বৈরাগীর মুখে তাঁহার ও তাঁহার কোন শিষ্যের রচিত কতিপয় গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাদের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অধিক সংগ্রহের সময় ছিল না, যে কটি পাইয়াছি তাহাই পাঠকদের উপহার দিতেছি। ইহাদের সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য অনাবশ্যক, ইহারা আপনিই আপনার সৌন্দর্য ব্যাখ্যান করিবে।

আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দিশে, দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয় শশী, সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হত খুশী, দিবানিশি দেখিতাম নয়ন ভরে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিবাই কেমন করে,[মরি হায় হায়রে]
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে, দেখ্‌না তোর হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি, যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে।
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে, ছাই দিয়ে সংসারে, [মরি হায়]
ও সে না জানি কি কুহাক জানে, অলক্ষে মন চুরি করে।
কুল মান সব গেলরে, তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে, তাইতে মোরে দেয় না দেখা সেরে।
ও তার বসদ কোথায়, না জেনে তায়, গগন ভেবে মরে,
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস, কৃপা করে বলে দেরে।
[আমার সুহৃদ হয়ে] [ব্যথার ব্যথিত হয়ে বলে দেরে]

পাঠক এই গগনের পরিচয় পাইলে বিস্মিত হইবেন। শুনিয়াছি গগন একজন ডাকহরকরা, এবং এখনও জীবিত।

[কেনে] কাছের মানুষ ডাকছ সোর করে,
ক্ষ্যাপা তুই যেখানে সেও সেখানে, খুঁজে বেড়াও কারে রে?
বিজলি চটকের প্রায় থেকে থেকে ঝলক দেয় রঙমহল ঘরে,
তার পাশাপাশি অহর্নিশি থেকে দিশা হয় না রে।

হাতের কাছে যারে পাও ঢাকা দিল্লী টুঁড়িতে যাও কোন অনুসারে,
এমন কি বুদ্ধিমান মন তুই এ সংসারে রে।
আছে ঘরের মাঝে ঘরখানা ঢোঁড়রে আগে সেইখানা, কে বিরাজ করে
সিরাজ সাঁই কয় দেখরে লালন সে কি রূপ তুই কি রূপ রে।

কথা কয়, কাছে দেখা যায় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভোর মেলে না।
খুঁজি তারে আস্‌মান জমি, আমারে চিনিনে আমি,
এত বিষম ভুলে ভ্রিমি, আমি কোন জন সে কোন জনা। [আহা মরি]
রাম রহিম বলছে সে জন, ক্ষিতি জল কি বাউ হুতাশন,
সুধালে তার অন্বেষণ, মূক্ষ দেখে কেউ বলে না।
হাতের কাছে হয়না খবর, কি দেখতে যাই দিল্লী নগর,
সিরাজ কয় লালন রে তোর সদাই মনের ভ্রম যায় না।

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আড়সী নগর, এক পড়শী বসদ্ করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কেনারা নাই তরণী পারে,
মনে বাঞ্ছা করি দেখব তারে, আমি কেমনে সেথা যাইরে।
আমি বলব কি পড়শীর কথা, তার হস্তপদকন্ধসমাথা নাইরে,
সে ক্ষেণেক থাকে শোন্যের উপর, সে ক্ষেণেক ভাসে নীরে।
সে পড়শী যদি আমায় ছুঁতো, তবে যম যাতনা সকল যেত দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়, থাকে লক্ষ যোজন ফাঁকরে।

আমার আপন খবর আপনারে হয় না।
সে যে আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়, যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকোয়
দেখনা।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি, আমার কোলের ঘোর্টত যায় না।
সে যে আত্মারূপে কর্তা হরি, মনে নিষ্ঠে হলেই মিলবে তারে ঠেক্না।
আর বেদ বিদান্ত পড়বে যত বেড়বে তত লস্না।
আমি আমি কে বলে মন, যে জানে তার চরণ শরণ লেনা।
ফকির লালন বলে বেদের গোলে, হলাম চোখ থাকিতে কানা।

[ও মন] অসার মায়ায় ভুলে রবে
কতকাল এমনি ভাবে।
এ সব ভোজবাজির প্রায় [মনরে] কেউ কারো নয়
দেখতে দেখতে কোথায় যাবে।
সুখের আশে দেশ বিদেশে ভ্রমিতেছ নিশি দিবে
তবে হলনা সুখ [মনরে] সদাই অসুখ
সুখের সে পথ চিনবি কবে,
যাদের এখন দিয়ে প্রাণধন করছ যতন আপন ভেবে
যে দিন পাবে অক্কা সব বিফাক্কা
সঙ্গে তার কেউ না যাবে।
আপন যে জন লও তার শরণ ভব-বন্ধন এড়াইবে
ভেবে বলছে গগন এবার বুঝি আমার জনম যাবে।
[আমার (সাধের মানব)]

গৌর কি আইন আনিল নদীয়ায় এত জীবের সম্ভাব নয়।
সে যে আনথা আচার আনথা বিচার
শুনে জীবের লাগে ভয়।
ধর্মাধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাই তাতে
প্রেমের গুণ গায়।
সে যে জেতের বোল রাখ্‌লোনা সেত করলে একাকারময়।
শুদ্ধ অশুদ্ধ নাই জ্ঞান, সাতবার খেয়ে একবার চান
করেন সদাই।
সে যে অসাধ্যকে সাধ্য করে জীবে যা না ছোঁয় ঘৃণায়।
যোবন ছিল দবীর খাষ তারে গোঁসাইপদ প্রকাশ
কল্লেন গৌর রায়—
লালন বলে মমীন বংশে জামাল্ সেও বৈরাগ্য পায়।

জগন্নাথে দেখরে যেয়ে
জাত কেমন রাখে বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই খায় চেয়ে।

জোলা ছিল কুপীর দাস তার তোড়ানি বারো মাস
উঠ্‌চে উথলিয়ে—
সেই তোড়ানি খায় যে ধনী সেই আসে দর্শন পেয়ে।
ধন্য প্রভু জগন্নাথ চায় নারে সে জাত অজাত
ভক্তের অধীন সে।
এবার জাতবিচারী দুরাচারী যায় তারা সব দূর হয়ে।
জাত না গেলে পাইনে হরি কি ছার জাতের গরব করি
ছুঁস্‌নে বলিয়ে
লালন কয় জাত হাতে পেলে পোড়াতাম আগুন দিয়ে।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন ভাবে জেতের কিরূপ দেখ্‌লাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তজ্‌বি গলায় তাইতেরে জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায় জেতের চিহ্ন রয় কারে।
জগৎ বেড়ে জেতের কথা লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন সে জেতের কাতায় ডুবেছে সাত বাজারে।

ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে
তুমি হেলায় যা কর তাই কর্ত্তে পার তোমা বিনে পাপী তারণ কে করে।
শুন্‌তে পাই পরম পিতে গো তুমি তোমার অতি অবোধ বালক গো আমি।
যদি ভজন ভুলে কু-পথে ভ্রমি তবে দাওনা কেনে সুপথ স্মরণ করে।
পতিতকে তরাও হে পতিতপাবন নাম তাইতে তোমায় ডাকি গুণধাম,
এবার আমার বেলায় কেনে হলে বাম আমি আর কতকাল ভাসব দুঃখসাগরে।
অথায় তরঙ্গ আতঙ্কে মরি কোথায় হে অপারের কাণ্ডারী
ফকির লালন বলে তরাও ত তরি
নইলে দয়াল নামে দোষ রবে সংসারে।

কোথায় হে কাঙালের নিধি কাতরে ডাকি হে তোমায়।
তুমি অধমতারণ পতিতপাবন দাও হে দীনে পদাশ্রয় [হে]
পড়েছি ঘোর বিপদে এবার দেখ্‌ছি বিপদ পদে পদে

দিও স্থান অভয়পদে মনে করি আমায়।
তোমার দয়া বিনে এ অধীনে আর দেখিনে অন্য উপায় [হে]
[প্রভু] দীনহীন কাঙাল বলে তুমি দিও না হে আমায় ফেলে
রব ঐ চরণতলে মনে করি আশা।
যদি দয়া করে তার মোরে, নিজগুণে তার মোরে
তবে জানি দীন দয়াময় [হে]
শুনেছি বেদ-পুরাণে ওহে পাপী তাপী কাঙাল জনে
তরে যায় নামের গুণে তোমারি মহিমায়
আমি ভেবে আকুল, দাও মোরে কূল
[এবার] মোর মত নাই পাষাণ হৃদয় [হে]

আমরা লালন ফকিরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহে চেষ্টান্বিত ছিলাম। রাজশাহী নিবাসী 'শিক্ষা পরিচয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের যাহা লিখিয়াছেন তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল :

'লালন ফকিরের সকল কথা ভাল করিয়া জানি না, যাহা জানি তাহাও কিম্বদন্তীমূলক। লালন নিজে অতি অল্প লোককেই আত্ম-কাহিনী বলিতেন, তাঁহার শিষ্যেরাও বেশী কিছু সন্ধান বলিতে পারেন না। লালন জাতিতে কায়স্থ, কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপড়া-গ্রামের ভৌমিকেরা তাঁহার স্বজাতীয়। ১০।১২ বৎসর বয়সে বারুণী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে যান, তথায় উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু দশায় পিতামাতা কর্তৃক গঙ্গাতীরে পরিত্যক্ত হন। লালনের মুখে বসন্ত চিহ্ন বর্তমান ছিল বলিয়া অনেকে এই কাহিনী বিশ্বাস করিয়া থাকেন। শ্মশানবাসী লালনকে একজন মুসলমান ফকীর সেবাশুশ্রূষায় আরোগ্য করিয়া লালনপালন করেন ও ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন। এই ফকিরের নাম সিরাজ সা, জাতিতে মুসলমান। লালনের প্রণীত অনেক গানে এই সিরাজ সা দীক্ষা-গুরুর উল্লেখ আছে।

লালনের ধর্মমত অতি সরল ও উদার ছিল। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন ও শিষ্যদিগের

মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতেন। লালন হিন্দু নাম, সা উপাধি মুসলমান জাতীয়—সুতরাং অনেকেই তাঁহাকে জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিত। তিনি কোন উত্তর না দিয়া কেবল স্বপ্রণীত নিম্নলিখিত গানটি শুনাইতেন :

১। সব্ লোকে কয় লালন কি জাত্ সংসারে,
লালন ভাবে—জাতির কি রূপ দেখ্লাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তজ্বী গলায়,
তাইতে ত জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়,
জাতের চিহ্ন রয় কারবে ?

২। যদি সুন্নত দিলে হয় মোসলমান্।
নারীর তবে কি হয় বিধান।
বামন চিনি—পৈতা প্রমাণ,
বাম্নী চিনি কিসে রে ?

৩। জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা,
লালন সে জেতের কাতা,
ঘুচিয়েছে সাধ্—বাজারে।

'একটা কথা বলিয়া রাখি—লালন নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্ত-ভাব দেখিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারা যাইত এবং স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মজীবনের প্রেমোন্মত্ততা মিলিত হইয়া তিনি যে নিরক্ষর তাহা যেন সহজে বুঝিতে পারা যাইত না।

'লালনের ধর্মমতের নিকট হিন্দু মুসলমানে ভেদাভেদ ছিল না, স্ত্রী পুরুষেরও সমান অধিকার ছিল—অনেক রমণী ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সত্য কথন, সত্য ব্যবহার, লালনের সাধন ও তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীত তাঁহার ভজন—ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথা

বাহিরের লোকে জানে না, তিনিও জিজ্ঞাসা করিলে বাহিরের লোককে ইহার অধিক কিছু বলিতেন না।

'বৈষ্ণবদিগের ধর্মমতের প্রতি ইঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে কখন কখন অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে শুনা গিয়াছে।

'কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী সেওরিয়া গ্রামে লালনের আস্তানা বা আখড়া ছিল। তিনি তথায় প্রতি বৎসর ৫।৬ শত টাকা ব্যয় করিয়া শীতকালে একটি উৎসব করিতেন। তাহাতে সকল দেশের শিষ্য সম্মিলিত হইত। ইঁহার শিষ্যের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার—প্রায়ই নিরক্ষর কৃষক। ইনি সংসারী ছিলেন, স্ত্রী এখনও বর্তমান, তিনিই গদীর অধিকারিণী ও শিষ্যদিগের গুরুমা।

'লালন অশ্বারোহণে দেশবিদেশ ভ্রমণ করিতেন। এদানীক বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৯১ সালের* ১৭ অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে ১১৬ বৎসর বয়সে লালনের মৃত্যু হয়। পূর্ব রাত্রে শিষ্যসঙ্গে গান গাহিয়া প্রভাতে বলিলেন 'আমি চলিলাম' এবং তারপর হইতেই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার আদেশানুসারে আস্তানার একটি গৃহমধ্যে মৃতদেহ সমাধিস্থ হইয়াছে। তাঁহার সম্পত্তি জোত জমা ও নগদ কয়েক সহস্র টাকা ছিল তাহা কতক স্ত্রীকে কতক এক ধর্মকন্যাকে ও কতক প্রধান শিষ্য শীতল সাকে ও কতক সৎকার্যে দান করিয়া গিয়াছেন।

'লালনের জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিবার কখন চেষ্টা করি নাই; তাঁহার রচিত গানগুলিও লিখিয়া রাখি নাই। সেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে কতক পরিচয় দিতে পারিতাম।

'লালনের শিষ্যেরা প্রায়ই নিরক্ষর ও দরিদ্র, কিন্তু তাহাদের সত্যনিষ্ঠা খুব প্রশংসনীয়। ইহারা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া গান গাহিয়া ভজন করে এবং লালনকে গুরু বলিয়া মানে। লালন নিজেও গুরুবাদী ছিলেন।

* মৈত্রেয় মহাশয়ের তথ্য ভুল। ১৮৯০ খ্রীঃ হবে

লালনের ধর্মমত কোন পুস্তকে লিখিত নাই, তিনিও কোন পুস্তক মানিতেন না ; তবে বৈষ্ণব কবিদের করচাগ্রন্থ আদরের সঙ্গে শ্রবণ করিতেন এরূপ দেখা গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রপুস্তকে ইহার একটি প্রতিকৃতি দেখিয়াছি তাহাই লালনের পার্থিবদেহের একমাত্র ছায়া—অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই একমাত্র আদর্শ।

কুষ্টিয়ার উকিল বাবু রাইচরণ বিশ্বাস, কুমারখালীর খ্যাতনামা হরিনাথ মজুমদার ও তাঁহার ফিকিরচাঁদের দলস্থ লোকেরা লালনের অনেক গান ও জীবনের অনেক ঘটনা জানেন এবং লালনের মৃত্যুর পরই কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশিত 'হিতকরী' নামক সংবাদপত্রে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কুমারখালীতে অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিয়াছি তাহা লিখিলাম।'

প্রেমিক গগনের ভক্তজীবনের বিবরণী সংগ্রহ করিয়া কেহ 'ভারতী'তে প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিলে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।"

['ভারতী' : ১৩০২]
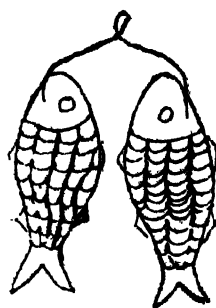
গ.

'প্রবাসী' পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগ ও বাউল কবি লালন

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রখ্যাত মাসিক সাময়িক পত্র 'প্রবাসী' [প্রথম প্রকাশ ১৩০৮, বৈশাখ] পত্রিকার ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার ১৫৪ পৃষ্ঠায় 'হারামণি' নাম দিয়ে একটি বিভাগের উদ্বোধন হয়। এই বিভাগের সূচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখলেন: ['এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকা এই কার্যে আমাদের সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন। কবিওয়ালা, তর্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকারা ইহাদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ বা রসভাবপূর্ণ রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব']।

এর পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে 'হারামণি' বিভাগের সূচনায় সম্পাদক উক্ত নোটটি মুদ্রিত করে তারপর সংগ্রহগুলি প্রকাশ করতেন। এবং সংগ্রহ শেষে সংগ্রহকর্তার নামও দিয়ে দিতেন।

উক্ত প্রথম সংখ্যায় [অর্থাৎ ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ] নোটটির পর এই বিভাগের প্রথম সংগ্রহ এবং সংগ্রাহক সম্পর্কে সম্পাদক লেখেন: 'নিম্নে প্রকাশিত গানটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারী শিলাইদহের পোষ্ট ডাক-হরকরা গগন গাইয়া গাইয়া ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করিত। এই গানটি ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত। এই সঙ্গে গানটির স্বরলিপি ও চিত্র প্রকাশিত হইল—সে দুটিও ঠাকুর মহাশয়দেরই রচিত'।

এখানে গগন হরকরার যে গানটি উদ্ধৃত হয় তার স্বরলিপিটি তৈরী করেন কবি গুরুর গানের ভাড়ারী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সেটিও ঐ গানটির সঙ্গে মুদ্রিত হয়। এই সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীর অন্যতম কৃতি সন্তান গগন ঠাকুর জল-রঙে একটি ছবি আঁকেন। ছবিটি খুবই বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। [সঙ্গের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য] ঐ চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ডান হাতে একটা লাঠি এবং বাঁ হাতে একটা একতারা নিয়ে একবৃদ্ধ বাউল এবং তার পাশে এক ডাকহরকরা রাণার চলেছে উদাস প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। মনে হয় চিত্রকর গগন ঠাকুর ঐ দুই ছবির মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের মধ্যেই তৈরী হয়ে যাওয়া স-অবয়ব লালন সম্পর্কে যে কিংবদন্তী তাকে, এবং গগন হরকরাকে আঁকতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কারণ লালনকে যদি প্রবাসীতে প্রকাশিত ঐ স্বরলিপি, ছবি ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ দেখে থাকতেন; এমন কি জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের স্কেচটির সঙ্গেও তাঁদের কারুর পরিচয় থাকতো তবে বোধ হয় ঐ ছবিটি ঐভাবে আঁকা হতো না। অপিচ, ঐ ছবিটি যদি কল্পনায় তৈরী একটি নির্বিশেষ বাউলের ছবি হয় তবে পৃথক কথা। কিন্তু উক্ত ছবিটির বছর খানেকের মধ্যেই অধুনাতন সর্বাপেক্ষা পরিচিত লালনের স্কেচটিকে আঁকেন শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় [ফেব্রুয়ারী ১৯১৬]।

'প্রবাসী'-র উক্ত বৈশাখ সংখ্যায় 'মনের মানুষের সন্ধান' নাম দিয়ে গগন হরকরার যে গানটি প্রকাশিত হয়, সেইটিই এর কুড়ি বছর আগে [ভাদ্র, ১৩০২] 'ভারতী' পত্রিকায় সরলা দেবীর প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় পাঠের মধ্যে অনেক প্রভেদ। 'প্রবাসী'র পাঠের ভাষা ও বানান বহুলাংশে আধুনিক এবং কোন কোন চরণে কিছু ছাড়ও থেকে গেছে। ফলে, 'প্রবাসী'তে গগনের গানটি মুদ্রিত হয়ে যাওয়ার পর 'হারামণি'র সংগ্রাহকের বোধ হয় নজরে আসে উক্ত কুড়ি বছর পূর্বে মুদ্রিত 'ভারতী'র পাঠটি। তাই পরের সংখ্যায় ['প্রবাসী': জ্যৈষ্ঠ ১৩২২: পৃঃ ৩২৩-৪] আবার সম্পাদকীয় মন্তব্য হলো: 'গতবারের যে

গানটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অসম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল।'

আমার আলোচনার সুবিধার জন্যে নিম্নে উক্ত গানটির দুই সংখ্যাতে [বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ] মুদ্রিত পাঠ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এর থেকে বোঝা যাবে যে লোক-সাহিত্যের মৌখিক রূপ এবং লিখিত রূপের মধ্যে কত পার্থক্য ঘটানো হয়ে থাকে। অধিকন্তু তো আছেই 'সাত নকলে আসল খাস্তা'। গান দুটি :

ক. ['প্রবাসী' : ১৩২২ বৈশাখ : পৃ. ১৫৪] :

মনের মানুষের সন্ধান

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে
আমি দেশে বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

কোথায় পাব তারে,
প্রেমাগুনে মরচি জ্বলে নিবাই কেমন করে,
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
দেখ না তোরা, ও ভাই দেখ না তোরা
হৃদয় চিরে।

কোথায় পাব তারে,
লাগি সেই হৃদয়-শশী
সদা মন হয় উদাসী;
পেলে মন হত খুসি,
দিবানিশি
দেখতেম নয়ন ভরে।

তারে যে দেখেছে
সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে।
ও সেই মানুষের উদ্দেশ জানিস্ যদি
দয়া করে
ব্যথার ব্যথী হয়ে
বলে দে রে।
কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।'

এর পরের সংখ্যায় অর্থাৎ 'প্রবাসী'-র ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ-এ [পৃ. ৩২৩-৪] যে সম্পূর্ণ পাঠ মুদ্রিত হয়েছিলো সেটি এখন উদ্ধৃত করছি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকার ২৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ২৮১ পৃষ্ঠার মধ্যে 'লালন ফকির ও গগন' নাম দিয়ে সরলাদেবী লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠের হারামণি বিভাগের ঐ 'সম্পূর্ণ পাঠ'টি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ 'প্রবাসী'-র পাঠ 'ভারতী'-র অনুরূপ :

বাউলের গান : মিশ্র একতালা

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দিশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে। ১।
লাগি সেই হৃদয়শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হত খুসি,
দিবানিশি দেখিতাম নয়ন ভরে'। ২।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে' নিভাই কেমন করে'
[মরি হায় হায় রে]
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
দেখ্ না তোরা হৃদয় চিরে'। ৩।

দিব তার তুলনা কি, যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে । ৪ ।

তারে যে দেখেছে সেই মজেছে, ছাই দিয়ে সংসারে
[মরি হায় হায় রে]
ও সে না জানি কি কুহাক জানে,
অলক্ষ্যে মন চুরি করে । ৫ ।

কুল মান সব গেল রে, তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে । ৬ ।

ও তার বসদ্ কোথায়, না জেনে তায়,
গগন ভেবে মরে [মরি হায় হায় রে]
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস্
কৃপা করে [আমার হৃদয় হয়ে]
[ব্যথার ব্যথিত হয়ে] বলে দে রে । ৭ ।

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ কলির সুর ২য়ের অনুরূপ এবং ৫ম ও ৭ম কলির সুর ৩ য়ের অনুরূপ "। 'প্রবাসী' : জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ : পৃ· ৩২৩-৪]

বৈশাখ মাস থেকে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ, দীনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি এবং গগন ঠাকুরের চিত্র শোভিত হয়ে বাউল ও পল্লীগীতির যে হারামণিগুলির অনুসন্ধান আরম্ভ হলো পরবর্তী সংখ্যা থেকেই ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ তাতে আত্মনিয়োগ করলেন। এই ভাবে পল্লীসাহিত্য বা লোকসাহিত্য সংগ্রহে যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় তার সুফল হাতে এলো পরবর্তী আষাঢ়, ১৩২২ বঙ্গাব্দেই [পৃষ্ঠা ৫৪১-৪৩]। যদিও বলা হয়ে থাকে যে রবীন্দ্রনাথই 'প্রবাসী' পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে সর্বপ্রথম লালনের গান প্রকাশ করেন ;— তথাপি কথাটির মধ্যে তথ্যগত একটু ভুল আছে। কেন না আমরা ঐ আষাঢ় সংখ্যায় দেখছি যে, শ্রীসতীশচন্দ্র দাস লালনের দুটি গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। আমরা এই দুটিকেই 'প্রবাসী'র

পাতায় প্রথম মুদ্রিত লালন-সংগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এর তিন মাস পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালন-গীতিকবিতা-গুলি প্রকাশ পেতে থাকে।

'প্রবাসী' ঐ আষাঢ় সংখ্যার লালন-সংগ্রহের কথা এ পর্যন্ত কোথাও উল্লেখিত হয় নি বলেই আমরা এখানে মন্তব্যসহ তার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিলাম :

'নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রামে সেরাজ সাঁই ও লালন সা ফকিরের আস্তানা আছে। তাহাদিগের রচিত অনেক দেহতত্ত্বগান এখনও নদীয়া যশোহর ও ফরিদপুর অঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। গানগুলি মুসলমান ফকিরের রচিত প্রত্যেকটি গানই ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত ও ভাবপরিপূর্ণ। ফকিরদের দুইটি গান পাঠান হইল'।

। ১ ।

কথা কয় রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে—
খুঁজলে জনম—[আ মরি]—ভর' মেলে না ॥
খুঁজি তারে আসমান জমি
আমারে চিনিনে আমি ;
আমি একি বিষম ভুলে ভ্রমি।
আমি কোন্ জনা সে কোন্ জনা। ১।

রাম রহিম নাম বল্ছে কোন জন
ক্ষিতিজল কি বা হুতাশন,
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না। ২।

[যদি] হাতের কাছে না হয় খবর
কি দেখতে যাও দিল্লি লাহোর,
সেরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সবাই মনের ভ্রম যায় না। ৩।

। ২ ।

পাখী কখন যেন উড়ে যায়।
বদ্ হাওয়া লেগে খাঁচায়।
খাঁচার আড়া প'ল ধসে,
পাখী আর দাঁড়াবে কিসে?
এখন আমি ভাবি বসে
সদা চমক-জরা বচ্ছে গায়। ১।

কার বা খাঁচায় কার বা পাখী
কার জন্যে বা ঝরে আঁখি
[পাখী] আমারি আঙিনায় থাকি
আমারে মজাতে চায়। ২।

[যেদিন] সুখের পাখী যাবে উড়ে,
খালি খাঁচা রবে প'ড়ে ;
[সেদিন] সঙ্গের সাথী কেউ হবে না
লালন ফকির কেঁদে কয়। ৩।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

এখানে এই দুটি লালন-গান সম্পর্কে আরও একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। 'হিতকরী', 'সরলাদেবী' বা 'কাঙ্গাল হরিনাথে'র সংগ্রহের বাইরে, রবীন্দ্রনাথের আগে 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত সতীশচন্দ্রের এই গান দুটিকেই প্রথম লালন-গীতি সংগ্রহের মর্যাদা দিতে হয়। অথচ আশ্চর্য, প্রাথমিকের এই সম্মান বিরাট বিরাট বাউল গবেষণা বা সংগ্রহের মধ্যে কোথাও রক্ষিত হয়নি।

এর একমাস পরে, অর্থাৎ ভাদ্র ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'র পাতায় [পৃ. ৬৪০—৪২] আবার দুটি লালনের গান সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিত হলো। সংগ্রাহক শ্রীকরুণাময় গোস্বামী।' এই সংখ্যায় এঁর পাঠানো সাতটি গান মুদ্রিত হয়েছিল। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে লালনের রচনা। উপেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাউল গান সংগ্রহে এই গান দুটি মুদ্রিত হলেও তিনি কোথাও প্রথম সংগ্রাহক হিসেবে

গোস্বামী মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নি। আমরা এখানে সংগ্রহ কর্তার মন্তব্য সহ গান দুটি হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

। ১ ।

'দেখনা মন ঝকমারি, এই দুনিয়াদারী।
আচ্ছা মজা কপনি-ধ্বজা উড়ালে ফকিরী॥
যা কর যা করবে মন, তোর পিছের কথা রেখে স্মরণ বরাবরই
[ও তোর] পিছে পিছে ঘুরছে শমন,
কখন হাতে দিবে দড়ী।
[তখন] ঘরদের ভাই বন্ধু জনা,
সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না,
মন তোমারি ;
তারা একা পথে খালি হাতে বিদায় দিবে তোমারি।
বড় আশার বাসাখানি,
কোথায় পড়ে রবে মন তোর
ঠিক না জানি ;
সেরাজ সাঁই কয় লালন তোরে।
তুই করিস্ রে কার এন্‌তাজারি।

গানটি সেরাজ সাঁই ফকিরের রচনা।[১]

। ২ ।

খুলবে কেন সে ধন,
[ও তার] গ্রাহক বিনে।
[কত] মুক্তামণি রেখেছে সে ধনী,
[সে ধন] বাঁধাই করে যে দোকানে॥
সাধু মহাজন যারা, মালের মূল্য জানে তারা,
মূল্য দিয়ে লন অমূল্য রতন, সে ধন জেনে শুনে
তারাই কেনে।
মাখাল ফলের বরণ দেখে,
[যেমন] ডালে বসে নাচে কাকে,

তেমনি আমার মন চটকে বিমন
[মন তুই] দিন ফুরালি দিনে দিনে।
মন তোমার গুণ জানা গেল,
পিতল কিনে সোনা বল,
অধীন লালন বলে মন চিন্‌লিনে সে ধন,
মূল হারালি [মন তুই] নিজের গুণে।

প্রসিদ্ধ লালন সা ফকিরের রচনা। বোধ হয় সহস্র গান আছে। ডাক-হরকরার নিকট সংগৃহীত।”

এর পরের মাসে অর্থাৎ আশ্বিন ১৩২২ বঙ্গাব্দে ‘প্রবাসী’র পাতায় [পৃ. ৬৯৭—৮] রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রহের ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতএব একথা বলতে কোন লজ্জা নেই যে বিংশ শতাব্দীর সু-সংস্কৃত রুচিবান ভদ্রজনের কাছে ‘প্রবাসী’-র পাতাকে আশ্রয় করে লালনকে পরিচিত করানোর প্রাথমিক কৃতিত্ব সতীশচন্দ্র দাস ও করুণাময় গোস্বামীর—রবীন্দ্রনাথের নয়। অবশ্য ১৯০৯ থেকে ১৯১৩-র মধ্যে প্রকাশিত ‘শান্তিনিকেতন’ শীর্ষক গ্রন্থের প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে বা ১৯১৪ বা ঐ সম-সময়ের ছন্দ-সম্পর্কিত চিঠি-পত্রাদির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাউলদের কথা বলতে শুরু করেছেন [‘যে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে’]।[২]

১৩২২ এর আশ্বিনে ‘সংগ্রহকর্তা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ কর্তৃক সংগ্রহীত হয়ে ছয়টি লালন-গীতি মুদ্রিত হলো। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ‘প্রবাসী’তে লালন-গীতির যে পাঠ মুদ্রিত হয়েছে, আর শান্তিনিকেতনের ‘রবীন্দ্র ভবনে’ আজও রক্ষিত যে দুটি খাতায় প্রায় দুইশত আটানব্বইটির মতো গান তাতে লিখে রাখা হয়েছে,—উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পাঠভেদ, বানানের ব্যতিক্রম ইত্যাদি রয়েছে। আমরা কিছু পরেই ‘প্রবাসী’তে মুদ্রিত এবং ‘রবীন্দ্র ভবনে’ রক্ষিত

খাতার পাঠ এখানে পরপর উদ্ধৃত করে এই পরিমার্জনার স্বরূপটি বুঝতে চেষ্টা করেছি।[৩]

আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে 'প্রবাসী'র প্রতিটি সংখ্যার 'হারামণি' বিভাগের সূচনায় একটি সম্পাদকীয় Note দেওয়া হতো। কিন্তু এই আশ্বিন সংখ্যায় সেই পরিচিত Note টি অনুপস্থিত—কেবল গান দুটি মুদ্রিত করেই বিভাগ শেষ হয়েছে।

পরের মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক ১৩২২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লালনের কোন সংগ্রহ প্রকাশিত হলো না। তারপরের মাসে [অগ্রহায়ণ, ১৩২২ : পৃঃ ২০৭ – ৮] রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত তিনটি লালন ফকিরের গান মুদ্রিত হলো। সংগ্রহের শীর্ষে রইলো পূর্বোক্ত সম্পাদকীয় Note. এই সংগ্রহ সম্পর্কে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, এবারের সংগ্রহের প্রথম গানটিতে লালনের কোন ভণিতা নেই। এই কারণে আমি মন্তব্য করতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে লালনের উনিশটি গান প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়েছিল। অধিকন্তু মতিলাল দাশ সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত [১৯৫৮ খ্রীঃ] 'লালন-গীতিকা' গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠার ১০৯ সংখ্যক গানটি স-ভণিতা এবং পৃথক পাঠ-সহ মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু কি 'প্রবাসী'তে কি 'রবীন্দ্র-ভবনে' রক্ষিত খাতায় [১নং খাতার ২৮নং গান], কি 'বাংলার বাউল গান' গ্রন্থে [ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—প্রণীত : ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ : পৃ : ৫৪ : ৬০ সংখ্যক গান] কোথাও এই গানটিকে ভণিতা সহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে মতিলালবাবু পূর্ণ রূপে এই গানটি কোথায় পেলেন ? এবং লালনের রচিত গানগুলির সম্পাদনা করে গ্রন্থ প্রকাশ কালে কেনোই বা এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেন না,—যা অবশ্যই করা উচিত ছিলো। আমি সুধী পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে ঐ গানটির 'প্রবাসী'র এবং 'লালন-গীতিকা'র পাঠ এখানে যথাক্রমে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

ক। 'প্রবাসী' [অগ্রহায়ণ ঃ ১৩২২ ঃ পৃঃ ২০৭-৮]

[১]

'চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা।
আজ কেমন ক'রে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা।
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা,
তার মাঝে অ-ধর চাঁদের আভা,
ও সে চাঁদের বাজার দেখে, ঘুর্ণী লাগে.
দেখিস দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা।
চাঁদের গাছ চাঁদের ফল ধরেছে তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
একবার দৃষ্টি করে দেখি,
ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা' ।

খ। 'লালন—গীতিকা' পৃঃ ৭৪

চাঁদ আছে চাঁদ—ঘেরা।
আজ কেমন করে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা॥
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা,
তাহার মাঝে অধর চাঁদের আভা,
একবার দৃষ্টি ক'রে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা॥
রূপের গাছে চাঁদ ফল ধরেছে তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
ও সে চাঁদের বাজার দেখে,
চাঁদ ঘুরনি লাগে,
দেখিস দেখিস, পাছে হোস্‌নে জ্ঞান হারা॥
আলেক নামে শহর আজব কুদরতি
রেতে উদয় ভানু, দিবসে বাতি
যে জন আলের খবর জানে দৃষ্ট হয় নয়নে
লালন বলে, সে চাঁদ দেখেছে তারা॥"

পরবর্তী মাস পৌষ : বঙ্গাব্দ ১৩২২। 'প্রবাসী'র ২৯৩-৪ পৃষ্ঠায় 'সংগ্রহকর্তা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর কাছ থেকে আরও পাঁচটি 'লালন ফকিরের গান' পাওয়া গেল। এই সংখ্যাতেও সংগৃহীত গানগুলির আগে পূর্বোক্ত সম্পাদকীয় নোটটি যথারীতি মুদ্রিত হয়েছিলো।

এরপর উক্ত পত্রিকার মাঘ, ১৩২২ বঙ্গাব্দের ৪০৪—৫ পৃষ্ঠায় একই রূপ সম্পাদকীয় note-সহ 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে আরও ছয়টি 'লালন ফকীরের গান' মুদ্রিত হলো।

এছাড়াও পরের বছর অর্থাৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার পৃ ৩৯১-তে শ্রীহরেন্দ্রনাথ মণ্ডল কর্তৃক আরও একটি 'লালন ফকীরের হুকার গান' উদ্ধৃত হয়। সংগ্রহের শীর্ষে পূর্বের মতই সম্পাদকীয় note-টি ছাপা হয়েছিলো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হরেন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালনের এই 'হুকার গান'টি আজ পর্যন্ত কোন পরিচিত লালন-সংগ্রহে মুদ্রিত হ'তে দেখা যাচ্ছে না, এমন কি এটার সম্পর্কে কাউকে কোন রকম মন্তব্য করতেও দেখতে পাচ্ছি না। অবশ্য সম্প্রতি [১৯৬৮] পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশ থেকে মুহম্মদ আবু তালিব সংকলিত 'লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা' [১ম খণ্ড]-র ৪০৩ পৃষ্ঠায় [গান সংখ্যা ১৭৫] এই গানটি সম্পূর্ণ আধুনিক ভাষা-দেহ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাহুল্য বিধায় আমরা এখানে এই আধুনিক পাঠটিকে পরিত্যাগ করে 'প্রবাসী'র পাতা থেকে সংগ্রাহক —শ্রীহরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'হুকার গান'টিকে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"সরোবরে আসন ক'রে রয়েছেন আনন্দময়,
ও তার জীবন শূন্য,
সদাই মান্য,
          স্বয়ং ব্রহ্ম তাঁর মাথায়। দেখ।।
চক্ষু আছে নাহি দেখে,
তিন মড়া একত্র থাকে,

মুই দিয়ে সে পয়ের মুখে
মর্মের কথা কয় ;
[ওরে] একে মড়া, নাই তার জীবন,
ও তার পেটের মধ্যে জ্যান্ত একজন,
সাধকেতে সাধে যখন,
ডাকলে মড়া কথা কয়। দেখ ॥

করছে লীলা ভবের পরে,
দেবের দেব পূজেছেন যারে,
পদ নাই, সে চলে ফেরে,
রসিকের সভায় ;
[ওরে] সবে মজে সেই পীরিতে,
বিলাচ্ছে প্রেম হাতে হাতে,
লালন বলে সেই পীরিতে
মজেছে সব আপন ইচ্ছায়। দেখ ॥

—লালন ফকীর”

এরপরে 'হারামণি' বিভাগ আস্তে আস্তে অনিয়মিত হয়ে আসতে লাগলো। যদিও ক্ষিতিমোহন প্রমুখ মাঝে-মধ্যে গান সংগ্রহ করে পাঠাতে লাগলেন, তবুও 'হারামণি' অচিরেই মণি হারা হয়ে পড়লো, লালনও আর দেখা দিলেন না। তা সত্ত্বেও 'প্রবাসী'র এই এক ক্ষুদ্র বিভাগ বাংলার কাব্য এবং চিন্তা জগতে রসের ও ভাবের যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তা রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন, মনসুর উদ্দীন, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখের সাধ্য এবং সাধনার মধ্যে মূর্ত হয়েছে।"

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংগৃহীত হয়ে 'প্রবাসী'র পাতায় মুদ্রিত এবং শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র-ভবন'-এ রক্ষিত পাণ্ডুলিপি [নং ১৩৮ এ]-র একটি গান উদ্ধৃত করে উভয়ের মধ্যকার সংস্কার-চিহ্নটিকে দেখবার চেষ্টা করবো। কারণ, লোক-সংস্কৃতি oral tradition-কে আশ্রয় করে জীবিত থাকে। কিন্তু তা যখন শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির পাল্লায় পড়ে তখন তার রূপে সংস্কার সাধিত হলেও

স্বরূপে বিকৃতি অনিবার্য ভাবেই ঘটে থাকে। এটি কিন্তু লোক-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সর্বদা বর্জনীয়।

॥ রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত লালনের গানের ২ সংখ্যক খাতার ৬১নং গান॥

অবিকল প্রতিলিখন

'আছে জার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা। অতি
নির্জ্জনে সে বশে ২ দেখচে খেলা॥ কাছে রএ ডাকে তারে
উচ্চস্বরে কোন পাগেলা ওরে জেজা বোজে তাইনেবুজে
থাকরে ভোলা॥ জথা জার ব্যেথা নেহাত সেই থানে
হাত ডলামলা তম্নী জেনো মনের মানুষ মনে তোলা॥
জে জোনা দেখে সেরূপ কত্রি চুব রয় নিরালা ও সে নালন
ভেড়ের লোক জানানো হরি বোলা মুখে হরিহরি বোলা॥'

॥ 'প্রবাসী'র : আশ্বিন ১৩২২ : পৃ ৬৯৭ ৮ এ মুদ্রিত পাঠ॥

'আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জনে বসে বসে দেখ্‌ছে খেলা।
কাছে রয়ে, ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন্ পাগ্‌লা;
ওরে যে যা বোঝে, তাই—সে বুঝে থাক্‌রে ভোলা।
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেইখানে হাত ডলা মালা;
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জন দেখে সেরূপ করিয়ে চুপ রয় নিরালা,
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানান হরি বলা,
মুখে হরিহরি বলা।"

১। সংগ্রাহকের এই মন্তব্য ঠিক নয়। গানটি লালনেরই রচনা সংগ্রাহক ভণিতাটির ভুল অর্থ ধরেছেন।

২। অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসন-কে লিখিত পত্র : মে-জুন ১৯১৪।

৩। 'রবীন্দ্র-ভবন'—শান্তিনিকেতনে যে দুটি খাতা রাখা আছে তার প্রথমটির ৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা আছে ১২৬টি গান এবং দ্বিতীয়টির ৯৫ পৃষ্ঠার

মধ্যে লিখিত আছে ১৭২-টি গান [মোট ২৯৮টি]। এর মধ্যে ১নং খাতার ১০৭ নং গানটি কেটে দেওয়া আছে। এই খাতার লিখন-পদ্ধতি মুসলমানী রীতি অনুযায়ী—শেষ থেকে আরম্ভ।

৪। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থে 'প্রবাসী'-র পাঠই লক্ষ্য করা যায়। অধিকন্তু তিনি ঐ গানটির পাদটীকায় লিখেছেন : 'খাতায় এই গানটিতে ভনিতা নাই। ফকিরদের মুখেও ভণিতা শুনি নাই।'

৫। এখানে লক্ষ্য করা গেল যে 'প্রবাসী'-র দু-বছরের 'হারামণি' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মোট উনিশটি [২০ টি ?] সহ মোট চব্বিশটি [২৫টি ?] লালন-গীতি সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানের [অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্র] জনৈক গবেষক জনাব শাহ লতীফ আফী আনহু পশ্চিমবঙ্গের [ভারতরাষ্ট্র] নবদ্বীপের চরব্রহ্ম নগরের রামচন্দ্র মণ্ডল নামক এক বৈষ্ণব ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পাণ্ডু-লিপিটি লালনের একমাত্র জীবনী। লতীফ সাহেব দাবী করেন যে লালনের কোন এক শিষ্য, নাম দুদ্দু শাহ এই লালন জীবনীর রচয়িতা। লালন নাকি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র এই দুদ্দু শাহর নিকট তাঁর জীবনের নানা ঘটনা, জন্ম-তারিখ, জন্মস্থান ইত্যাদির সব কিছুই বলে গেছেন।

অধিকন্তু উক্ত রামবাবু কর্তৃক এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ঘটনাটিও খুবই কৌতূহল উদ্রেককারী। জানি না কি উপলক্ষে রামবাবু ১৯৪৪-৪৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে [পৌষ ১৩৫১ বঙ্গাব্দ] যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার কালীগঞ্জের হাটের বিষাইখালি গ্রামের জনৈক মুদীর দোকানে উপস্থিত হয়ে পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে থেকে এই পুঁথিটি উদ্ধার করেন। তখন কেমন ভাবে যে উক্ত লতীফ সাহেব রামবাবুর কাছ থেকে উক্ত পুঁথিটি উদ্ধার করলেন তাও আমরা জানি না। অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে এই লতীফ সাহেব পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত 'সমকাল' [চৈত্র ১৩৬৬, পৃ. ৬০৩] নামক একটি মাসিক পত্রে 'বাউল কবি দুদ্দ শাহ' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে এই কলমী পুঁথির উল্লেখ আছে। জানি না সেখানে দুদ্দু শাহ-কর্তৃক রচিত বলে কথিত উক্ত পুঁথিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত আছে কি না? কিন্তু যেহেতু এস. এম. লুৎফর রহমান কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ও মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত পূর্ব-পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ নামক এক গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠা থেকে ২৯০

পৃষ্ঠায় উক্ত জীবনীটি মুদ্রিত করে দিয়ে এতদিনের লালন-চর্চায় বিরাট তথ্যগত বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করেছেন, সেইহেতু এখানে আমরা উক্ত গ্রন্থ থেকে ঐ লালনের জীবনীটুকু হুবহু উদ্ধৃত করে দিয়ে, তারপরে তার প্রামাণিকতা ও বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিচারের চেষ্টা করবো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে লুৎফর রহমান সাহেব লতীফ সাহেবের কাছ থেকে পুঁথিটি দেখেন ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে এবং উক্ত প্রবন্ধের পরিশিষ্টে লালন-জীবনীর পুঁথিটি যোগ করেন ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে। মূল পুঁথিটির পাঠ এই রকম :

'মানুষ গুরু লালন সাই দরবেশের চরণ সহায
ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই।
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই॥
জাতি ধর্ম শাস্ত্র আদি মীমাংসা করিয়া।
নব সত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া॥
আমার দয়াল মুর্শীদ কৃপা প্রকাশিয়া।
তাঁর আত্মকথা কিছু গিয়াছে বলিয়া॥
তাঁর মহা আত্মকথা আমি কি জানিব।
যার কথা সে যদি না কয় কিসে প্রকাশিব॥
আলম ডাঙ্গা গ্রামে শুকুর সার আশ্রমে।
আরজি করিনু আমি অতিব নির্জনে॥
দয়াল দরদি সাই করুণা করিয়া।
কত কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়া॥
এত শুনি দয়াল সাই মোর পানে চায়।
মৃদু হাসি এই দাসে যাহা কিছু কয়॥
বহুদিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া।
সাইজির ছিল মানা নাহি প্রকাশিবা॥
নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া।
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া॥
একারণে শেষকালে লিখি তাঁর বাণী।
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী॥

মুখ্ তাছায় তার কিছু বর্ণনা করিব।
তাঁহার চরণমূলে ফানা হয়ে যাব ॥
এগারশো উনআশী কার্ত্তিকের পহেলা।
হরিশপুর গ্রামে সাইর আগমন হইলা ॥
যশোহর জেলাধিন ঝিনাইদহ কয়।
উক্ত মহকুমাধিন হরিষপুর হয় ॥
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাঁহার।
বংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাঝার ॥
দরীবুল্লাহ দেওয়ান তাঁর আব্বাজির নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম ॥
শিশুকালে সাইজিরে তাঁরা ছাড়ি গেলা।
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা। [১ । ৩৩]

এমনি নিদানকালে বৈশাখ মাসেতে।
আনমনে একাকী সে রহে বসে পথে ॥
সাইজির লীলা খেলা কে বুঝিতে পারে।
সিরাজ সা দরবেশে দেখে নিল তাঁরে ঘরে ॥
কুলবাড়ী হরিষপুরে সিরাজ সা'র বাস।
পাল্‌কী টানিয়া করে জীবিকার অন্নাষ ॥
কালক্রমে সাই তাঁরে বায়াৎ করিল।
মানুষ তত্ত্বাদি সব বুঝাইয়া দিল ॥
ছাব্বিশ বৎসর যবে বয়স তাঁহার।
উঁহারাও ছাড়ি গেল নিজ নিজ ঘর ॥
এমনিই কিশোর কালে ফকিরের বেশে।
নবদ্বীপ ধামে গিয়া আপনি প্রকাশে ॥
পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।
নিজাবাসে লয়ে গেল সেহি ক্ষত্র ধনী ॥
পদ্মাবতীর গৃহে কিছুকাল যায়।
একদিন যান এক পণ্ডিত সভায় ॥
পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁরে বিবিধ পুছিল।
সাইজি নাম ধাম সকলি বলিল ॥

সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভার।
যবন বলিয়া দূরে সেবা দেয় তাঁর॥
সাঁইর লীলা কিছুমাত্র বুঝা নাহি যায়।
প্রতি একজনার মাঝে লালনে দেখায়॥
উহা দেখি পণ্ডিত গণ চমকিত হইল।
সবে ভাবে মনে মনে কোন জন আইল॥
ছলিতে আইল বুঝি গৌরাঙ্গ সুজন।
দূরে রেখে সেবা দিনু কাহারে এখন॥
তখনি সকলে মিলি গৌরধ্বনি করে।
করজোড়ে নত শিরে দুটি পদ ধরে॥
মিনতি করিয়া কাঁদে দয়াল গোঁসাই।
মোদের ছলিতে এলে মোরা বুঝি নাই॥
ক্ষমা কর দীনবন্ধু পাতকী জনারে।
গড়াগড়ি যায় আর এমত ফুকারে॥ [২:৬৫]

তখনি দয়াল সাঁই বুঝাইয়া বলে।
বিভিন্নতা করিও না জাতি-ধর্ম ব'লে॥
আলেখ অধর সেই দয়াময় সাঁই।
সৃষ্টি স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই॥
জাতি ধর্ম কুলগোত্র মানুষের সৃজন।
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখিনা কখন॥
সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর।
নানাস্থানে নানারূপে করেন বিহার॥
এই মতে একে একে নানা মহালীলা।
কাশী বৃন্দাবন ধামে গিয়া প্রকাশিলা॥
যুগ অবতার বলি সর্বভক্তগণ।
করিতে লাগিল তাঁর চরণ-বন্দন॥
হেনকালে একদিন খেঁতরি গেরামে।
উপনীত হইলেন ভ্রমণ কারণে॥
তথা হইতে নৌকাযোগে ভ্রমণ কারণ।
দক্ষিণ পূর্ব দেশে করিলেন গমন॥

কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে।
আক্রান্ত হইলে তাঁরে ফেলায় নদীতে॥
ভক্তবৃন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাহার।
মাঝিগণ ফেলে তাঁরে দরিয়া মাঝার॥
ভাসিতে ভাসিতে তিনি কালীগঙ্গা তীরে।
ছেউড়িয়া গ্রামের পাশে এক ঘাট ধারে॥
ভাসিতে ছিলেন যবে অচেতন হালেতে।
দেখি পরমাত্ম ভাই মলম নামেতে॥
সযতনে তুলে আনে আপনার ঘরে।
দুগ্ধ আদি নানা পথ্য দিয়া সেবা করে॥
এই রূপে একমাস গুজারিয়া যায়।
ব্যাধি মুক্ত হন তিনি খোদার কৃপায়॥
একদা মলম মম পরমাত্ম ভাই।
অমন ভক্ত পদে প্রণাম জানাই॥
নিজমনে তেলাওত করেন কোরান।
সাই ভুল ধরি তার করেন ফরমান॥ [৩।৯৫]

কি পড় কোরয়ান মিঞা এত ভুল করি।
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি॥
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়।
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়॥
এত শুনি সাই তারে বুঝাইয়া দিল।
নাহি জানি লেখা-পড়া ইহাই বলিল॥
দয়াল মুরশীদ মোরে লাদুন্নির জ্ঞান।
কিঞ্চিত দিয়াছে তায় করিনু বয়ান॥
এই ভাবে দিনে দিনে দিন গত হইল।
মলম সা ভাই তারে গুরু করে নিল॥
বাড়ীর দক্ষিণ দিকে তেঁতুল তলায়।
আস্তানা করিয়া দিল মুরশীদ সেবায়॥
স্বামী স্ত্রী দুইজনে তাহার কদমে।
হাজের হইয়া রহে হুজুরী মোকামে॥

তখন তাঁহার বয়স তেতাল্লিশ হইল।
চারিদিক হইতে বহু ভক্ত জুটিল॥
নানা দেশ হতে ধেয়ে আসে নানাজন।
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন॥
চক্কর ফক্কর আর মানিক মলম।
কোরবান মনিরুদ্দিন আসে কতজন॥
কতজন ছিল মোর প্রভুর গোলাম॥
কি কব তাদের পদে হাজার সালাম॥
বাহাছ করিতে গিয়া বায়াৎ হইনু।
আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু॥
বার শত পচানব্বই বাঙ্গালা সনেতে।
পহেলা কার্ত্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে॥
সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল।
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল॥
মো অধমে বাবা বলে কে আর ডাকিবে।
আমার দীন মুখে চুম্বন করিবে॥
অমন মধুর বাণী কে আর শোনাবে।
আর কি ছেউড়িয়া ধামে করুণা বর্ষিবে,
চাঁদের বাজার কি গো মিলাইবে আর।
হিন্দু-মুছলমান সবে করে হাহাকার॥
আমি দীন দুদ্দু নাম দীনের অধিন।
সারা অঙ্গে আজু মোর আজারির চিন॥ [৩।১৩১]

বেলতলা হরিষপুরে জনম আলয়।
কেহ কেহ কুলবড়ী হরিপুর কয়॥
শাস্ত্র ধর্ম তীর্থ আদি সর্ব প্রবচন।
সকল ছাড়িয়া দিলেন মানুষ ভজন॥
বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এহি মত দেখ সবে নয়বস্তু ধরি॥
যাহা বুঝিয়াছি আমি তাঁহার কৃপায়।
কাহারে বুঝাব উহা অধর কোথায়॥

রজঃ বীর্য এই দুই বস্তু যেবা চিনে।
লালন সাইজিকে সেই জন জানে॥
মানুষ অবতার সাই তাহার মহিমা॥
কি বলিব আমি হীন নাই তার সীমা॥
ওলিয়ে আরেফ সাই বাঙ্গালা দেশেতে।
দীনহীন দুদ্দু ভনে তাঁহার কৃপাতে॥
দয়াল মুরশীদ সাই আল্লাহ আলেখ্।
যারে ধরে মিলিয়াছে বরজখ্ ছাদেক॥ [৫।১৪৭]

সন ১৩০৩ সাল ১লা কার্ত্তিক
বার্ষিক অধিবাস ছেঁউড়িয়া
থানা ভালুকা জেলা নদীয়া। ৫। ১৪০।

ওপরে দুদ্দুশাহ রচিত কলমী পুঁথিটির উল্লেখ করা গেল। দেখা যাচ্ছে যে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ এবং মোট ১৪৭টি চরণ আছে। এখন এর প্রমাণিকতা বিচার করা যাক্ঃ

ক. পুঁথি শেষে দুদ্দু যে ঠিকানা দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি এই পুঁথির লিপি শেষ করেছেন গুরুর আস্তানায়। অর্থাৎ এখানে তিনি বাস করতেন। এবং সেই বাসস্থানে বা আখড়ায় বসেই তিনি গুরুর মৃত্যুর ছ-বছর পরে [দুদ্দুর হিসেবে আট বছর পরে] এটি রচনা করেন।

খ. অধিকন্তু যাঁরা দুদ্দুর রচিত উক্ত পুঁথিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে নিয়ে পুরাতন সমস্ত বিচারকে চ্যালেঞ্জ জানালেন তাঁরা, অর্থাৎ এস. এম. লুৎফর রহমান, আবু তালিব অথবা পুঁথির আবিষ্কারক জনাব শাহ লতীফ আফী আনহু সকলেই বলেছেন যে 'লালনের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে দুদ্দুশাহ-ই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।'[১] কিন্তু লালনের এমন শ্রেষ্ঠ শিষ্য যিনি লালনের আখড়াতেই বাস করতেন, এমন কি তাঁর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বেও উপস্থিত ছিলেন তাঁর কথা 'হিতকরী' বা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কেউ-ই উল্লেখ করলেন না কেন? 'হিতকরী' তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে দু-বার জানিয়েছেন যে:

শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরস-জাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।' আবার, 'শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মাণিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন।' এর মধ্যে দুদ্দু শাহ কোথায়? লুৎফর সাহেব বা অন্য কেউ কি 'কুধু সা'-কে দুদ্দ শাহ বলতে চান?

এরপরেও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে দুদ্দু লালনের প্রিয় শিষ্য ছিলেন তবে তাকে অস্বীকার না করেও বলা যায় যে সারা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে লালনের যে অসংখ্য শিষ্য ছিল, দুদ্দু তাঁদের অন্যতম প্রধান, যিনি যশোহরের হরিশপুর অঞ্চলেই বসবাস করে লালনের ভাব ও তত্ত্ব প্রচার করেছেন।

গ. দুদ্দু শাহের কলমী পুঁথি উক্ত আবদুল লতীফ সাহেব সর্ব-প্রথম সাধারণের গোচরে আনেন পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত এক সাম-য়িক পত্র 'সমকাল' ১৩৬৬ চৈত্র-এ 'বাউল কবি দুদ্দু শাহ' নামক এক প্রবন্ধে।'[২] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর পাঁচ বছর পরে ঢাকা 'বাঙলা একাডেমী' থেকে 'বাউল গান ও দুদ্দু শাহ' [১৩৭১, কার্ত্তিক] নামক যে দীর্ঘ ভূমিকা সহ [বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত] যে গ্রন্থ প্রকাশিত হলো, তাতে কিন্তু উক্ত পুঁথি বা ঐ সম্বন্ধে একটা শব্দও উচ্চারিত হলো না। এমন কি দুদ্দুর ৩১৪-টি গান যেখানে স্থান পেল সেখানে এমন দুর্লভ পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রিত হলো না কেন? অনেকে হয়তো এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারেন যে, অন্যের সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থে আবদুল লতীফ সাহেবের সংগ্রহ বা আবিষ্কার স্থান পাবে কেন? তার উত্তরে গ্রন্থের সম্পাদক নিজেই লিখছেন: 'দুদ্দু শাহের গানগুলি সংগ্রহ করেছেন সুফী আব্দুল লতিফ আনহু। তাঁর বাড়ী নারকেলবেড়িয়া, যশোর।' অতএব দুদ্দু শাহের বলে কথিত উক্ত জাল পুঁথিকে 'বাঙলা একাডেমি'র মত দায়িত্ববোধ সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান মেনে নিতে রাজী হননি।

উক্ত পুঁথি সম্পর্কে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে

করি। তবুও ওপার বাংলার দু-জন বিশিষ্ট লালন এবং বাউল গবেষকের কয়েকটি মত উদ্ধার করে আমাদের বক্তব্য শেষ করবো। প্রথমজন বলছেন :

"প্রথমত : দুদ্দু শাহ্-এর লিখিত বলে কথিত এই পুঁথির শব্দ সংযোজন মোটেই প্রাচীন কালের নয়। 'আব্বা' শব্দটি কোন অবস্থাতেই পুরাতন নয়। এই শব্দটি একান্ত করেই আধুনিক। গ্রামে আজ থেকে ৫০। ৬০ বৎসর আগে 'আব্বা' শব্দ প্রচলিত ছিল না। 'বাজান', 'বাপজান,' 'বাজী' ইত্যাদি শব্দই বিশেষ ভাবে পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অনেক শিক্ষিত লোকও বাপকে বা'জান বা বড় বাপজান বলায় অভ্যস্ত ছিল।

"দ্বিতীয়ত : দুদ্দু শাহের এই পুঁথি সম্পর্কে অধ্যাপক আবু তালিব মন্তব্য করেছেন, 'দুদ্দু শাহ লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় যশোরের চরচড়িয়া গ্রাম নিবাসী লালনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য সুকুর শাহের আশ্রমে বসে একদিন লালন তাঁর আত্মজীবনী তার প্রিয় শিষ্যকে শোনান। পরে সেই কাহিনী দুদ্দু শাহ লিপিবদ্ধ করেন। অধ্যাপক তালিবের মতে দুদ্দু শাহ লালন শাহের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এহেন প্রিয় শিষ্যকে বাদ দিয়ে লালন কি কারণে তা দুদ্দু শাহকে ব্যক্ত করেন নি তা জানা যায় না।

"দুদ্দু শাহ যশোর জেলার অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু এই পুঁথির ভাষা কোন ক্রমেই যশোর অঞ্চলের নয়। আগমন হৈলা, ছাড়ি গেলা, আইস্যা, আইল্যা ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ এই অঞ্চলের নয়।"[৬]

এরপর এই সম্পর্কে মন্তব্য করছেন কুষ্টিয়ার তরুণ লালন-গবেষক জনাব আবদুল আহসান চৌধুরী। তিনি লিখেছেন : "যাঁরা লালনকে যশোরের লোক হিসেবে দাবী করেছেন, তাঁদের যুক্তি প্রমাণের মধ্যে রয়েছে দুদ্দু শাহ রচিত লালন-জীবনীর তথা কথিত কলমী পুঁথি, আবদুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধের বিশেষ একটি অংশ, কিছু ব্যক্তিকে শেখানো তথ্য ও তাঁদের স্বকপোল-কল্পিত কাহিনী।

এর মধ্যে দদ্দু শাহ রচিত কলমী পুঁথির মৌলিকত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ও পুঁথি-বিশেষজ্ঞ ড. আহমদ শরীফ সন্দেহ প্রকাশ করে তা নাকচ করে দিয়েছেন। এই পুঁথিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দাবলীর প্রচলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। তা ছাড়া দদ্দু শার মতো একজন বাউল কবি এ ধরণের পুঁথি রচনা করবে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দদ্দু শার বাউল গীতাবলী বিশ্লেষণ ও আলোচনা করলে তার যে একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গী ও শব্দ ব্যবহার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তার সাথে এই পুঁথির অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গে কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পুঁথির আলোক-চিত্র অনুলিপিও ইতিপুর্বে কোনো গ্রন্থ বা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। সম্প্রতি আমি এই পুঁথি স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করায় বলা হয়েছে, এটি শাহ আবদুল লতীফ আফী আনহুর গৃহে অগ্নিকাণ্ডর ফলে অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে দগ্ধীভূত হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে দদ্দু শাহ রচিত তথা কথিত কলমী পুঁথির সংগ্রাহক হিসাবে শাহ আবদুল লতীফ আফী আনহু এবং এস. এম. লুৎফর রহমান দুজনেই এই কৃতিত্ব দাবী করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগে একই পুঁথির আসল [?] কপি স্বতন্ত্র ভাবে দুইজন কিভাবে সংগ্রহ করতে পারেন? এথেকে উক্ত কলমী পুঁথির অস্তিত্ব ও মৌলিকত্ব সম্পর্কে আরো বেশী সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে।'

এছাড়াও যেভাবে পুঁথিটি আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে তাতে তথ্যবস্তু অপেক্ষা গল্প-রসের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এই সমস্ত বিচারে আমরা উক্ত পুঁথিটিকে জাল বলে পরিত্যাগ করতে পারি।"[৪]

১। দ্র. মুহম্মদ আবু তালিব : 'লালন শাহ ও লালন গীতিকা' : প্রথম খণ্ড : ঢাকা ১৯৬৮ : পৃ. ৬৯।

২। দ্রষ্টব্য ঐ গ্রন্থের ভূমিকার 'হ' পৃষ্ঠা।

৩। অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম : 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান' : কুষ্টিয়া ১৯৭১ : পৃ. ২১৪—৫।

৪। আবুল আহসান চৌধুরী : 'কুষ্টিয়ার বাউল কবি' [১৯৭৪ : ঢাকা] পৃ. ৭১-৭২।

লালন ফকির ঃ কাব্য

'বিশ্বভারতী' : শান্তিনিকেতনের মাননীয় উপাচার্য ডঃ শ্রীসুরজিৎ সিংহ এবং বাংলা বিভাগের প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, রীডার ডঃ শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী ও 'রবীন্দ্র-ভবনের' কর্মীবৃন্দের সহৃদয় সহ-যোগিতায় ও সৌজন্যে এই 'লালন পদাবলী' প্রকাশিত হলো। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। এতে রসপর্যায় অনুসারে বিভক্ত হয়ে মোট ২৮৫টি গান প্রকাশিত হলো। 'রবীন্দ্র-ভবনে' রক্ষিত দুটি খাতায় [পাণ্ডুলিপি নং—১৩৮ ও ১৩৮ এ] মোট—৬৭+২৫ পৃষ্ঠায় সাকুল্যে ২৯৭টি গান লেখা আছে। কিন্তু তার মধ্যে বারটি গানের পুনরাবৃত্তি ঘটায় তাদের একটি পাঠ-কে পরিহার করা হলো। এবং ২নং খাতার ৫৬ পৃষ্ঠায় ঐ খাতারই ৫১ পৃষ্ঠার ৯৮ নং গানটিকে সম্পূর্ণ লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।

'লালন পদাবলী'-কে রসপর্যায় অনুসারে বিভক্ত করে প্রকাশের প্রচেষ্টা এই প্রথম। তাই সে কাজে যে অপূর্ণতা রইলো তা ভবিষ্যতে সংশোধিত হবে। আমার যুক্তি-ঋদ্ধ প্রত্যয় [বিশ্বাস নয়] যে, এই গানগুলিই লালন রচনা করে ছিলেন। বাকী সবই ভেজাল। এর বাহিরে যা চলে, চলছে এবং চলবে সেগুলি হচ্ছে 'স্বরচিত লালন-গীতি'। পরে এবিষয়ে আলোচনা করেছি।

এখানে প্রত্যেক গানের আরম্ভে যে তিনটি সংখ্যা আছে তার প্রথমটি খাতার, দ্বিতীয়টি ঐ খাতার গানের এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ঐ খাতারই পৃষ্ঠার পরিচায়ক।

লালন-পদাবলী

গৌরচন্দ্র

[১।২২] : ১৩

গৌউর প্রেম আথাই আমি ঝাপ দিএ চিতায়।
এখন আমার প্রাণ বাচা ভার করি কি উপায়॥
ইন্দ্র বারি সাসিত কোরে
উজন ভাটা বাএতে পারে
সে ভার আমার নাই অন্তোরে
কোট সাদি কথায়॥
একে শে প্রেম নদীর জলে
থাএ মেলে না নঙ্গোড় ফেলে
বেহুদারি নাইতে গেলে
কাম কুম্ভিরে খায়॥
গৌউর প্রেমের এমনি লেঠা
এসতে বাটা জেতে বাটা
না বুজে মুড়ালাম মাথা
ওখিন লালন কয়।

[১।৫০] : ২৮

জদি গৌর চাঁদকে পাই।
গেলো ২ এ ছার কুল তাতে খেতি নাই॥
জর্ম্মিলে মরিতে হবে
কুল কি কহর সংঙ্গে জাবে
মিছে কিবল দুদিন ভবে
কুলের বড়াই॥
কি ছার কুলের গৌরব করি
অকুলের কুল গৌউর হরি
ভবো তরংঙ্গের তরি
গৌউর গোসাই॥
ছিলাম কুলের কুলো বালা
কন্দে নিলাম অচলা ঝোলা
লালন বলে গৌউর বালা
আর কারে জরাই॥

[১।৫২] : ২৯ দাঁড়া কানাই এগবার দেখি ।

কে তোরে করিলো বেহাল

হলিরে কোন দুখের দুখি ।।

পরণ ছিলো পিতো ধড়া

মাথায় ছিলো মহন চুড়া

সে বেষ হইলি ছাড়া

বেহাল বেষ নিলে কোন ভকি ।।

ধেহু রেকতে মদের রাতে

আবাই ২ ধোনি দিতে

এখন এশে নদিআতে

হরির ধনি দেও এ ভাব কি ।।

ভুল বুঝি পড়েচে ভাই তোর

আমি সেই ছিদেম নফর

লালন কয় ভাব সোনে বিভর

দেখালে সাফল্য দৈত আফি ।।

[১:৭৭] : ৪২ আজ আমার অন্তোরে কি হোলো গো সই ।

আজ ঘুমের ঘোরে চাঁদ গৌউর হেরে

ওগো আমি জেন আর আমি নয় ।।

আজ আমার গৌউর পদে মন মজিলো

আর কিছু লাগে না ভালো

সদায় মনের চিন্তা ঐ ।।

আমার সবস্ব ধন ও চাঁদ গৌরাঙ্গ ধোন

সে ধোন কিসে পাই গো ভাই সুধাই ।

জদি মরি গৌউর বিচ্ছাদ বানে

গৌউর নাম শুনাও কানে

সবংকে লোথো নায়েম বৈ ।।

এই বয় দেগো সবে

আমি জর্মে ২ জন

ঐ গৌউর পদে দাসি হই ।।

বোন পোড়ে তা সবায় দেখে

মনের আগুন কেবা দেখে
আমার রসরাজ চৈতন্ন বৈই ॥
গোপির এম্নী দশা
এ কি মনন [মরণ] দশা
অবদ লালন বে তোর সে ভাব কোই ॥

[২।১৫] : ৯ জেনবো হে এই পাপি হইতে।
জদি এশেচো হে গৌউর জিবকে তারিতে ॥
নদিয়া নগরে জতো জোন
সভারে বিলালে প্রেম ধোন
আমি নর অধোম না জানি মরোম
চেইলে না হে গৌর আমা পানেতে ॥
তোমারি প্রেমেরী হাওায়
কাষ্ঠের পুথলি নলিন হয়
আমি দিনহিন ভজন-বেহিন
অপার হোএ বসে আছি কুপতে ॥
মালোওা পর্ব্বতেরী উপর
জতো নিম্ব সকলি হয় সার
কেবল জাএ জানা বাশে শার হয় না
লালন পেলো ওম্নী
প্রেমর্শন্ন চিত্তে ॥

[২।২১] : ১২ দয়াল নিতাই কারো ফেলে জাবে না।
চরোন ছেড়ো না রে ছেড়ো না ॥
দিড় বিশ্বাষ করি এমন
ধরো নিতাই চাঁদের চরোন
এবার পার হবি পার হবি তুফান
অপারে কেউ থেকবে না ॥
হরির নাম তোরোনি লোএ
ফিরচে নিতাই লেএ হয়ে
এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে
সমন কেনে নিলে না ॥

কোলির জিবকে হোএ সদায়
পাপে জেতে তেকচে নিতাই
ওখিন লালন বলে মন চলো জাই
এমন দয়াল মিলবে না ॥

[২।২৬] : ১৫ আর কি গৌউর এসবে ফিরে।
মানুষ ভজে জে জা করো
গৌউর চাঁদ গিয়েছে শেরে ॥
একবার এশে এই নদিয়ায়
মানুষ রূপে হোএ উদায়
প্রেম বিলোলে জথা তথা
গেলেন প্রভু নিজ পুরে ॥
চার জুগেরো ভাজান আদি
বেদেতে রাখি এ বিধি
বেদেরো নিগুর রশপান্তী
গুপে গেলেন ছিরূপে রে ॥
আর কি সেই অর্দ্দইত গোশাই
আনবে গৌউর এই নদিয়ায়
নালন বলে সে দয়াময়এ
কে জানিবে এ সংসারে ॥

[২।৩৫] : ১৯ কাজ কি আমার এছার কুলে।
আমার গৌউর চাঁদকে জদি মেলে ॥
মন চোরা পাশোরা গৌরো রায়
অকুলের কুল জগোতময়
লোবকুল আশায় সে কুল দোসায়
বিবদ ঘোটবে তার কপালে ॥
কুলে কালি দিএ তোজবো সেই
আন্ত্রিম কালে বান্দোবো জেই
ভবো বন্দু জোন কি কোরবে তখন
দিন বোন্দুর দয়া না হইলে ॥

কুল গৈরবি লোক জারা
গুরু গৌরব কি জানে তারা
জে ভাবের জে লাব জানা জাবে সব
নালন বলে আখের হিসাব কালে ॥

[২।৬৩] : ৩৪ গুরু দেখায় গৌউর
তাই দেখি কি গুরু দেখি ।
গৌউর দেখতে গুরু হারাই
কোন রূপে দেই আক্ষি ॥
গুরু গৌউর রহিলো দুই ঠাই
কি রূপে এক রূপো করি তাই
এক নিরাপন না হলে মন
সকল হবে ফাকি ॥
প্রবর্ত্তের নাই কোনো ঠেকনা
সাদ্ধী কিশে হবে সাধোনা
মিছে শদায় সাদু হাটায়
নাম পাড়াই সাদ কি ॥
এক রাজ্জে হোলে দুজনা রাজা
কার হুকুমে গতো হয় প্রজা
নালন বলে তম্মী গো [গোলে]
খাতায় পোলো বাকি ॥

[২।৭০] : ৪২ কোরা কেও জাশনে ও পাগোলের কাছে ।
তিন পাগোলে হলে মেলা নদেএ এসে ॥
কি এক পাগলাম কোরে কোল দেয় জাত অজাতেরে
দোড়িএ জেএ
ও তার নাই জেতের বোল এমন পাগোল
কে দেখেছে ॥
একটা নারকোলের মালা তাকে জল খাওা ফেলা
করংঙ্গ সে ।
আবার হরি বলে পোড়চে ঢোলে ধুলার মাজে ॥

দেখতে জে জাবি পাগোল
সেহিতো হবি পাগোল
বুজবি শেশে।
ছেড়ে তারো ঘর দুয়ারো ফিরবি নেচে ॥
পাগোলের নামটী কেমন
বলিতে ওধিন [লালন] হয় তরাশে
চতে তিতে ওঙ্গে [অঙ্গে] পাগোল
নাম ধোরেচে ॥

[২।৮৮] ঃ ৪৭ কার ভাবে সাম নদে এলো গে।
ও তার ব্রেজের ভাবের কি অগুয়ার ছিলো ॥
গোলোকেরো ভাব তেজিএ সে ভাব
প্রভু ব্রজপুরে লোএ ছিলো জেহি ভাব
এবে নাহি তো সে ভাব দেখি নতুন ভাব
এভাবো বুজিতে কোটীন হলো ॥
সর্ত্ত জুগে সাঙ্গ কৌসকি ছিলো
এত্রায় সঙ্গে সীতে লক্ষী হলো
এবে দাপরে সঙ্গীনি রাধা রঙ্গীনি কেলির ভাবে
তারা কোথায় রলো ॥
কেলিজুগের ভাব একি অসম্ভাব
নাহি ব্রতো পুজা নাহি অর্ন্ন লাভ
ছিলো ডণ্ডী বেষ কিবোল ডণ্ডো কৌমণ্ডল
নিতাই আবার তাহা ভেঙ্গে দিলো ॥
উহার ভাব জেনে ভাব লেওা হলো দাএ
নাজানি কখোন কি ভাবো উদায়
কল্য তিনোটী নিলে একা নদিয়ায়
লালন বেসে দেশে নাহি পেলো।

[২।৮৯] ঃ ৪৭ হরি কান্দে হরি বোলে কেনে।
ধারা বহে ছনওনে ॥
হরি বলে হার জোরা
নওনে বএ জলধারা

কি ছলে এসেচে গোরা ২
এই নদিয়া ভুবানে ॥
মরা জতো পুরুষ নারি
দেখিতে আইলাম হরি
হরিকে হরিলো হরি ২
জানি সে হরি কোনখানে ॥
গৌউর হরি দেখে [এ] এবার
কতো পুরুষ নারি ছেড়ে জায় ঘর
সেই হরি কি করে এবার
[জানি সেই হরি কি করে এবার]
তাই লালন ভাবে মনে ॥

[২।১২৩] : ৬৫ চাঁদ বলে চাঁদ কান্দে কেনে।
আমা [র] গউর চাঁদ ত্রী জগতের চাঁদ
চান্দে চাঁদ ঘেরা ঐ আভরণে ॥
গোউর চাঁদে সামচাঁদেরি আভা
কটী চন্দ্র জিনি এ সোভা
রূপে মাণব মন করে আকর্সন
খুদা সান্তো সুদা বারি সনে ॥
গোলকেরি চাঁদ গোকুলেরী চাঁদ
নদিয়াএ গৈরংঙ্গ সেহি পুর্ন চাঁদ
আর কি আছে চাঁদ সে আর কেমন চাঁদ
আমার ঐ ভাবনা মনে ২ ॥
লএছি এই গলে গোউর চাঁদের ফাঁদ
আবার শুনি আছে পরম চাঁদ
থাক সে চাঁদের গুন কেন্দে কএ লালন
আমার নাই উপায় চাঁদ গোউর বিনে ॥

[২।১৪৮] : ৮১ গোউর কি আইন আনিলে নদিয়ায়।
এ তো জিবেরো সম্ভাবো নয় ॥
আনকা বিচার আনকা আচার
দেখে শুনে লাগে ভয় ॥

ধর্মাধর্ম বলিতে
কিছু মাত্র নাই তাতে
প্রেমের গুনো গায়
জেতের বোল রেকলে না সে তো
কল্যে এক কারিময় ॥
শুদ্ধ অশুদ্ধ নাই কোন গান
সাদবার খেএ এগবার চাঁন
করেন সদায়
আবার অসার্দ্ধেরে সার্দ্ধ করে
জিবে না জা ছোএ প্রলায়
জবান ছিলো দবির খাস
তারে গোসাই পদ প্রকাস
কল্য গউর রায় আর
লালন বলে মহিন বংসে
জামালকে বৈরার্গ দেয় ॥

গুরু কৃপাহি কেবলম্ :

[১।১৫] : ৮ রেকলে সাই কুব জল কোরে।
আন্দেলা পুকুরে।
হবে শজল বরসা
রেকচি সেই ভরসা
আমার এই ভাগহীন দশা
জাবে কতো দিন পরে।
এবার জদি না পাই চরণ
আবার কি পড়ি ফেরে ॥
নদির জল কুব জল হয়
বিলে বাওড়েতে বয়
সার্দ্ধ কি গঙ্গাতে জায়
গঙ্গা না এলে পরে।
জিবের তম্মী ভজোন ব্রথা
তোমার দয়া নাই জারে ॥

জন্ত্র পড়িএ অত্তো রয় জদি
লক্ষ বতসোর জন্ত্রি বিহনে
জন্ত্র কভু না বেজতে পারে।
তুমি জন্ত্র তুমি জন্ত্রী
তবোল ধরাও মোরে॥
পতিত পাবন নামটী
পৃঃ ৯ সাস্ত্রে শুনেচি খাটী
পতিত না তরাও জদি
কেভে কবে ঐ নাম ধরে।
লালন বলে তরাও গো সাই
এ ভবো কারাগারে॥

[১১১৬] : ৯ জে পতে সাই চলে ফেরে তার খবোর কে করে॥
সে পতে আচে সদায়
বেসম কাল বাগিণীর ভয়
জদি কেউ আজগবি যায়
ওমনি উটে ছোও মারে।
পলক ভরে বিষ ধেএ তার ওটে বেশীর অঙ্গো রে॥
জে জানে উল্ট মন্ত্র
খাটিএ সেহি তন্ত্র
গুরু রূপ করে নজোর
বিষ ধরে সাদন করে
ও তার করোন রিতি সাই দরদি
দরসন দিলে তারে॥
সেই জে অধার ধরা
জা দিকে ও চাতে তারা
চৈতন্ন গুনিন জারা
গুণ সেখে তার দারে।
সামান্ন কি পারবে জেতে
সেইরূপ কাপের ভিতরে॥
ভয় পেয়ে জর্ম্মা বদি

সে পতে না জায় জদি
হবে না সাদন্ সিদ্দি
তাও শুনে মন ঝোরে।
লালন বলে জা করে সাই
থেকতে সে পত ধরে ॥*

[১১৮] : ১১ যাক না। মন একান্তো হোএ।
গুরু গুসাইর রাগ লএ ॥
চাতোকের প্রাণ জদি জাএ
তবু কি অন্য জল খায়
উদ্দ মক থাকে সদায়
নবোঘোন জল চেয়ে।
তম্নী মতো হলে সাদন
সিদ্দী হবে এই দেহে ॥
এক নিরিক দেখ ধনি
সুজ্জ গত কোমলিনি
দিনে বিকশীত
তম্নী নিসিতে মদিত
তম্নী জেন ভক্তের লক্ষণ
একরূপে বান্দে হিএ ॥
বহু বেদ পড়া সোনা
সন্নিতে পাএরে মনা
সদাসিব জোগী সে না
কিঞ্চীত ধ্যান করিএ
ওসে সসানে মসানে ফেরে
কিঞ্চীতের লাগীএ ॥
গুরু ছেড়ে গোউর ভজে
তাতে নরকে মজে
দেখ না মন পুতিপাতি
সর্ত্ত কি মিথে কহে।

*এই গানটির সঙ্গে ২নং খাতার ১৩৭ নং গানের সাদৃশ্য থাকায় সেটি বর্জিত হলো।

মন তোরে বোজাবো কতো
নালন কয় দিন জাএ বএে ॥

[১।৫৭] : ৩১ সোনার মানুষ ঝলক দেয় দিদলে
জমন মেঘে বিদুত খেলে ॥

দল নিরাপন হবে জদি
জানা জাএ সে রূপ নিধি
মানসের করণ হবে শিদ্ধী
সে রূপ দেখিলে ॥

গুরু কিবৃপা তন্ন জারা
নওন তাদের দিপ্ত কারা
রূপ আশ্রীত হএে তারা
জাএ ভবপারে চলে ॥

সরূপ রূপে রূপের কিরণ
সর্গ মর্ত পাতাল ভুবন
ছেরাজ সাই কয় আবোদ নালন
এগবার দেখ নওন খুলে ॥

[১।৬২] : ৩৪ জেন গে জা গুরুর দারে জ্ঞান উপাসনা।
কোন মানুসের কেমন ক্বিতি জাবেরে জানা ॥

[জার আসায় জগতো বেহাল
তার কি আছে সকাল বৈকাল
তিলক মাত্র না দিলে জল
বের্ম্মাণ্ডো রএ না ॥]

পুরুস পরষমণি
কালা কাল তার কিশে জানি
জল দিএ সব চাতোকিনি
করে সান্তোনা ॥*

বেদ বিদির গোচর সদায়
কিষ্ট পদ নিতি উদায়

*'লালন গীতিকা' গ্রন্থে এই স্তবকটি পূর্ববর্তী স্তবকের পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

লালন বলে মনের দিদায়
দেখে দেখো না ॥

[১৬৪] : ৩৫ না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে।
কথায় জদি ফলে কিরসী বিজ কেনে রোপে ॥
গুড় বল্য কি মুক মিঠা হয়
দিব না জেল্যে আন্দার কি জায়
তমী জেনো হোরি বলায়
তরি কি পাবে ॥
রাজার পৌরাষ করে
জমির কর বাচে না যে রে
সাই কি তোর এ করারি কাজ রে
পৌরাসে ছাড়বে ॥
গুরু ধরো খোদকে চেনো
সাইর আইন আমলে আনো
লালন বলে তবে মনো
সাই তোরে নিবে ॥

[১৬৯] : ৩৭ জে জোন দেখেচে অটাল রূপেরো বিহার।
মুর্খে বলুক বা না বলুক
সে থেকলে ঐ নেহার ॥
নওনে রূপ না দেখতে পাএ
নাম মন্ত্র জপিলে কি হএ
নামের তুল্য নাম পাওা জায়
রূপের তুল্য কার ॥
নেহারাএ গোলমালো হোলে
পরবি মন কুজনার ভোলে,
আখের গুরু বলে ধোরবি কারে,
তরংঙ্গ মাজার ॥
সেরূপো রূপেরো ভেলা,
ত্তির জগতে কোরচে খেলা,

ওখিন লালন বলে মনরে ভোলা
কোলের ঘোর তোমার ॥

[১।৯৮] : ৫৪ গুরু বস্তু চিনলে না।
অপারের কাণ্ডারি গুরু
তা বিনে কুল কেউ পাবে না ॥
কি কার্জ্জ করিবো বোলে
এ ভবে আনীএ ছিলে
কি ছার মায়ায় রোলি ভুলে
সে কথা মনে পলো না ॥
হেলায় ২ দিন গেলো
মহাকালে ঘিরে এলো
আর কখন কি বলো
রং মহলে পলে হানা ॥
ঘরে এখন বহিচে পবোন
হতে পারে কিছু সাদোন
ছেরাজ সাই কয় শুন [অ] বদ লালন
এবার গেলে আর হবে না ॥

[১।১০৩] : ৫৬ মলে গুরু প্রাপ্তো হবে সে তো কথার কথা।
জিবন থাকিতে জায়ে না দেখিলাম হেথা ॥
সে বা মূল কবন তারি,
না পাএ কার সেবা করি,
আন্দাজি হাতড়িএ ফিরি
কথায় লতাপাতা ॥
সাধন জোরে এ ভবে জার
সে রূপ চক্ষে হবে নেহার,
তাইরি বটে সেরূপ আকার
মেলে জথা তথা ॥
ভজে পাই কি পেয়ে ভজি,
কি ভজনে হয় সে রাজি

ছেয়াজ সাই কয় কি আন্দাজি
নালন মুড়ায় মাথা ॥

[১।১০৮] : ৫৯ অসার ভেবে সার দিন গেল আমার
সার বস্তু ধোন এবার হলাম রে হারা
হাওা বন্দো হোলে সব জাবে বিফলে
দেখে শুনে নালোষ গেলো না মারা ॥
গুরু জারে সদায় হয় এ সংসারে
লোভে সংঙ্গ দিএে সেই জাবে সেরে
অঘাটায় আজ মরণ আমারে
জেল্যাম নারে গুরুর করন কি ধার ॥
মহতে কয় পূর্ব্বে থেকলে শুক্রিতি
দেখতে শুস্তে গুরুর পদে হয় রতি
সে পুণ্য মর থাকিতো জদি
তবে কি রে হইতাম এমন পাসরা ॥
সমায়এ ছাড়িএ জানিলাম এখন
গুরুর ক্রিপা নইলে ব্রেথা সে জিবন
বিনয় করে কয় ওধিন নালন
মন রে আর কি আমি এবার
পাবো কেনারা ॥

[১।১২৫] : ৬৭ আমারে কি রেকবেন গুরু চরণদাসি ।
ইতোর পানা কার্জ্জ আমার অহরনিসি ॥
জঠরো জন্ত্রনা পেয়ে
এলাম জে করার দিএ
রৈলাম তা সবো ভুলিএ
ভবে আসি ॥
চিনলাম না সে গুরু কি ধোন
জেনলম না তার সেবা সাদন
ঘুরতে বুজি হোলো রে মন
৮৪ আশী ॥

গুরু দ্বারে থাকে সদায়
সমন বলে তার কিশের ভয়
লালন বলে মন তুই আমার
কোল্লী দুশী ॥

[২।১১] : ৭ মনের হলো মতি মন্দো।
তাইতে রৈলাম আমি জর্ম্ম অন্দো ॥
ভবোরোঙ্গে থাকি মজে
ভ[া]ব দাড়ায় না রিদয় মাঝে
গুরুর দয়া হবে কিশে
দেখে ভক্তি বিহিন পশুর ছন্দো ॥
তেজিএ রে শুধা রতোন
গরল খেএ ঘটায় মরোন
মানিলে সাদ গুরুর বচোন
তাইতে মন হারাএ সেষ হইরে ধন্দো ॥
বাল্ল্য ব্রেদো সকলি কয়
সাদু টীক্র আনন্দোময়
লালন বলে আমার সদায়
জাএনা মনের নিরানন্দো ॥

[২।৪৩] : ২৩ আগে জান না ও মু[হু] রায় বাজি হারিলে তখন
লর্জ্জাএ মরোন।
শেষে আর মিছে কান্দীলে কি হয় ॥
খেলো মন খেলারু ভাবিএ শ্রীগুরু
সামাল সামাল বাজি সামাল সর্ব্বদায় ॥
এ দেশেতে জুওচুরি খেলা
টোটকা মেরে ফটকায় ফেলে রে
মন ভোলা তাইতে রোলি বারে
খেলিষ খুব হুসারে
নওনে ২ বান্দীএ সদায় ॥
চোরের সংঙ্গে নাহি খাটে ধর্ম্ম ছাড়া
হাতের অস্ত্র কোভু কোরিষ নে হাত ছাড়া

রাগ অস্ত্র ধোরে দুষ্টু দমন কোরে
সদেশেতে গোমন করোরে ত্বরায় ॥

[পৃঃ ২৪] চোআনি বান্দিয়ে খেলে জেই জোনা
কাহারো জে সার্দ্ধ সেই অঙ্গে দেয় হানা
ফকির নালন বলে আমি তিন তোরো না জানি
বাজি মেরে জাওা ভার হোলো আমায় ॥

[২।৬৮] : ৩৭ কোথা আছে রে সেই দিন দোরোদি সাই।
চেতোন গুরুর সঙ্গ লোএ খবোর করো ভাই ॥
চক্ষু আন্দার দেলের ধোকয়
কেশেড় আড়ে পাহাড় লোকাএ
কি রঙ্গ সাই দেখচে সদায়
বশে নিগুম ঠাই ॥
জেন্তে জদি না দেখিবে
আর কোথা কি রূপে পাবে
মলে গুরু প্রাপ্তো হবে
কিশে বুজি তাই ॥
এথানে না দেখলাম জারে
চিনবো তারে কেমন কোরে
ভার্গগতি আথের তারে
দেখতে জদি পাই ॥
ঠাউরে ভজন সাদন করো
নিকটে ধন পেতে পারো
নালন কয় নিজ মকাম ধোড়ে
বহু দুরে নাই ॥

[২।২৬] : ৫১ কোন কুলে জাবি মন্‌রায়।
গুরু কুলো চাএ জদি কেও
গোকোকুল তার ছেড়তে হয় ॥
দুকুলো ঠিক রয় না গাঙ্গে
এক কুলো রএ আর কুল ভাঙ্গে

ওন্নী জেন সাদু সংঙ্গে
বেদবিদির কুল ছুরে জাএ ॥
রোজা পুজা জেতের আচার
মন জদি হয় করো এবার
বেক্তাতিওর কাজ বেদান্তর
মায়াবাদির কার্জ্জ নয় ॥
ভেবে বুজে একুল ধরো
দোটানায় কেন ঘুরে মরো
ছেরাজ সাই কএ লালন তোরো
কু ফুরাবে কোন সমএ ॥

[২।১১৯] : ৬৩ জে পরোস পরসে সে পরোসো চিনে লে না।
সামান্য পরসেরো গুন লোহার কাছে গেলো জানা।
পরশমণি স্বরূপ গোসাই
জে পরসের তুলনা নাই
পরশীরে জে জোন তাই
ঘুচিবে জঠর জন্ত্রনা ॥
কুমিরেতে পরকে জমন
ধরায় সে আপন ধরোন
স্বপরোষে জানিরে মন
ওন্নী মতো পরসনা ॥
ব্রেজের ঐ জলদ কালো
জে পরোসে গৌউর হোলো
লালন বলে মন রে চল
জানিতে সেই উপসনা ॥

[২।১৬৩] : ৯০ গুরু স্বভাব দেও আমার মনে।
তোমায় জেন ভুলি নে ॥
গুরু তুমি নিদয় জার প্রতি
ও তার সদায় ঘটে কুমতি ॥
তুমি মন রথের সারতি
জথা লও জাই সেকানে ॥

গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রি
গুরু তুমি মন্ত্রের মান্ত্রি
গুরু তুমি জন্ত্রের জন্ত্রি
না বাজাও বেজবে কেনে ॥
আমার জর্ম্ম অন্ধো মন নওন
গুরু তুমি রঙ্গো সচেতন
চরন দেখবো আসায় কএ লালন
জ্ঞান অঞ্জন দেও নএনে ॥

[২।১৬৪] : ৯০ গুরু পদে নিষ্ঠা মন জার হবে।
জাবে তারো সবস্থ সার
অমুল্য ধোন হাতে সেহি পাবে ॥
গুরু জারে হয় কাণ্ডারি
চালায় সে অচল তরি
তুফান বলে ভয় কি তাকে
নেচে গেএ ভব পারে জাবে ॥
আগমে নিগমে এই কয়
গুরু রূপে দিন দয়াময়
অসমায় সকা সে হয়
ওধিন হবে জে তারে ভজিবে ॥
গুরুকে মুনিস্য গ্যন জার
অধপতে গতি হয় তার
লালন বলে তাই আজ আমার
ঘোটলো বুজি মনের কুসভাবে ॥

•

[২।১৬৫] : ৯১ গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার
লেও গো শুপতে।
তোমার দয়া বিনে তোমায়
সেদবো কি মতে ॥
তুমি জারে হওগো সদায়
সে তোমারে সাদনে পায়

বিবাদি তার স্ববসে রএ
তোমার ক্রিপাতে ॥
জন্তোরেতে জন্ত্রী জমন
জেমত বাজায় বাজে তমন
তম্নী জন্ত্রো আমার মন
বোল তোমার হাতে ॥
জগাই মাদাই দর্শ ছিলো
তারে গুরুর কৃপা হলো
ওধিন নালন দোহই দিলো
সেহি আসা চেক্ত [আমাতে] ॥

মুর্শিদা ঃ

[১:২৯] ঃ ১৭ সাই দর্বেশ জারা
আপনারে ফানা করে আধারে মিসায় তারা ॥
মন জদি আজ হওরে ফকির
নেও জেনে সে ফানার ফিকির
ফানার ফিকির না জানিলে
ভষ মাখা হয় মষকরা ॥
কুব জলে সে গঙ্গার জল
পড়িলে সে হয় রে মিশাল
উভায় এক ধারা।
তম্নী জেনো ফানার করন
রূপে রূপ মিলন করা ॥
মরশীদ রূপ আর আলেক নুরি
একমন কেমনে করি
দুই রূপ নিহারা।
নালন বলে রূপ সাধনে
হসনে জেন ঠিক হারা ॥
[১:৩২] ঃ ১৮ ফকিরি করবি খেপা কোন রাগে,
হিন্দু মছলমান দুজন দুই ভাগে ॥

আছে তেত্তের আলায় মাবিনগোল
হিন্দুদিগের সর্গে মন
অলকি অটল মকাম সেহি
নেহাজ করে জান আগে ॥
সাএ ফকিরি সাদন কোরে
খোলাসা রয় হুজুরে
তেত্তের গুরু কাটোক সোমান
সয়ার ভালো তাই জানে ॥
আখের অটাল প্রপ্তো কিসে হয়
মরসিদের ঠাই জানা জায
ছেরাজ সাই কয় লালন ভেভো
ভুগীধনে ভবের ভোগে ॥

[১।৪০] : ২৩ মরশীদ বলো মন রে পাখি।
ভবে কেউ কারো দুখের নয়রে দুখি ॥
ভুল না রে ভবো ভ্রান্তে কাজে
আখেরে এসব কাণ্ডো মীছে
মনরে এসতে একা জেতে একা
এ ভবো পিরিতের ফল আছে কি।
হাওা বন্দো হলে গুপদ কিছুই নয়
বাড়ির বাহির করেন সভায়,
মন রে কেবা আপন পর কে
তখন দেখে শুনে খেদে ঝুরচে আখি ॥
গোরে রো কেনারে জখন লএ জাএ
কান্দীএ সবে জিবন ছেড়তে চায
গুধিন লালন বলে
কারো গোরে কেউতো জাএ না
থেকতে হয় একাকী ।*

* এই গানটির সঙ্গে ২নং খাতায় ১৬৩নং গানটির সাদৃশ্য থাকায় সেটি বর্জিত হলো।

[১।৬১]: ৩৩ একবার চাঁদ বদনে বল রে সাঁই
বান্দার এক দমের ভরসা নাই।
কি হিন্দু কি মোছলমানের বালা
পড়ের পড়িত চিনে ধরো এই বেলা
পিছে কাল সমন আছে সদায় সর্ব্বক্ষণ
কোন দিন বিপদ ঘটাবে তাই।
আমার বিশয় আমার বাড়িঘর
সদায় এই রবে দিন গেলো যে আমার
বিশয় বিস খাবা সে ধোন হারাবা
সেশে কেন্দলে কি আর সোনবে ভাই।
নিকটে থাকিতে রে সে ধোন
বিসয় চক্করাতে খুজলিনে এখন
ওখন লালন কয় যে ধোন কোথা রও
আখের খালি হাতে সবাই জাই।

[১।৭১]: ৩৯ দিনের ভাব জে দিন উদায় হবে,
সেই দিনে মন ঘোর অন্ধোকার ঘুচে জাবে।
মণিহারা ফণীর মতোন
তেমতি ভাব-রাগের করণ
অরুন বসন ধারন
বিভুতি ভুষণ লবে।
ভাবনার বিদয়ের মাঝার
মুখে পড়ো কালাম আল্যার
তাইতে কি মন হবি তারন
ভেবেচো এবার।
অংগে ধারণ কম্মো বেহাল
দিলে জালো প্রেমের মশাল
হৃদকমল হইবে উজ্জাল
লালসাই কত দেখতে পাবে।

হাদিচে লেখেছে প্রমাণ
আপনারা আপনি গে জান
কি রূপে শে কোথা থেকে কোহিছে জোবান
না কল্যে মন সেসব দিশে ॥
তোরিকের মুঞ্জীলে বসে
তিনেতে তিন আছে মিশে
ভাবোক হইলে জেন্তে পারে ॥
একের জুতে তিনটী লর্ক্ষণ
তিনের ঘরে আছেরে ধোন,
তিনের মর্ম সাদিলে হয়
সেরূপ দরোসোন ॥
সাই ছেরাজের হর্কের চরণ
ভেবে কহে ফকির নালোন
কথায় কি তার হয় আচরণ
খাঁটী হও মন দিনের ভাবে ॥

[১।৭২] : ৪০ মরশীদ বিনে কি ধোন আর আছে রে মন
এ জর্গতে।

জে নাম স্মরণে হারে
তাপিত অংঙ্গ সিতোল করে
ভবো বন্দোন ছুটে জাএ রে
জপ ঐ নাম দিব রেতে।
মুর্সিদের চরণে শুধা
পান করিলে জাবে খুদা
কোরো নারে ভেলে দ্বিধা
জেহি মুরশীদ সেহি খোদা
বোজো ওলিএল মরশীদা
আএত লেখা কোরানেতে ॥
আপ্নী খোদা আপ্নী নবি
আপ্নি সেই আদম ছপী

অনাত্তো রূপ করে ধারোন
কে বোজে তার নিরাকারন
নিরাকার হাকিম নির্জ্জন
　　মরশীদ রূপ ভজন-পথে ॥
কুল্লে সাই মহিত আরো
আলাকুল্লে সাই কাদির পড়ো
কালাম নেহাজ করো
তবে সব জানিতে পারো
কেনে লালন ফাকে ফেরো
　　ফকিরি নাম পড়াও মিথ্যে ।*

[১।৮৭] : ৪৮ মুরশীদ মনি গোভিরে ।
৪ রশে বো মুল
　　সেহি রব রশীকে জেন্তে পারে ॥
৪ পতের ৪ল এক জানি
থাকি আতোষ পবোন পানি
ইহার মরশীদে বলে কারে মানি
　　দেখ দেখি হিসাব কোরে ॥
সরিওত তরিকোত আর জে
হকিকত মারফত লেকচে
এ চার পতো আছে
　　জানে দরবেষ ফকিরে ॥
১৪ পোওা দেহের বলন
কোরতে জদি পারো লালন
তবে স্বদেশের চলন
　　জানবি সেই ওনুসারে ॥

[১।৭৯] : ৪৪ সাই কে বোজে তোমা অপার লিলে ।
তুমি অপ্নী আল্লা ডাকো আল্লা বলে ॥

---

* এই গানটির সঙ্গে ২নং খাতার ১৬৭ নং গানের সাদৃশ্য থাকায় সেটি বর্জিত হলো।

নবে কায়ে তুমি-ছবি
ছিলে, তিন অবতারি,
তুমি নিজরের মূল
আগমে থাকুন
এলে আদমের ধড়ে জান হইলে ॥
নি আকার নিগম খোনি
সেও তো মস্ত সবাই জানি,
তুমি সকায় সের্জন কল্যে
ত্রী ভুবন আবার সাকারে কোরে
ভকায় ভাব দেখালে ॥
আগু ভর্তে কাজিল জারা
নিগুড় নিলে দেখচে তারা,
তুমি নিজে নিরাঞ্জন
অকৈথপের খোন,
লালন খুজে বেড়ায় খোন জোঙ্গলে ॥

[২।১] : ১ এলাহি আলামিন আল্যা বাদসা আলোম পানা তুমি ।
ডোবাএ ভাসাইতে পারো
ভাসাএ কেনায় দাও কারো
জা করো সে ইহাও তোমারো
তাইতে তোমাএ ডাকি আমি ॥
নুহ না [মে] সে এক নবিরে
ভাশালে বেসোম পাথারে
আবার তারে মেহের করে
আপ্নী লাগালেন কেনারে
জাহের আছে ত্রী সংসারে
আমাএ দয়া করো গানি ॥
নেজাম নামে বাটপার সে তো
পাপেতে ডুবিএ রোইতো
তাঁর মনে, সুমতি দিয়ে

কুমতি তার গেলো চলে
আওলে নাম খাতায় লেখিলে
জানা গেলো এর হমি ॥
নবি না মানিলো.জারা
মস্তাহেক কাফের তারা,
সেই মস্তাহেক দাএমাল হবে,
বিনা হিসাবে দোজোকে জাবে,
আবার তারে খালাষ দিবে
জানা গেলো এর হমি ॥
[জানা] লালন কএ মোরে
কি হয় জানি ॥

[২।২৯] : ১৬ সাইর নিলে দেখে লাগে চোমেতকার।
ছুরাতে করিলো ছিষ্টী আকার কিশে নিরাকার ॥
আদমেরে পএদা করে খোদ ছুরাতে পরওার।
ছুরাত বিনে ছুরাত কিশে হইল শে হটাতকার ॥
ছুরের মানে হয় কোরাণে কি বস্তু সে ছুর তাহার।
নিরাকারে কেমন করে ছুর চুয়াএ হয় সংসার ॥
আহামদি রুপে হাদি দুনিআএ দিএচে বার
লালন বলে মনে দেলে সেও তো বিশম খোর
আমার ॥

[২।৩২] ; ১৮ একদিন পারের কতা ভাবলি না রে।
পার হবো হিরেধ সাকো কেমন কোরে।
এক রোমের ভরসা নাই
কখন কি কোরবে রে সাই
তখন কার দিবি দোহাই
কারাগারে ॥
বিনে কোড়ির পারার কেনা
ক্ষুধে সাইর নাম জপো না

তাতে কি আলোর পানা
দেখি তোরে ॥
ভাশাও ওনুরাগ তোরি
বসাও মুরশীদ কাণ্ডারি
লালন কএ সেই শে পাড়ি
জাবে সে রে ॥

[২।৩৩] : ১৮ কোন ভুকে স্নাই করেন খেলা এই ভবে।
দেখো শে অপ্নী বাজায় আপ্নী মজে সেইরবে ॥
নামটী না সরি কালা,
সবের শোরিক সেই একেলা
আপ্নী তরং আপ্নী ভেলা
আপ্নী খাবি ডুবে ॥
ত্রী জগতে জে রায় রাজা
তার দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা
হায় কি মজায় আজব রোঙ্গা
দেখাএ ধনি কোন ভাবে ॥
আপ্নে চোয়া আপন বাড়ি
আপ্নী সে লয় আপোন বেড়ি
লালন বলে এ নাচাড়ি
কৈ নে থাকি চুপচাপে ॥

[২।৪৮] : ২৬ কে বুজিতে পারে আমার সাইর কুদরতি।
অথাতো জলেরো মাঝে জোলচে বাতি ॥
আনলে জল উর্ধ হএ না
জলেতে আনল নেভে না
এম্নী শে কুদরত কারখানা
দিবো বাতি ॥
বিনে কাষ্টে আনল জলে
জল রএচে বিনে স্থলে

আখের হবে জল আনলে
প্রলয় অতি ॥
জলে জেদিন ছেড়বে হুংকার
ডুবে জাবে আগুনের ঘর
লালন বলে সেই দিন বন্দোর
হয় কি গতি ॥

[২।৬০] : ৩৩ মেরে সাইর আজব নীলে খেলা
তা কেউ বুজতে পারে।
আপ্নী রাজা আপনি প্রজা ভবের পরে ॥
আহাদ রূপ লুকায় হাদি
আহমদি রূপ ধরে
এ মর্ম না জেনে বান্দা পড়বি ফেরে ॥
বাজিগর পুথলো নাচায়
কথা কহায় আপ্নী তারে।
জিব দেহে সাই চালায়
ফেরায় সেই প্রকারে ॥
আপ্নারে চিনবে জে জন
পশবে শে জন ভেদের ঘরে।
ছেরাজ সাই কয় লালন
কি আর বেড়াও ধুড়ে ॥

[২।৬৬] : ৩৬ মরশিদ জানায় জারে মর্ম সেই জানিতে পায় ॥
জেনে শুনে রাখে মনে সে কি কারু কয়।
নিরাকার রএ অচিন দেশে
আকার ছাড়া চলে না সে
নিরান্তো সাই অন্তো জার নাই
জা ভাবে তাই হয় ॥
মূলী লোকের মলী গীরি
আমি কি তাই জেন্তে পারি

আকার নাই তার বয়জোকো কার
বলে সর্বদায় ॥
ডুবেতে ফুল আলম পয়দা
আবার কও পানির কথা
হয় কি পানি বস্তু আদি
লালন ভাবে তাই ॥

[২।৭৪] : ৪০ ভজো মুরশীদের কদম এই বেলা ।
ওগো আর পেয়ালায় রিদ কমলা
ক্রেমে হবে উজ্জালা ॥
নবিজির খান্দানেতে
পেয়ালা চারি মতে
জেনে লও দিন থাকিতে
ওরে আমার মন ভোলা ॥
কোথা আবহায়াত নদি
ধারা বএ নিরবধি
ধরো সেই ধারা
জদি দেখপী অটলের খেলা ॥
এ পারে কে আনিল
ও পার কে নেবে বলো
লালন কয় তারে ভোলো
কেনে যে কোরে হেলা ॥

[২।৮৩] : ৪৪ কে বোঝে শাইর নিলে খেলা ॥
ও সে আপ্নী হয় গুরু আপ্নী চেলা ॥
মক্কো তালার উপরে সে
নি রূপে রএ অচিন দেশে
একাত্ম রূপ নিলে বাশে
চেনা জাএ না দেখে বেহের খোলা ॥
আহের অবাএ সবে ছিটা
কহিল সে গবমীটা

তবে কেনে আকার মাত্রী
বলি না জেনে সে ভেদ নিরালা ॥
জদি কার হয় চক্ষুদান
সেই দেখে সে রূপ বর্ত্তমান
লালন বলে তাহার গ্যান ধ্যান
হরে দেখিএ সবো পুথি পালা ॥

[২।৯৩] : ৪১ মুরসীদের ঠাই লেনা যে সে ভেদ বুঝে ।
এ দুনিয়া ছিনাএ ছিনাএ
কি ভেদ নবি বিলিএছে ॥
ছিনায় ভেদ ছিনায় ছিনায়
ছপিনারো ভেদ ছপিনায়
জে ভাগে জার মন হলো তাই
সেই ভাগে সে ছাড়িএচে ॥
কুত্‌কী কু-সভাবি
তারে ভেদ বলি নাই নবি
ভেদের ঘরে দিএ চাবী
সবার কথা জানিএচে ॥
লেকতোন বান্দারাজ জতো
ভেদ শুনে আওলিয়া হতো
নাদানেরো শুল চাচিতো
মহম্মদ তার সাবুদ আচে ॥
তপছির হোচিন জার নাম
তাই খুজে মচনবি কালাম
ভেদই সারা লিখ তামাম
লালন বলি নাই নিজে ॥

[২।১১২] : ৪১ সাই আমার কখন খ্যেলে কোন খেলা ।
জিবের কি সার্দ্ধ আছে তাই বলা ॥
কখনো ধরে আকার
কখনো হয় নিরাকার

কেউ বলে সাকার ২
অপার ভেবে হই খোলা ॥
সব তার সব তরি
সে তো সভাবে তারি
দেখো জগতো ভরি
এক চাঁদে হয় উজ্জ্বালা ॥
ভাণ্ডো বেভাণ্ডো মাঝে
সাই বিনে কি খেল আছে
লালন কএ নাম ধরেছে
কৃষ্ট করিম কালা ॥

[২।১১৫] ঃ ৬১ জা জা ফানার ফিকির জেন গে জা রে।
জদি দেখা বাঞ্চা হয় সে চাঁদেরে ॥
না জানিলে ফানার ফিকিরি
তার আর কিসের ফিকির কিসের ফকিরি
নিজে হও ফানা ভাবো ববাবানা
দেখে জাক সমন ফিরে ॥
ফানার ফিকির মুরশীদের ঠাই
তাইতে মুরশীদ ভজন সাএন তেজলেন সাই
ছেরাজ সাইর কৃপায় ওধির লালন কএ
জাজন কষ্ট সায় ঘরে ॥ *
নিজরূপ মুরসিদের রূপ
মাঝার আগে ফানার বিদি
মন রে আমার পীছে মুরশীদ রূপ
[মন রে] সে সরূপ মিশাও
সাইর অটল সুরে ॥

[২।১২২] ঃ ৬৫ জে জানে ফানার ফিকির সেই ফকির।
ফকির হয় কি কল্য নাম জিকির ॥

---

*'রবীন্দ্র ভবন'—শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র-ভাণ্ডার' উল্লিখিতরূপে স্তবকগুলি সাজানো আছে। কিন্তু সাধারণ রীতি অনুসারে এই স্তবকটি সর্বত্র পদটির শেষে যাবে।

আছে কয় মত্তো ফানার করণ
জেন্তে হয় তার বিবারন
ফানা ফেল্যা ফানা ফেরসেক
ফানা ফের রছুল আখির ॥
ফানা হয় মুরশীদের পদে শে
মওলা রে পাএ অনাসে
তাই জেনে শুনে মুড়িএ মাতা
ফকিরি পত্ত কর সাকির ॥
আথের অকারন হবি
ফানা প্রাপ্তো ফানা হলে না
ছেরাজ শাই কয় লালন তোমার
ফকি্রি নয় ফান ফিকির ॥

[২।১৩৯] : ৭৪ জেথানে সাইর বারামথানা।
সলিলে প্রাণ চুমকে ওটে
দেখে জন ভুজংননা ॥
জা ছুইলে প্রানে মরি
এ জগতে তাইতে তোরি
বুঁজেত্তো বুজিতে নারি
কি করি তার নাই ঠেকানা ॥
আপ্তত্ত্ব জে জেনেছে
দির্ব্ব জ্যানি সেই হোএছে
কুব্রেক্ষে শুফল পেএছে
আমার মনের ঘোর গেলো না ॥
জে ধোনের উতপপত্তি প্রানধন
সে ধোনের হল না জতন
অকর্মের ফল পাকাএ লালন
দেখে শুনে জ্ঞানহলো না ॥

মারফতি

[১।১৪] ঃ ৮ জদি সরায় কাজ শৌদ্দী হয়।

তবে মারফতে কেনে মরতে জাই॥

সরিওত আর মারফত জমন

দগেতে মিসাল মাখন

মাখন তুল্যে দুগ্দ তখন

ঘোল বলে তাতো জানে সবায়॥

মারফত মলবস্ত বানি

সরিও তার সরপথ জানি

ঘুচাইলে সরপথ খানি

বস্তুসয় কি সরপথ ধরে রয়॥

আক্কেল আওল দারিয়া

দেখো না মন তাতে ডুবিয়া

মুরশীদ ভজোন জে লাগিয়া

লালন বলে তাতে ভুল সবায়॥

[২।৪৯] ঃ ২১ পোড়গে নামাজ জেনে শুনে।

নিয়াত বেন্দগে মানুষ মার্ক্কা পানে॥

মানুসে মানুষ কামনা সিদ্দী করো বর্ত্তমানে

খেলচে খেলা বিনদ কালা

এই মানুশের তোন ভুবানে॥

সতোদল কোমলে কালার অসন শর্ম্ম সিক্কাশোনে

ও শে চোর্দ্দ ভুবান ফিরায় নিসান ঋলোক

দিচ্ছে নওন কোনে।

মুরসিদের মেহেরে মহোর জার খুলেচে

শেই তা জানে

এবার বোলচে লালন ঘর ছেড়ে ধোন

খুঁজিশ কেনে বোনে ২॥

[২।১০০] ঃ ৫৩ আজব রং ফোকিরি সাদা সোহাগীনি সাই।

ও তার চুরি সারি ফকিরি ভেক কে বুজিবে তাই

সর্ব্ব কেশী মুখে দাড়ি
পরনে তার চুরি সাড়ি
কোথা হইতে এলো শাঁড়ি
জেন্তে উচিত্ত চাই ॥
ফিকিরি গোরোর মাজার
দেখো হে কোরিএ বিচার
ওসে সাদা সোহাগী সবার
আদ ঘর সন্তে পাই ॥
সাদা সোহাগীরী [র] ভাবে
প্রকিতি হইতে হবে
সাই লালন কয় মন পাবি তবে
ভাব গুমুত্রে থাই ॥

[২।১০৩]: ৫৪ ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরি।
দিন তোর হেলায় হলো আখিরি ॥
ফেরেবি ফকিরি ছাড়া
দরগা নিসান ঝান্টাগাড়া
গলে বেন্দে হড়া মড়া
সিন্নি খাওার ফিকিরি ॥
আসলো ফকিরি মতে
বাজ্য আলাপ নাই গো তাতে
চলে শুর্দ্ধ সহজ পথে
অবোদ গোবোদের চটক ভারি ॥
নাম গোওালা কাজি ভক্কন
তোমার দেখি তন্ত্রী লক্ষণ
ছিরাজ শাই কয় অবোদ লালন
সাদুর কাছে জুওচুরি ॥

[২।৭২]: ৩৯ আছে মাএর ওত্তে জগত পীতা ভেবে দেখো না।
হেলা কোরো না ব্যেলা যেরো না ॥
কোয়ালে তার ইসারা দেএ

আলেক জমন লামে লুকায়
তন্নী আকারে সাকার ঝাপা রয়
সামান্য কি জাএ জানা ॥
নিস্কামি নিষ বিপার হোএ
দাড়াও মাএর সরন লয়ে
বর্ত্তমানে দেখ চেএ
সোরূপে রূপ নিসানা ॥
কেমন পিতে কেমন মা শে
চিরো কাল সাগোরে ভাশে
লালন বলে কারো দিশে
ঘরের মাজে ঘরখানা ॥

[২।১০৮] : ৫৭ জেস্তে হয় আদম ছপির আর্দ্দি কথা।
না দেখে আজাজিল সে তো গটল আদম
কি রূপ সেতা ॥
আনিএ জের্দ্দারো মাটি
গঠিল বোরকা পরিপাটী
মিথে নয় শে কথা খাটী
কোন চিজে তার গঠিল আত্তা ॥
সেই জে আদমের ধড়ে
অনাস্তো কুঠরি গড়ে
মাজখানে হেতনে কল জুড়ে
ক্ষিত্তি কর্ম্মা বোষল কোথা ॥
আদমি হলে আদম চেনে
ঠিক নামায় শে দেল কোরানে
লালন কয় ছেরাজ সাইর গুনে
আদম অধার ধরার ভুত ॥

[২।১১৬] : ৬১ ওগো তরিকতে দাখিল না হোলে।
সরিওত হবে না সিদ্দি পড়বি গোলমালে ॥
সবার নামাজের বিচ

আরকান আহাকাম তেরো চিজ
তরিকতের আরকান আহকাম
কয় চিজো বলে ॥
ছালেকি মর্জ্জবি হয়
হকিকতে পরিচয়
মারফত সিদ্ধীর মকাম
দেখ না রে খুলে ॥
আপ্ততত্ত জানে জে
সব খবরের জবর শে
লালন ফকির ফেরে পলো
নিগুর পতভুলে ॥

দয়াল : অপারের কাণ্ডারী

[১।১১২] : ৬১ ভক্তের দারে বান্দা আছে সাই।
হিন্দু কি জোবান বলে জেতের বিচার নাই ॥
শুর্দ্দ ভক্তি মাতোআলা
ভক্তে কবির জেতে জোলা
যে না ধরেচে সে ব্রেজের কালা
তার সরবস্ত তাই ॥
রামদাষ মুচি ভবের মাঝে
ভক্তির বল সদাএ জে
তার সেবায় সর্গে ঘণ্টা বাজে
সনি সাদুর ঠাই ॥
এক চান্দে জগতো আলো
এক বিচে শব জর্ম্ম হোলো
লালন বলে মিছে ফলো
ভবে গুস্তে পাই ॥

[২।২] : ২ খেম অপরাদ ওহো দিননাথ
কেশে ধরে আমাএ লাগাও কেনারে।

তুমি হেলায় জা করে তাই করতে পারো
তোমা বিনে পাপির তারো কে করে ॥
না বুজে পাপ সাগোর ডুবে খাবি খাএ
সেষকালে তোর দিলাম গো দোহাই
এবার আমাএ জদি না তরাও গো সাঁই
তোমার দয়াল নামের দর্শ রবে সংসারে ॥
সোস্তে পাই পরম পীতা গো তুমি
অতি অবোদ বালোক আমি
জদি ভজন ভুলে কুপথে ভ্রেমি
ওরে দেওনা কেনে শুপদ সরন করে ॥
পতিতকে তরাতে পতিত পাবোন নাম
তাইতে তোমায় ডাকি গুনধাম
তুমি আমার বেলায় কেনে হইলে বাম
আমি আর কতো দিন ভেষপো দুখের পাথারে ॥
অথায় অরঙ্গে আতোঙ্গে মরি
কোথা হে অপারের কাণ্ডারি
ওধিন লালন বলে তরাও হে তোরি
নামের মহিমা জানাও ভবো সংসারে॥

[২।৩] : ৩ পার করো দয়াল আমায় কেশে ধরে ।
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগোরে ॥
মন তোর্মী ছয় জোন সদাএ
অবশেষ কুকাণ্ডো বাদায়
ডুবালি ঘাটয় ঘাটায় আজ আমারে ॥
ভবো কুপেতে আমি
ডুবে হোলাম পাতালগামি
অপারের কাণ্ডার তুমি
লেও কেনারে ॥
আমি কার কেবা আমার
বুজে বুজলাম না এবার

অসারকে ভাবিএ সার
পলাম ফেরে ॥
হারিএ সকল উপায়
সেসে তোর দিলাম দোহায়
লালন কয়, দয়াল নাম
সাই জেনবো তোরে ॥

[২।৪] : ৩ এসো হে অপারের কাণ্ডারি।
আমি পড়েছি আদল পাথারে
দেও আমায় চরণ তোরি ॥
প্রাপ্ত পতো ভুলেছে এবার
ভবোরোগে জোলবো কতো আর
তুমি নিজগুনে শ্রীচরণ দেও
তবে দল পেতে পারি ॥
কোথা হইতে আইলাম হেতায়
আবার জানি জাই আমি কোথায়
তুমি মন রথের সারতি হোয়ে
স্বদেসে লও মনেরি ॥

[পৃ ৪] পতিত পাবোন নাম তোমার হে সাই
পাপি তাপি তাইতে দেই দোহায়
ওধিন লালন বলে তোমা বিনে
ভারাসা কারে করি ॥

[২।৫] : ৪ খেম খেম অপরাদ
দাশের পানে এগবার চাও হে দয়াময়।
বড়ো তুফানে পড়িএ এবার
বারে বার ডাকি তোমায় ॥
তোমারি খেমতায় আমি
জা করো তাই পারো তুমি,
রাখো মারো সে নামনামি
তোমারি এ জগতময় ॥

পাপি অধম তারিতে সাই
তোমার পতিত পাবোন নাম সত্তে পাই
সর্ব্বো মিথ্যে জেনবো হে সাই
তরাইতে আজ আমায় ॥
কোণ্ডর পেয়ে মার জারে
আবার দয়া হয় তাহারে
লালন বলে এ সংসারে
আমি কি তোর কেহোই নয় ॥

[২।৬] : ৫ পার করো হে দয়াল চাঁদ আমারে।
খেম হে অপরাদ আমার এ ভবো কারাগারে ॥
পাপি অধম জিব তোমার
না জদি করো হে পার
দয়া প্রকাশ করে।
পতিত পাবোন পতিত নাশা
বোলবে কে আজ তোমারে ॥
না হোলে তোমার ক্রিপা
সাদোন সিদ্ধী কোথা বা
কে কোর্ত্তিতে পারে।
আমি পাপি তাইতে ডাকি
ভক্তি দেও মোর অন্তোরে ॥
জলে স্থলে সব জাগায়
তোমারি সব ক্রিতিময়
ত্রিবির্ধ সংসারে।
না বুজিএ অবোদ লালন
পোলো বিষম ঘোরতরে ॥

[২।৭] : ৫ কোথা রৈলে হে ও দয়াল কাণ্ডারি।
এ ভবো তরংঙ্গে আমাএ দেও হে চরণ তোরি ॥
পাপিকে কোরিতে তারোন
নাম ধরেচো পোত্তিত পাবোন,

সেই ভরোসায় আছি জমন
চাতেক মেঘ নেহারি ॥
জতই করি অপরাধ
ততাপি হে তুমি নাথো
মারিলে মরি নিতান্তো
বাচাও বেচতে পারি ॥
সকোলি কে নিলে পারে
আমায় তো চাইলে না ফিরে
লালন কয় আমি সংসারে
তোর কি এতুই ভারি ॥*

[২।৮] : ৬ এমান শুভার্গ আমার কবে হবে।
দয়াল চাঁদ আশীএ আমায় পার কোরিবে ॥
আমার সাধোনের বল কিছুই নাই
কেমনে সে পারে জাই
কুলে বসে দিচ্চী দোহায়
অপার ভেবে ॥
পতিত পাবোন নামটী তার
তাই সোনে বল হয় আমার
আবার ভাবি এ পাপি আর
সে কি নিবে ॥
গুরু পদে ভক্তিহিন
হোএ রৈলাম চিরো দিন
লালন বলে কি করিতে
এলাম ভবে ॥

[২ । ১৩] : ৮ গোসাই আমার দিন কি জাবে এই হালে।
[আমি পোড়ে] আমি পোড়ে আছি অকুলে ॥
কতো অধম পাপি তাপি
অবোহেলে তারিলে ॥

* ২নং খাতার ১৪ নং গান এই পাঠের অনুরূপ, তাই সেটি বর্জিত হলো।

জগাই মাদাই দুটী ভাই
কান্দা ফেলে মেরে গায়
ভারে জে নিলে।
আমি পাপি ডাকচি সদায়
দয়া হবে কোন কালে ॥
গুহিরে পাবন ছিলো
সেও তো মানুষ হইল
তোমার চরণ ধুলাতে।
আমি তোমার কেও নহি গো
তাই কি মনে ভাবিলে ॥
তোমার নাম লএ জদি মরি
দেখবে তবু তোমারি
আর জাবো কোন কুলে।
তোমা বই আর কেউ নাই আমার
মড় নালন কেন্দে বলে ॥

[২ । ১৬] : ১০ এ দেশেতে এই শুক হোলো
আবার কোথা জাই না জানি।
পেএছি এক ভাঙ্গা নৌকা
জনম গেলো ছেচতে পানি ॥
কার বা আমি কে বা আমার
প্রপ্তো বস্ত ঠিক নাই তার
বৈদিগ মেঘে ঘোর অন্দোকার
উদায় হয় না দিনমনি ॥
আর কি রে এই পাপির ভাগ্য
দয়াল চান্দের দয়া হবে
কতো দিন এই হালে জাবে
বহিএ পাপের তোরোনি ॥
কার দোষ দিবো এ ভুবানে
হিন হোচি ভজোন গুনে

নালন বলে কতো দিনে
পাবো সাইর চরণ দুখানি ॥

[২ । ২২] : ১৩ পারে লোএ জাও আমায়।
অ পার হোএ বশে আছি ওহে দয়াময় ॥
আমি একা রৈলাম ঘাটে
ভানু সে বোশীলো পাটে
তোমা বিনে ঘোর সংকটে
না দেখি উপায় ॥
নাই আমার ভজোন সাদোন
চিরোদিন কুপতে গমোন
নাম শুনেচি পতিত পাবোন
তাইতে দেই দোহাই ॥
অগতির না দিলে গতি
ও নামে রহিবে খেতি
নালন কয় অকুলের পতি
কে বোলবে তোমাএ ॥

[২ । ২৩] : ১৩ কি করি ভেবে মরি মন মাজি ঠাহোর দেখিনে।
বের্ষা আদি থাএচে থাবি সেই নদি
পার জাই কেমনে ॥
মাডুয়া বাদি জমন ধারা
মাজ দরিয়ায় ডবিএ ভরা
দেশে জাএ পরিএ ধড়া
সেই দসা মূল ভাবনা জেনে ॥
সক্তি পদে ভক্তি হারা
কপোট ভাবের ভাবোক তারা
মন আমার তম্নী ধারা
যাকে স্বরি রাত্র দিনে ॥
মাখাল ফলটী রাঙ্গা চোঙ্গা
তাই দেখে মন হোলি খোঙ্গা

নালন কয় ভালো ডোঙ্গা
কোন ঘড়ি ডোবে তুফানে ॥

[২।২৭]: ১৫ চিরোদিনে দুখেরো আনলে প্রাণ
জোলচে আমার।
আমি আর কতো দিন
জানি অবোলারো প্রাণি
এ জলনে জলবে ওহে দয়াময় ॥
দাশী মলে খেতি নয় জাই হে সবে জাই
দয়াল নামের দর্শ রবে হে গোশাই
আমায় দেও দুখো জোদি তোবু তোমাএ সাদি
তোমা বিনে দোহাই আর দিবো কার ॥
ও মেঘ হইএ উদায় নোকালে কোথায়
প্রবশীর প্রাণ গেলো প্রবসাএ
আমার কি দোশেরো ফলে এ দসা ঘটালে
তুমি চাও হে নাথো ফিরে চাহে এগবার ॥
আমি উড়ি হাওার সাত ডুবি তোমার হাত
তুমি না তরালে কে তরায় হে নাথ
আমায় খেম অপোরাদ দেও হে শীতল পদ
নালন বলে প্রাণে সয় না রে আর ॥

[২।১৭০]: ৯৪ জে আমায় পাঠালে এহি ভাব নগরে।
মনের আন্দার হরা চাঁদ
সেই জে দয়াল চাঁদ
আর কতো দিনে দেখবো তারে ॥
কে দিবে রে উপশনা
করি রে আজ কি সাদনা
কাশীতে জাই কি কানলে থাকি
আমি কোথা গেলে পাবো সে চাঁন্দেরে ॥
মন ফুলে পুজিবো কি
নাম ব্রম রশনায় জপি

কিশে দয়া তার হবে পাপির পর
কে বলবে সে সোব্দান [স্তকার] করে।
ভেবে তারে পঞ্চ মতে
ঘুরে বেড়াই পঞ্চ পতে
জে পতো শরল সে পতে গরোল
ওধিন নালন বলে তাইতে পলাম ফেরে।

বৈরাগ্য

[১। ৪১]: ২৩ পাকি কখন জানি উড়ে জাএ।
বদ হাওা লেগে খাচায়॥
খাচার আড়া পলো ঢোসে
পাকি আর দাড়াবে কিশে
ঐ ভাবোনা ভাবচি বোশে
চোমক জরা বইচে গাএ।
ভেবে অস্তো নাহি দেখি
কার বা খাচা কে বা পাকি
আমার এই আঙ্গিনায় থাকি
আমারে মজাতে চায়॥
আগে জদি জেতো জানা
জোঙ্গলা কোভু পোষ মানে না
তবে উহার প্রেম কোরতাম না
নালন ফকির কেন্দে কয়।

[১। ৮০] : ৪৪ : দ্র. [১। ১০৬] : ৫৮-৯. [একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত]। দথলাম[১] এ সংসার ভোজবাজির প্রকার
দেথতে ২ ওম্নী কে বা কোথা জাএ[২]।
মিছে এ ঘর বাড়ি
মিছে দোড়ো দোড়ি করি
কার মায়ায়[৩]।
ক্ষিতি কর্ম্মার ক্ষিতি কে বুজতে পারে

. ১০৬ নং গানের পার্থক্য : ১। দেখলাম। ২। জাই। ৩। মায়া।

সে বা জিবকে লেএঃ কোথা ধোরে
সে কথা আর শুদাবো কারে
ও তার নিগুড় তর্ত অর্থ কে বলবে আমায়[৫] ॥
জে করে এই নিলে
তারে চিনল্যাম না
আমি ২ বলি আমি কোন জোনা
মরি রে কি আজব কারখানা
এবার শুনে পড়ে কিছুই ঠাওর নাহি হয় ॥
ভয় ঘোচে না আমার দিব রজনি[৬]
কার সাতে কোন দেষে জাবো না জানি
ছেরাজ সাই কয় বেসম কার গনি
[এবার] পাগোল হয় রে নালন
জে তাই জেস্তে[৭] চায় ॥

[১ । ৯১] : ৫০ আর কি বোষবো এমন সাদ বাজারে।
জানি কোন সোমাএ কি দষা হয় আমারে ॥
সাদুর বাজার কি আনান্দোময়
জমন আমাবষ্যে পুর্ন চন্দ্র উদায়
ভক্তি নওন জার সে চাঁদ দিষ্ট তার
ভবো বন্দোন জালা জাএ গো দুরে ॥
দেবেরো দুস্তাধো পদে সে
সাদু নাম জার সত্রে ভাশে
পতিত পাবনি গঙ্গা জননি
সাদুর চরণ সেও তো বাঞ্ছা করে ॥
দাশের দাশ ওরে দাব জগ্য নয়
কি ভাগ্যতে এলাম এই সাদ-সবায়
নালন কয় আমার ভক্তিসম্ন কায়
আবার বুজি পড়ি কদাচ্যায় ॥

[২ । ৬৯] : ২১ মন তোর আপোন বোলতে কে আছে।
কার কান্দায় কান্দো মিছে ॥

৪। লয়। ৫। আমাএ। ৬। রোজনি। ৭।

থাক সে ভবের ভাই বেরাদার
প্রাণ পাখি সে নয় আপনার
পরের মায়াএ মজিএ এবার
প্রাপ্তোধোন হারায় পাছে ॥
সারা নিশী দেখ মনুরায়
নানান পর্ক্ক এক ব্রেক্ষে রয়
জাবার বেলায় কে কার কএ
দেহো প্রাণ তোম্নী সে জে ॥
মিছে মায়ায় মদ খেও না
প্রাপ্তো পত ভুলে জেও না
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি কয় জুগের পেচে ।
এস্তে একা আলি রে মন
জেতে একা জাবি তখন
ছেরাজ সাই বলে রে লালন
কার নাচায় নাচো মিছে ॥

[২ । ৩৮] : ২১ ও মন কে তোমারো জাবে সাতে ।
কোথা রবে ভাই বন্দু
সব পড়বি জেদিন কালের হাতে ॥
জে আশারো আশায় আশা
হোলো না তার রতি মাশা
ঘটালিরে কি দুরদশা
কুসংঙ্গে কুরংঙ্গে মেতে ॥
নিকাশের দায় কোরে খাড়া
মারবি আতোসের কোড়া
সোজা কোরবে বেকা তেড়া
জোর জর্ব্বোর খেটবে না তাতে ॥
জারে ধোরে পাবি নিস্তার
তারে সদায় ভাবিলে পর

ছেরাজ শাই কয় নালন তোমার
সারে ভবের কুটুমমিতে ॥

[২ । ৪০] : ২২ মন আমার তুই কল্লী একি ইতোর পানা।
দুগ্দেতে জমন রে তোর মিশলো চোনা ॥
শুর্দ্দরাগে থেকতে থেকতে জদি
হাতে পেতে অটল নিধি
বোলি মন তাই নিরোবোদি
বাগ মানে না ॥
কি বৈদিগে ঘিরলো রিদয়
হোলো না শুরাগের উদায়
নওন থাকিতে সদায়
হোলি কানা ॥
বাপের ধোন তোর খেলো সর্পে
রাগচক্ষু নাই দেখবি কারে
নালন বলে হিসাব কালে
জাবে জানা ॥

[২ । ৪১] : ২২ কাল কাটালি কালের বশে।
এবার জৈবোন কাল কামে চিএ কাল
মন রে কোন কালে আর হবে দিশে ॥
জৈবোন কালের কালের কালে
রোঙ্গে দিলি মন
দিনের দিন হারালি পিত্রী ধোন
গেলো রবির জোর আকি হোলো ঘোর
কোনদিন ঘিরবে এশে মহাকালে এশে ॥
জাদের সংঙ্গে রঙ্গে রলি চিরোকাল
কালা কালে তারাই হবে কাল
মনরে জানো না কার কি গুনপনা
ধনির ধোন গেলো সব রিপুর বশে ॥
বাদি ভেদি বিবাদি সবায়
সাদোন সিদ্দী করিতে না দেয়

নাটের গুরু হয় নালোষ মহাশয়
ডুবি দেওরে নালন লোব লালোশে ॥

[২।১২] : ৮ মনের মনে হোলো না একদিনে।
আমি আছি কোথা জাবো কোথায় কার সেনে ॥
আমার বাড়ি আমারি ঘর
বলা কেবল ঝাকমারি সার
পলোকে সব হবে সংহার
কোনদিনে ॥
পাকা দালান কোটা দিবো
মহা শুকে বাষ করিবো
মনে ভেবলাম না জে কখন জাব
সসানে ॥
কি করিতে কি বা কোরি
পাপে বোজাই হইল তরি
নালন কয় তরঙ্গ ভারি
ছামনে ॥

[২।১৩] : ১১ কারে দিবো দোষ নাহি পরের দোষ
মনের দোশে আমি পলাম রে ফেরে ॥
আমার মন জোদি বুজিতো
লোভের দেষ ছাড়িতো
লএ জেতো আমায় বিরাজা পরে ॥
মনের গুনে কেহো হলো মহাজন
বেপার করে গেলো অমুর্ল্ল রতোন
আমারে ডুবালি অবোদ মন
এবার পারের সম্বল কিছুই
না গেলাম কোরে ॥
অক্রিম কালের কালে কি না জানি হএ
একদিন ভেবলে না অবোদ মনুরায়
ভেবেচো দিন এমনি যুজি জায়

সকোল জানা জাবে জেদিন
সমনে ধরে ॥
কামে চিত্র হতো মন রে আমার
শুধা তেজে গরোল খাএ শে বেশুমার
ছেরাজ সাই কয় নালন রে তোমার
বুজি ভগ্ন দশা ভারি ঘোটল আথেরে ॥

[২।২০] : ১২ তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে।
মিছে মায়াএ মজিএ মন কি করো রে ॥
এতো পিরিত দস্তে জির্ব্বায়
কাএদা পেলে সেও সজা দেয়
সল্লেতে সব জানিতে হয়
ভাব নাগোরে ॥
সমাএ সকলি সকা
অসমাএ কেউ না দেয় দেখা
জার পাপে সে ভোগে একা
চার জুগে রে ॥
আপ্নী জখোন নাএ আপনার
কারে বলো আমার ২
ছেরাজ সাই কএ নালন তোমার
গঞান নাহি রে ॥*

[২।৪২] : ২৩ চিরো কাল জল ছেচে
আমার জল ছাড়ে না এ ভাঙ্গা নায় ॥
এক মালা জল ছেচতে গেলে
তিন মালা জোগায় তেতালায় ॥
ছুতোর বেটার কারসাজিতে
জনম তোরির সাদি মারা নয় ॥
তোরির আশে পাশে কাষ্টো সরল
মেজেল কাট গোড়ে চেতলায় ॥

* এই গানটির সঙ্গে ২নং খাতার ১৩৮ নং গানটির সাদৃশ্য থাকায় সেটি বর্জিত হলো।

আগায় মোর মন সদক্ষণ
বশে ২ চোকোম খেলায়
আবার আষার দশা তলা ফাসা
জল ছেচি আর গুদড়ি গলায় ॥
মহাজোনের অমল্য ধোন
মারা গেলো ডাকনি জোলায় ॥
ফকির নালন বলে মর কপালে
কি হবে নিকাশের বেলায় ॥

[২।৪৬] : ২৫ আমার মনেরে বোঝাই কিশে।
ভবো জাতোনা আমার জ্ঞান চক্ষু আন্দার
ঘিরলো রে জমন রাহুতি এশে।
জমন বোনে আগুন লাগে
সভায় তাহা দেখে
মন আগুন কে দেখে মন কোটা ফেসে ॥
জে আশাতে আমার ভবে আশা হলো
অশারো ভাবিএ জনম ফুরাইলো
পুর্ব্বে জে শুক্রিতি ছিল পেলাম সেহি ফলো
না জানি কি আর হবে রে শেষে ॥
আমি গুনে আনি দেওা হোএ জায় রে কুণ্ড
আমার হোলো তন্ত্রী সকল কর্ম ভুণ্ড
কারে বোলবো এসব কথা কে ঘচাবে বেথা
মন আগুনে মন দগদো হতেছে ॥
এ ভুবানে বিধি বড়ো বলো ধরে
কর্ম্মফাশে বেন্দে মারিল আমারে
কে [৫] ন্দ নাল [ন] ফকির সদায় দিছো গুরুর দোহায়
আর জেনো আশীনে এমন দেশে ॥*

[২।১১৪] : ৬০ বিশয় বিশে চঞ্চলা মন দিব রোজনি।
মন তো বোজালে বোজে না ধর্ম কাহিনী ॥

* এই গানটির সঙ্গে ২নং খাতার ১৬১ নং গানের সাদৃশ্য থাকায় সেটি বর্জিত হলো।

বিসয় ছাড়িএ কবে
মন আমারো সান্তো হবে [হে]
আমি কবে সে চর [ণ] করি বো স্বরণ
জাতে শীতল হবে তাপিত প্রাণি ।
কোনদিন সশান বাশী হবো
কি ধোন সংঙ্গে লয়ে জাবো [হে]
আমি কি করি [কি] কৈ ভুতের বোঝা বই
একদিন ভেবলেম না গুরুর বানি ॥
আনিও দেহেতে বাশা
তাইতে এতো আশা আসা [হে]
ওধিন নালন তাই বলে নির্ত্ত হইলে
আর কতই কি মনে করতে না জানি ॥

[২।১২৮] : ৬৮ এবার কে তোর তোর মালেক চিন্ন্যীনে তারে ।
মন কি এমন জনম আর হবে মন কি
এমন জনম আর হবে রে ॥
দেবের দুলভো এবার
মানস জনম তোমার
এমনো জনমের আচার
কল্ল্যী কি রে ॥
নির্শ্বাসের নাহিরে বিশ্বাষ
পলকেতে কোরবে নৈরাষ
এবার মনে রবে মনে রো আশ
বোলবি কারে ॥
এখন সাশ আছে বজায়
জা করোরে তাই সিদ্ধী হয়
দরবেষ ছেরাজ সাই তাই বারে বার
কয় নালন রে ॥

[২।১৬৯] : ৯৩ ও মন দেখে শুনে ঘোর গেলো না ।
কি করিতে কি করিলাম দুগদেতে মিশীলো চোনা ॥

মদন রাজার ডাঙ্গা ভারি
হলাম তারো আজ্ঞাকারী
জার মাটিতে বষত করি
চিরদিন তারে চিনলাম না ॥
রাগের আশ্রয় নিলে তখন
কি করিতে পারে মদন
আমার হলো কামলুভি মন
মদন রায়ের গাটরি টানা ॥
উপর হাকিম একদিনে
কৃপা করতো নিজ গুনে
দিনের ওধিন নালন ভনে
জেতো [ে] র মনের দোটানা ॥

সবার উপরে মানুষ সত্য

[১।৭] : ৪ ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ নিলেময়।
[জারে আঁকাস] জারে আকাষ পাতাল খুজি
এই দেহে সে রয় ॥
সস্তে পাই চার কারের আগে
সাই আল্ল করে ছিলো রাগে
এবে সে অটল রূপটাকে
মানুষ রূপ নিলে জগতে দেখায় ॥
লামে আলেক মুকায় জমন
মানুসে সাই আছে তমন
তা নৈলে কি সব নুরি স্তোন
আদম তোলে ছেজদা ছালাম করায় ॥
আহাদে আহামদ হোলো
আদমে শে জর্ম নিলো
নালন মহা ঘোরে পোলো
ছেরাজ সাই কয় নিলের অন্তো না পাওায় ॥

[১।২৪] : ১৪ মানুষ ধরো নিহারে রে।
ও তর মন নওনে জোগাজোগ করো ॥

নেহারায় চেহারা বন্দী
করো রে করো একান্তি
সাড়ে চব্বিষ জেলায় খাটাও পান্তী
পালাবে সে কোন সহরে।
তরায় মন দারগা হোএ
করো বাওা বন্দী স্বরূপ মুন্দীরে॥
সরূপে অসন জাহার
পবোন হেলালে বেহার
পক্ষনগুরে দেখো এবার
দিব্ব চক্ষু প্রকাশ করে।
দু পক্ষেতে খেলচে খেলা
নরধারি রূপ ধরে॥
অমাবস্য পুন্নমাশী তাহে মহা জোগ প্রকাশী
ইন্দ্র চাঁদ বাই বরুন আদি
যে জোগের বাঞ্চীত আছে রে।
ছেরাজ সাই বলে রে লালন
মানুষ সাদো প্রমান রে॥

[১।৫৫] : ৩০ দেল দারআয় ডুবিলে সে চরের খবর পাএ॥
নৈলে পুতি পড়ে পণ্ডিতে হইলে কি হয়॥
সঅংরূপ দর্পণে ধরে
মানব রূপ ছিষ্টী করে হে
দিব্ব গ্যানি জারা ভাবে বোজে তারা
মানুষ ভজে কার্জ্জ সিদ্দি করে জায়॥
একেতে হয় তিনটি আমার
অজুনি সহজ সোমস্কার হে
জদি ভাব তরংঙ্গে তরো মানুষ চিনে ধরো
দিনমণি গেলে কি হবে উপায়॥
মল হৈতে হয় জলের সেরজোন
ভাল ধরস্যে পায় মল অন্তসন

ওন্নী রূপ হইতে সরূপ তারে ভেবে বেরূপ
সবোদ নালন সদায় নিরূপ ধরতে চায় ॥

[২।৮১] : ৪৩ এই মানুসে সেই মানুষ আছে।
কতো মনি রিশী চার জুগ ধরে তারে বেড়াচে খুজে ॥
জলে জমন চাঁদ দেখা জাএ
সে চাদ ধরতে হাতে কে পায়
ও শে আলেক মানুষ ওন্নী সদায়
আছে আলেকে বোশে ॥
অচিন দলে বসতি ঘর
দিদল পর্দ্দে বারাম তার
দল নিরাপন হবে জাহার
সেরূপ দেখবে অনাশে ॥
আমার হলো কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরি খুজি ঘরেরো ধোন
দরবেষ ছেরাজ সাই কয় ঘুরবি নালন
আপ্ত তর্ত্ত না বুজে ॥

[১।৮৮] : ৪৯ মানুষ অবিশ্বাষে পাই নে রে সে মানুসোনিধি।
এই মানুষে মিলতো মানুষ চিনিতাম জদি ॥
অধার চান্দের জতোই খেলা
সর্ব্ব উত্তম মানুষ নিলা
না বুজে মন হোলি ভোলা
মানুষ বিরদি
জে অংঙ্গের অবাঅব মানুষ
জানো না রে মন বেহুষ
মানুষ ছাড়া নয় সে মানুষ
অনআদির আদি ॥
দেখে মানুষ চিল্যাম না রে
চিরদিন মায়ারো ঘোরে
নালন বলে এদিন পরে
কি হবে গতি ॥

[১।১০২] : ৫৬ মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছেড়ে খেপা রে তুই মূল হারাবি ॥
দি-দলের মৃনালে
সোনার মানুষ উজ্জলে
মানুষ গুরুর কৃপা হলে
জেন্তে পারি ॥
এই মানুষে মানুষ গাথা
দেখ না জমন আলেক লাতা
জেনে শুনে মূড়াও মাথা
জাতে তরবি ॥
মানুষ ছাড়া মন আমার
পড়বি রে তুই সন্নকায়
লালন বলে মানুষ আকার
ভজলে তোরবি ॥

[১।১১৪] : ৬৩ জে রূপে সাই আছে মানুসে।
রশের রশীক না হলে কি পাবে তার দিশে ॥
বেদি ভাই বেদ পড়ে সদায়
অ[?]সলে গোলমাল বাদায়
রশীক ভেয়ে ডুবে বিদয়
রতন পায় রসে ॥
তালার উপরে তালা
তাহারো ভিতোরে কালা
দেখা দেএ শে দিনের বেলা
রশেতে ভেশে ॥
লামকামে আছে স্থিরি
সেকথা অকেতপ ভারি
লালন কয় সে দারের দারি
আর্দ্দি মাত্রা সে ॥

[২।১৭] : ১০ এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন জ্বা করো তরায় করো এই ভবে।

অনান্তো রূপ ছিষ্টী কল্যান শাই
সনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেবদেবোতা গোন করে আরাধোন॥
জর্ম নিতে মানবে॥
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেএছো এই মানব তোরনি
বেএ জাও তরায় তোরি
শুধারায় জন ভারা না ডোবে॥
এই মানসে হবে মাধর্জ্জ ভজন
তাইতে মানুষ রূপ গটলে নিরাঞ্জন
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার
ওধীন লালন তাই ভাবে।*

[২।১৪৪] : ৭৯ জেন গে মানুষের করোন কিশে হয়।
ভুল না মন বৈদিগ ভোলে রাগের ঘরে বয়॥
ভাটির সোদ জার ক্ষেরে উজন
তাইতে কি হয় মনসের করন
পরসন না হইলে মন
দরসোনে কি হয়॥
টলাটল করোন জাহার
র্পরসগুণ কৈই মেলে তাহার
গুরুশীর্ব জুগজুগন্তর
ফাকে ফাকে রএ॥
লোহা সর্ণ পরষ র্পরষে
মানসের করন ওমনি সে
লালন বলে হলে দিশে
জঠর জালা:জাএ॥

মনের মানুষ

[১।৬৬] : ৩৬ মনের মানুষ খেলচে দ্বিদলে।
জমন সওদামিনি মেঘের কোলে॥

* এই গানটির অনুরূপ হওয়ায় ২ নং খাতার ৩০ নং গানটি এখানে বর্জিত হলো।

ওসে রূপ নিরূপন হবে জখন
মানুষ ধরা জাবে তখোন,
জনম সাপল হবে রূপ দেখিলে ॥
আগে না জেনে সে দল উপাসনা
আন্দাজি কি হয় সাদনা
মিছে ঘুরে মরা গোলেমালে ॥
ওসে মানুষ চিনিলো জারা
পরম মহর্ত্ত তারা
ওধিন নালন কয় দেখে
নওন খুলে ॥

[২।৬১] : ৩৩ আছে যার মনের মানুষ
মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জ্জনে সে বশে ২ দেখচে খেলা ॥
কাছে রএ ডাকে তারে উশ্চশ্বরে
কোন পাগেলা।
ওরে জে জা বোজে তাই শে বুজে
থাকরে ভোলা ॥
জথা যার ব্যেথা নেহাত
সেইখানে হাত ডলামলা।
তমী জেনো মনের মানুষ
মনে তোলা ॥
জে জোনা দেখে সেরূপ
করিএ চুব রয় নিরালা।
ওসে নালন ভেড়ের লোক জানানো হরিবোলা
মুখে হরি হরি বোলা ॥

[২।১৩২] : ৭০ ঐ এক অজান মানুষ ফিরচে দেশে
তারে চিস্তে হয়।
তারে চিস্তে হয় তারে মেস্তে হয় ॥
সরিওতের বেনাজাতে
জানে না তা সরিওতে

জানা জাবে মারফতে
জাদি মনের বিগার জায় ॥
মুল ছাড়া এক অজগবি ফুল
ফুটেছে সে ভাব নদির কুলে
চিরদিন এক রশীক বুলবুল
সে ফুলের মধু খায় ॥
শুনেচি এক মানসের খবর
আলেপের জের মিমের জবর
নালন বাল হোষনে ফাকোর
মরশীদ ধন্য জানা জায় ॥

[২।১৩৩] : ৭১ আছে দিন দুনিয়া অচিন মানুষ এগজনা।
কাজের বেলায় পরষমনি
আর সেমাএ কেও চেনে না ॥
নবি আলি এ দুজোনে
কল মাদাতা দল আর ফিনে
বে কালমায় সে অচিন জনে
পিরের পির হয় জান না ॥
জে দিনে সাই নরে কারে
ভেষলেন একা একেশ্বরে
সেই অচিন মানুষ তারে
দোসোর তদখোনা ॥
কেউ তারে জেনে চে দড়ো
খোদার ছোট নবির বড়ো
নালন বলে নড়চড়ো
সে নৈলে কুল পাবানা ॥

[২।১৫৯] : ৮৭ আমার মনের মানুশের সোনে।
মিলন হবে কতো দিনে ॥
চাতোকে প্র [া] য় অহোরনিশি
চেয়ে আছি কালো শশি

হবো বোলে চরন দাসি
তা হয় না কপাল গুনে ॥
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে জমন
মুকালে না পায় অন্বসন
কালারে হারালেম ওমন
ওরূপ হেরিএ সর্পনে ॥
জখন ঐরূপ সরন হয়
থাকে না লোক লর্জ্জার ভয়
ওধিন লালন বলে সদায়
প্রেম জে করে সেই জানে ॥

রসিক যে জনা :

[১।২০] : ১২. ভজোনের নিগুড় কতা আছে ।
বের্ম্মার বেদ ছাড়া ভেদ বিদান সে জে ॥
চার বেদে দিগ নিরাপন
অষ্টো বেদ বস্তুর কারণ
রশীক হইলে জানে সে জোন
আর ঠাই মিছে ॥
অপরূপ সেই বেদ দেখি
পাঠোক তার অষ্ট সকি
সড় তত্ত্বে অনুরাগি
সে জেনেছে ॥
ভুক্তি রাগ নাস্তী করো
ভক্তি পদ শীরে ধরো
সক্তি সার তন্ত্র পড়ো
ঘোর জায় ঘুচে ॥
সাইর ভজন হেতু সয়
ঐ বেদ করি গন্ন
লালন কয় ধন্ন ২
জে তাই খোজে ॥

[১।৮৯] : ৪৯ সুখের কথা কি [কি] শে চাঁদ ধরা জাএ
রশীক না হলে।
জে চাঁদ দেখলে অমনি
ত্রি জগত ভোলে ॥
সাধু রশের উপাসনা
না জানিলে রশীক হয় না
গজো মত্তি গেরোচোনা
নানা সর্ব জাতে ফলে ॥
মন মহিনির মন হর্য়া
জে রশে পড়েচে ধরা
জেন্তে পারে রশীক জারা
অহি মুণ্ডে উভয়ধির হলে ॥
নিগুড় প্রেম রষ বতির কথা
জেনে মড়াও মনের মাতা
কেনে লালন ঘুরিষ ব্রেথা
উর্দ্ধ সহজ রাগের পত ভুলে ॥

[২।১৪১] : ৭৬ সড়ো রশীক বিনে কে বা তারে চেনে
জারো নাম অধরা।
সাক্ত সাক্রক্তি বুজে সে রূপে সে মজে
বষ্টবেরো বিষ্টুরূপ নেহারা ॥
করে পঞ্চ ভগ্যানি পঞ্চরূপ বাখানি
রোশীক বলে সেও তো নিলেরূপ গনি
বেদ বিদ্বিতে জার নিলের নাই প্রচার
নিগুম সহরে সাইজি সেরা ॥
বলে সপ্তোপান্তীর মতো সপ্তোরূপ ব্যক্ষীত
রশীকেরো মনো নয় তাতে রতো,
রোসিকেরো মনো রসেতে মগনো,
রূপরশো জানিএ খেলেচে তারা ॥
জে জোন ব্রহ্মজ্ঞানি হয় সেও তো কথায় কএ
না দেখে নাম ব্রহ্ম সার কথে হৃদয়,

স্বরূপ রূপ দর্পনে রূপ দেখে নওনে
নালন বলে রসিক দিগু [জারা] ॥

[২।১৪২] : ৭৭ মানসের করোন সে কি রে স্বাধারণ
জানে রশীক জারা ;
টলে জিব বিবাগী অটল
ইশ্বর রাগী সেও রাগ লেখে
বৈদিগ রাগেরো ধারা ॥
জদি ফুলের সন্দী ঘরে,
বিন্দু পড়ে ঝোরে
আর কি রশী [ক] ভেয়ে হাতে পাএ তারে ;
নিরে থিরে মিশায় শে পড়ে দুর্দ্দসাএ
না মিষলে হিন অঙ্গ বিফল পারা ॥
হলে বানে বান খেপনা
বিশের উপর্জনা
অধোপতে গতি উভয় শেষখানা।
পঞ্চবানের ছিলে প্রেম অস্ত্রে কাটীলে
তবে হবে মানশের করোন সারা ॥
ওসে রশীকো সীকরে
জে মানুষ বাষ করে
হেতু সর্ব্ব করন সে মা [ন] সের দ্বারে,
নির হেতু বিশ্বাশে মেলে সে মানুষ
ওধিন নালন ফকির হেতু কামে জাএ মারা ॥

[২।১৫৭] : ৮৬ ধরো রে অধার চাঁন্দেরে
অধরে অধার দি এ।
খিরোদ মিথনের ধারা
ধরো রে রোশীক নাগোরা
জে রশেতে অধার ধরা
দেখ রে স্বচেতোন হয়ে ॥
অরশীকের ভোলে ভুলে
মজিষ নে কুব নদির জলে

কারন বারির মধ্যেস্থলে.
ফুটেচে ফুল অচিন দলে
চাঁদ চকোরা তাহে খেলে
প্রেম বানে প্রকাশিএ ॥
নির্ত্তো ভেবে নিত্তো থেকো
নিলে বাশে জেও নাকো
সে দেশেতে মহাপ্রলয়
মাএতে পুত্র ধরে খায়
ভেবে বুজে দেখ মনুরায়
সে দেশে তোর কাজ কি জেএ ॥
পঞ্চ বানের ছিলে কেটে
প্রেম জাজো স্বরূপের হাটে
ছেরাজ সাই বলে রে লালন
বৈদিগ বানে কোরিষনে রোন
বান হারাএ পোসবি তখন
রোন খোলাতে হুবড়ি খেএ ॥

[০১১৯] : ১২ শুদ্ধ প্রেম রশীক বিনে কে তারে পায় ॥
জার নাম আলেক মানুষ আলেক রএ ॥
রশীক রস অনুসারে
নিগুড় ভেদ জেন্তে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মন খণ্ডো হয় ॥
নিরে নিরাঞ্জন আমার
আদ নিলে করে প্রচার
হলে আপন জর্ম্মের বিচার
সব জানা জায় ॥
আপনার জর্ম্ম লতা
খুজ গে তার মলটী কোথা
লালন কয় হবে সেতা
সাইর পরিচয় ॥

[১।৩০] : ১৭ চাঁদ ধরা ফাঁদ জান না মন।

নেহাজ নাই তোমার নাচানাচি সার

একবার লাপ দিএ ধরতে চাও গগন ॥৵

সামান্ন রশে তার পন্য পাবে কে

কিবল প্রেম রসের রসীক ওসে

ও সে প্রেম কেমন করো নিরাপন

প্রেমের সন্দী জেনে থাকো চেতন ॥৹

ভক্তি পাত্র আগে করো রে নির্নয়

মকতি দাতা এসে অতা বারাম দেএ

নৈলে হবে না প্রেম উপাসনা

মিছে জল বাড়িএ হবে মরণ ॥

মকতি দাতা আছে নওনের অজানা

ভতি পাত্র সিড়ি দেখ বর্ত্তমান

মুয়ে দিন ২ বল শিড়ি ধরে চল

সিড়ি ছেড়লে ফাকে পড়বি লালন ॥৵

কোন পথে যাই

[১।৯৯] : ৫৪ কে কথা কএরে দেখা দেয় না।

নড়ে চড়ে হাতের কাছে

খুজলে জনম ভোর মেলে না ॥

খুজি তারে আছমান জমিন

আমারে চিনি নে আমি

এতে বেষ [ম] ভোলে ভ্রিমি

আমি কোন জোন

সে কোন জোনা ॥

রাম রহিমা বলচে সে জোন

খেভি জল কি বাউ হুতাসন

শুদালে তার অথ্য সোন

মুক্ষু দেখে কেউ বল্লে না ॥

আমার হাতের কাছে হয় না খবর

কি দেখতে জাই দিল্লী লাহর

ছেরাজ কয় লালন রে তোর
সদাএ মনের ভ্রেম জাএনা ॥

[১।১০০] : ৫৫ না জানি কেমন রূপ সে।
নামেরো সৈয়বে জারো ত্রিভুবন মহিত কোরেছে ॥৮
দেখতে মনে হয় বাসনা
পাই নে তার উপসনা
কোথায় বাড়ি কোথায় ঠেকনা
খুজিএ পাবো কোন দেশে ॥
আকার কি সাকার ভাবিবো
নি আকার কি জতি রূপ
একথা কারে শুদাবো
ছিষ্টি কন্ন্যন কোথাএ বশে ॥
উপদেশে গোল জদি রয়
কি ভাবিএ কি করে জাই
গোলে হরি বল্ল কি হয়
লালন ভেবে পায় না দিশে ॥

[২।২৮] : ১৬ জে জা ভাবে শেই রূপ সে হয়।
রাম রহিম করিম কালা এক আল্যা জগতময় ।৮
কুর্ন্নে সাই মইত খোদা
আপনা জবানে কএ।
একতা জার নাই রে বিচার
পড়িএ শে গোল বাদাএ ;
আকার সাকার নয় নরেকার
একে অনাম্বে উদায়।
নির্জ্জন ঘরে রূপ নেহারে
এক বিনে কি দেখা জাএ ॥
একে নেহার দেও মন আমার
ছাড়িএ রে দোখোদয়।
লালন বলে একরূপ [দে] খেলে
ঘটে পটে সব জাগায় ॥

[২।৫৭] : ৩১ কি করি কোন পথে জাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে পড়ে ভাবি ঐ ভাবনা॥
কেউ বলে মাক্কায় জাএ হজ্ব করিলে জাবে গোনো।
কেউ বোলিছে মানুষ ভজে মানুষ হ না॥
কেউ বলে পড়লে কালাম পাএ সে আরাম ভেস্তেখানা।
কেউ বলে ও ভাই ও শুকের ঠাই কাএম রয় না॥
কেউ বলে মরশীদের ঠাই খুজিলে পাই
আদ ঠেকেনা।
নালন ভেড়ে না বুজিএ হয় দোটানা॥

[২।১০৫] : ৫৫ এগবার জর্গনাথে দেখরে জেএ।
জাইত কেমনে রাকো বাচিএ।।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রমনে
তাই খাএ চেএ।।
জোলা ছিল কুবির দাষ
তার তোড়ানি বারো মাশ
উটচে উতালিএ সেই তোড়ানি
খাএ জে ধনি সেই আশে
দরষণ পেয়ে।
ধর্ম প্রভু জগন্নাথ
চাএ না রে শে জাত অজাইত
ভক্তের অধিন সে
জাত বিচারি দুরাচারি
জাএ তারা সব দুর হএ।।
জাইত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জেতের গৈরব করি
ছুসনে বলিএ,
নালন কএ জাইত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিএ।।

[২।১২] : ৪৯ মুলের ঠেকনা পেলে সাদন হয় কিশে।
কেউ বলে যে শ্রীকৃষ্ট মুল

কেউ বলে মূল ব্রেহ্ম সে ॥
ব্রেহ্ম ইশ্বরে তুই তো
লেখা জাএ সাক্ষ বর্ত্ত
উচানিচা কি তারো তো
করিতে হয় শেও দিশে ॥
কোথা জাই কিবা করি
বোলে [রে] রে ভাই গোলে হরি
লালন কএ এক জেন্তে নারি
তাইতে বেড়ায় মন ভেশে ॥

[২।১০৪] : ৫৫ চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনি ।
নয় শে আকার নয় নৈরেকার
নাই ঘরখানি ॥
বেদ আগমে জানা গেলো
ব্রহ্মা জারে হৃদ্দি হলো
জিবেরো কি সার্দ্দি বলো
তারে চিনি ॥
কতো ২ মনি জনা
করিএ রে জোগ সাদনা
নিলের অন্তো কেউ পেলে না
নিলে এমনি ॥
সবে বলে কিঞ্চীত ধ্যানী
গর্ব্ব সে হলো শুলপানি
লালন বলে কবে আমি
হবো জ্ঞানী ॥

প্রেম

[১।৪৮] : ২৭ জে ভাব গোপির ভাবনা ।
সামান্ন মনের কাজ নয় সেভাব জানা ॥
গৌরাঙ্গ ভাব বেদের বিধি
গোপি ভাব অকৈতব নিধি

ডুবলে তাহে নিরবদি
রসীক জোনা ॥
জগিন্দ্র মনন্ত্র জারে
পাএনা জোনা খিয়ান করে
সেই কিষ্ট গোপির দ্বারে
হোএচে কিনা ॥
জেজন গোপি ওনুগতো
জেনেচে সেই নিগুড় তর্ত্ত
লালন বলে জাতে কিষ্ট
সদায় মগনা ॥

[১।৫১] : ২৮ সে ভাব সবায় কি জানে ।
জে ভাবে সাম আছে বান্দা গোপীর সোনে ॥
গোপি বিনে জানে কে বা
শুর্দ্দ রষ অত্রত সেবা
গোপির পাপ পূণ্যের গ্যান থাকে না
কিষ্ট দরসনে ॥
গোপি ওনুগত জারা
ব্রেজের সে ভাব জানে তারা
নির হেতু ভাব অধর ধরা
গোপির মনে ॥
টলে জিব অটলে ইশ্বর
তাইতে কি হয় রসীক নাগোর
লালন বলে রসীক বিভোর
রসো ভিয়ানে ॥

[১।৬৩] : ৩৪ কিষ্ট পদের কথা কয়োরে দিশে ।
রাধা কান্তী পদের উদায় হয় মাশে ২ ॥
না জেনে সে জোগ নিবাপন
রসীক সাম ধরা সে কেমন
অসমাএ চাষ কল্য তখন
কিশী হয় কিশে ॥

সামান্য বিচার করো
বিশ্বাসে লইএ ধরো
অমূল্য ফল পেতে পারো
তাহে অনেয়ষে ॥
সত্তে নাই অন্দাজি কথা
বত্তমানে জানো হেতা
লালন কয় সে অর্ম্মনতা
দেখোরে হিশে ॥

[১।৭৬] : ৪২ প্রেমের সঙ্গী আছে তিন।
স্বড় রশীক বিনে জানা হয় কোটীন ॥
প্রেম ২ বল্যে কি হয়
না জেনে সে প্রেম পরিচয়
আগে সন্দী বোজো প্রেমে মজো
সন্দি স্থলে সে মানুষ অচিন ॥
পংক্ক জল ফুল সন্দী
বিন্দু আন্ত মুল তার শুক্কু সিন্দু
ও সে সিন্দু মাজে আলেক পেচে
উদয় হর্চ্চে সাদায় রাত্র দিন ॥
সরল প্রেমের প্রীমি হইলে
চাদ ধরা জায় সন্দী খুলে
ভেবে লালন ফকির পায় না ফিকির
হোএ আছে সদায় ভজন হিন ॥

[১।৮৩] : ৪৩ শুদ্দু প্রেমের পৃমি মানুষ জে জোন হয়।
মুখে কথা কোক বা না কোক
নওন দেখলে চেনা জায় ॥
মণি হারা ফণির মতো
প্রেম রোশীকের তুলী নওন
কি দেখে কি করে সে জোন
কে তাহার অন্তো পায় ॥

রূপে নওন করে খাটি
ভুলে জায় সে নাম মন্ত্রটী
চিত্রগুপ্তী তার পাপ পুণ্যী
কিরূপে লেখে খাতায় ॥
গুরুজি কয় বারে বারে
সোন রে লালন বলি তোরে
তুই মদন রসে বেড়াষ ঘুরে
সে প্রেম মনে কৈ দাড়ায় ॥

[১।৯০] : ৫০ বিদেশীরো প্রেম কেউ কোরো না।
আগে ভাব জেনে প্রেম করো
জাতে ঘুচবে মনের জাতোনা ॥
ভাব দিলে বিদেসিরো ভাবে
ভাবে ভাব কোভু না মিসিবে,
শেশে পথের মাথায় গোল বান্দিএ
কারু সাত কেউ জাবে না ॥
একে দেশের মানস জদি হয়
মনে কষ্ট পাই সমায় ॥
ওশে বিদেশী আর জোঙ্গালা টিএ
কথন পোষ মানে না ॥
নীলেনি আর শুর্জ্জের প্রেম জমন
সেই প্রেমের ভাব লেও রশীক শুজন
ওথিন লালন বলে ঠগলে আগে
কেন্দ্ লে সেশে সারবে না ॥

[১।৯২] : ৫১ রাত পোয়ালে পাকটে বলে দে রে যাই।
তথন গুরু কার্জ্জ মাথাএ থুয়ে কি করি রে
কমনে জাই ॥
সদায় বলি আত্মারাম
লেওরে শখে ক্রিষ্ট নাম
জাতে মুকৃত্তি পাই।

সে নামেতো হয় না রতো
খাবো ২ রব সদায় ॥
এমন পাকি কে পোশে
খেতে চায় সাগোর চুশে
আমি কি রূপে জোগাই ।
আমার বুদ্ধী গেলো
সাদ্ধী গেলো
সার হোলো রে পেটকো বাই ॥
আমি লালন লাল পড়া
পাকিতে সেও সেই আড়া
তার সাবরি কিছুই নাই ।
তাইতে লালন বলে পেট ভোরলে
হয় কি আর গুরু গোসাই ॥

[১।৯৭] : ৫৩ শুর্দ্ধ প্রেমের রোশীক মেরে সাই ।
পড়িলে শুনিলে কি রে তারে পাই ॥
রোজা পুজা কল্য সবে
আপ্তো শুকের কার্জ্জ হবে
সাইর করন নি সই পড়িবে ভাবে তাই ॥
ধ্যানি গ্যানি মনি জোনা
প্রেমের খাতায় সই পড়ে না
প্রেম পিরিতের উপসনা
বেদে নাই ॥
প্রেমে পাপ কি পুন্যী হয় রে
চিত্রগুপ্তী লেকতে নারে
ছেরাজ সাই কয় লালন তোরে
তাই জানাই ॥

[১।১১৬] : ৬৩ মন আমার 'কেউ না জেনে মজো না পিরিতে ।
জেনে শুনে কোরগে পিরিত
সেস ভাল জাতে ॥

ভবের পিরিত ভুতের কিত্তন
খেনেক বিচ্ছাদ খেনেক মিলন
সব শেশে বিপাকের মরণ
তেমাতা পতে ॥

পিরিতেরো হয় বাসনা
সাদুর কাছে জেন গে চেনা
লোহা জমন পরশে সোনা
হবা সে মতে ॥

এক পিরিতের বিভাগ চলন
কেউ সগ্গে কেউ নরকে গমন
জেনে শুনে বলচে লালন
এহি জগতে ॥

[২।১২৫] : ৬৬ জানি মন প্রেমের প্রিমি কাজে পেলে।
পুরূস প্রর্কিতি সভাব থেকতে কি
প্রেম রশীক বলে ॥

মদন জালায় ছিন্ন´ ভিন্ন´
প্রম ২ বলে জগ জানান
তহিকদারে রসিক মার্ন´
ঘুসকি জারি প্রেম টাকসালে ॥

সহজ স্বরসীক জোনা
শোসায় সোসে বান ছাড়ে না
সে প্রেমেরো সন্ধী জানা জাএ না
মরে না ডুবিলে ॥

তিন রসে প্রম শেদলে হরি
সামঙ্গ গৌরাঙ্গ তারি
লালন বলে বিনয় করি
সেই রশে প্রম রশীক খেলে ॥

[২।১২৯] : ৬৮ ক্রিষ্ট বিনে তেষ্টা তেগী।
ভবে সেই বটে গো শুর্দ্ধ অনুরাগি ॥

মেঘের জল বৈ চাতোক জমন
অন্ন´ জল করে না গ্রহন
তন্নী ক্রিষ্ট ভক্ত জনে
একান্তো কোট মনে ক্রিষ্টের লাগী
র্সরগেরো শুক নাহি চাএ সে
মিসিতে না চায় শার্জ্জে
ও তার ভাবে বুজায় পষ্টো
কি বলি সেই ক্রিষ্ট শুখের শুকি ॥
কৃষ্ট প্রেমো জারো মনে
তার বিক্রম সেই তা জানে
ওধিন নালন বলে আমার মুক র্স´রবশ
কারবার মন বিবাগী ॥

[২।১৩০] : ৬৯ জান রে মন সেই রাগের করোন ।
জাতে কৃষ্ট বরন হলো গোউর বরন ॥
সতোকোটী গোপি সংঙ্গে
কৃষ্ট প্রেমো রসোরংঙ্গে
ও সে টলের কার্জ্জ নয়
অটল না বলায় সেই বা কেমন ॥
রাধাতে কি ভাব কিষ্টে রো
কি ভাবে বষ গোপিকারো
সে ভাবো না জেনে সে সংঙ্গ
কেমনে পাবে কোন জোন ॥
সাস্থ রসের উপাশনা
না জানিলে রশীক হয় না
নালন বলে শে জে নিগুড় করোন
ব্রেজে অকৈতপ ধোন ॥

[২।১৩১] : ৬৯ অনআদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
তার কি আছে কভু গোষ্ট খেলা ॥
ব্রের্মরূপে শে অটালে বশে,
নিলেকারি তারো অংসো কলা ॥

পুর্ন চন্দ্র কৃষ্ট রশীক শীখরে
সক্তিবরা উদায় জার সরিরে
সক্তিতে শিরঞ্জন মহাসংকেরসন
বেদ আগমে জারে বিষ্টু বলা ॥

সর্ত্ত ২ সয়ন বেদ আগমে গাএ
চিদানন্দো রূপ পুর্ন বেক্ষ হয়,
জর্ম্ম ম্রিত্যু জার নাই ভবের পর
তবু তো নয় সঅং নন্দোনালা ॥

দরবেশের দেশ দরিয়া অথাই
অজান খবোর সেহি জানে ভাই
ভজো দরবেষ পাবি উপদেষ
লালন কয় তার উর্জল রিদ কোমলা ॥

[২।১৫৪] : ৮৪ শুর্দ্দ প্রেম রাগে সদায় থাকরে আমার মন।
সোতে গা ঢালান দিও না বেএ জাও উজান ॥
নেভাবিএ মদন জালা
ওহি মুণ্ডে কোরগে খেলা
উভয় নেহার উর্দ্দ তালা
প্রেমের এই লক্ষন।

একটা সাপের দুটি ফনি
দো মুখে কামড়ালে তিনি
প্রেমবানে বিক্রোম
তার সোনে দেওরন ॥

মহারশ মুদিত কোমলে
প্রেম ছিজারে নেওরে খুলে
আগো সামাল সেই রনকালে
রএ ফকির লালন ॥

[২।১৫৫] : ৮৫ করি কেমনে শুর্দ্দ সহজ প্রেম সাদন।
প্রেম সাদিতে ফাপরে
ওঠে কামনদির তুফান ॥

প্রেমরতন ধোন পাওার আশে
ত্রিপীনের ঘাট বেন্দলাম কশে
কাম নদির এক ধাক্কাএ এশে
জাএ বান্দোন ছান্দন॥
বোলবো কি শে প্রেমের কথা
কাম হইল প্রেমের নতা
কাম ছাড়া প্রেম জথাতথা
নাই রে আগমন॥
পরমগুরু প্রেম পিরিতি
কামগুরু হয় নিজ পতি
কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি
তাই ভাবে নালন॥

সাধোরে মন

[১।৩৮] : ২২ মন রে আপ্তো তত্তে না জানিলে
ভজন হবে না পড়বি রে গোলে॥
আগে জেন্‌গে কালুন্যা
আএনল হক আল্যা
জারে মানুষ বলে।
পড়ে ভুত মন আর হুশনে বারামবার
এগবার দেখ না প্রেম নওন খুলে॥
আপ্নী সাই ফকির আপ্নী হয় ফিকির
ও সে নিলে ছলে আপ্নারে অপ্নী ভুলে
রববানি আপ্নী ভাশে আপন প্রেম জলে॥
লাএলাহা স্তোন এল্যাল্যা জিবন
আজ প্রেম জগলে
নালন ফকির কএ জাবি মন কোথায়
আপ্নারে আজ আপ্নী ভুলে॥

[১।৪৩] : ২৪ নাম সাদন বিফল বরজোক বিনে।
এখানে সেখানে বরজোক মুল ঠেকনা
তাই দেখ মনে মনে॥

বরজোকের ঠিকনা হয় জদি
ভুলাইবে সয়তান গিধি
ধরিএ রূপ নানান বিদি
চিনবো তারে কিরূপ প্রমাণে ॥
চার ভেঙ্গে দুই হোলো পাকা
সেই দুই বরজোক লেখাজোকা
তাতে পলো আরাক ধোকা
দুই দিগে ঠিক কবে হয় ধেয়ানে ॥
জমন লোকা ঠিকানায় বিনে পাওয়ায়
নি আরে মনা কি দাড়ায়
লালন মিছে ঘুরে বেড়ায়
অধর ধরতে চাএ বরজোক না চিনে ॥

[১।৫৮] : ৩২ এনে মহাজনের ধোন বিনাষ কল্লী খেপা।
সন্ত বাকির দাএ জাবি জমূলায়
হবে রে কপালে দাএমাল ছাপা ॥
ক্ষিতি কর্মা সেহি ধনি
অমূল্য মাণিক মণি
কোরিলো ক্ষিপা তোরে করিলো ক্ষিপা ॥
সে ধোন এখোন
হারালিরে মন
এমন কি তোর কপাল বদওকা ॥
আনান্দো বাজারে এলে
বেপারের লাব কোরবো বোলে
এখন সর্ব্ব সেদকা সংঙ্গেরি সংঙ্গে
মজে কুরংঙ্গে
হাতের তির হারাএ হলি ক্ষেপা ॥
দেখলি নে মল বস্তু খুড়ে
কাঠের মালা নেড়ে চেড়ে
মিছে নাম জপা ॥
লালন ফকির কএ

কি হবে উপায়

বৈদিগে রৈইল য্যান চক্ষু ঝাপা ॥

[১।৫৯] : ৩২ মন আএন মাফিক নিরিক দিতে ভাবো কি ।

কাল সমন এলে হবে কি ॥

ভাবিতে দিন আখির হলো

সোলো আনা বাকি পোলো

কি আপ্সোস্‌ ঘিরে এলো

দেখলি নে খুলে আখি ॥

নিষকামি নিষবিচার হলে

জেন্তে মরে জোগ সাদিলে

তবে খাতায় উশুল পাবে

নৈলে উপায় কৈ দেখি ॥

শুর্দ্দু মনে সকলি হয়

তন্তে তো এবার জোটে না তোমাএ

লালন বলে করবি হায় ২

ছেড়ে গেলে প্রাণ পাকি ॥

[১।১০৯] : ৬০ সামান্য কি সে ধোন পাবে ॥

দিনেরো ওধিন হোএ সাদিতে হবে ॥

সাধোন পথে কি না হোলো

বাদসার বাদসাই ছড়িলো

কুলবতির কুল গেলো

কালারে ভেবে ॥

কতো ২ মনিরিশি

জুগ জগন্তর বোনবাশী

পাবো বলে কালো শসি

বসিএ তপে ॥

গুরুপদে কতো জোনা

বিনে মুলে হোএ কেনা

করে গুরুর দার্শ পানা

সে ধোনের লোবে ॥

চরণ ধোনের আরো আশা
অন্ত ধোনের নাই পেবসা
লালন ভেড়ের বুদ্দী নাসা
দোভাসা ভবে ॥

[২।৮৪] : ৪৫ কি সাদনে পাই গো তারে।
আনার মন অহর নিশী চাএ জাহারে ॥
পঞ্চ প্রকার মক্তির বিদি
অষ্টে দষ প্রকারে সিদ্দি
এসব কয় হেতু ভক্তি
এহার বাসনাই আলেক সাইজি মেরে ॥
দান ব্রেতো তব জর্গ জতো
তাহাতে সাই হয় না রতো
সাদু সাস্ত্রে কয় সদতো
মনে কোনটা জানি সর্ত্ত কোরে ॥
ঠিক পড়ে না প্রবর্ত্তের ঘর
সাদন শীদ্দী হয় কি প্রকার
ছেরাজ সাই কয় লালন তোমার
নজর হয় না কিছুই কোলের ঘোরে ॥

[২।৯০] : ৪৮ ধরে জারে পাএ না মহামনি ॥
ফেরে সে অধার চাঁদ মোর
মিন রূপে সে ধরে পানি ॥
জগত জোড়া মিন সেহিরে
খেলচে মনি সরবরে
দেখা সাদ হয় গো তারে
দেখ ধরে রসিক সনধানি ॥
নদির অন্তগভিরে থাকে নির্জ্জন
করিতে হয় নির অন্তসন
জোগ গেলে ভাটী উজন
ধায় আপনি ॥
জাএ শে মহা মিনকে ধরা

বেন্ধে পেল্যে নদির ধারা
কঠীন সে বান্দান করা
নালন তাতে খেলে চুপনি ॥

[২।১০৯] : ৫৭ কি রূপ সাদনের বলে অধার ধরা জাএ।
নিগুর সোন্দান জেনে শুনে সাদন করতে হয় ॥
সাক্তো তর্ত্ত সাদন করে
পেতো জদি সে চাঁন্দেরে [হে]
তবে বৈরাগেরা কেনে
আচলা গুদড়ি টানে
কুলের বাহির হয় সেই চরন বাঞ্চায় ॥
বষ্টোবের ভজন ভালো
তাই বলি এ ভক্তি ছিলো [হে]
ব্রের্ম্ম জ্ঞানি জারা
সদায় বলে তারা
সাক্তো বষ্টোবের নাই মুল পরিচয় ॥
সনে ব্রেহ্ম জ্ঞ্যনির [পৃ. ৫৮] বাক্য
দরোবেশে করে তর্ক্যো [হে]
বস্তুগ্যন জার নাই
নাম ব্রেহ্মে কি পাএ
নালন কয় দরবেশে একি কথা কয় ॥

[২।১১০] : ৫৮ বেদে কি তার মর্ম জানে।
জে রূপে সাঁইর নিলে খেলা
আছে এই দেহো ভুবানে ॥
পঞ্চতত্ত বেদের বিচা [র]
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার
মানুষ তর্ত্ত ভজনের স্বার
বেদ ছাড়া বৈরাগের মনে ॥
গোলে হরি বল্যে কি হয়
নিগুড় তর্ত্ত নিরালা পায়

নিরে খিরে জুগলে রএ
সাইর বারামখানা সেইখানে ॥
পড়িলে কি পায় পর্দাতো
আপ্ত তৎতে জারা ভ্রান্তো
লালন বলে সাদ মহন্তো
সিদ্দি হয় আপ্নারে চিনে ॥

[২।১১৩] : ৬০ কারে আজ শুদাই সে কথা।
কি সাধনে পাবো তারে
জে আমার জিবন দাতা ॥
সন্তে পাই ধারমিকো সবে
ইল্যীনে ছিজ্জিনে জাবে
উভায় সব কয় আদেন রবে
অটল প্রাপ্তো কৈ থেমতা ॥
ইল্যীন ছিজ্জিন দুখ শুখের ঠাই
কোন খানেতে রেকেছে সাই,
হেতা কেনে দুখ শুকো পাই
কোথাকার ভোগ ভুগী কোতা ॥
জখনকার পাপ তখন ভুগী
শীশু তবে হয় কেন রূগি
লালন বলে বোজো দেখি
কখন শিশুর গোনা খাতা ॥

[২।১১৮] : ৬৩ মানুষ ঝলক দিবে নেহারে।
রেও মন কপাট মারো কামের ঘরে ॥
হাওা ধরো অগ্নী স্থির করো
জাতে মরিএ বাচিতে পারো
মন রে মরণের আগে মরো
সমন জাক ফিরে ॥
রেও মন দেখে সমন জাক ফিরে ॥
বারে বারে করিবে মানা
ও মন নিলে বাশে বাস কোর না

রেখো তেজের ঘর তেজি আনা
উর্দ্দ চাঁদ ধরে
সাদো রে মন উর্দ্দ চাঁদ ধরে ॥
জানো না মন পারাহিল দর্পণ
তাতে কেমন হয় রূপ দরোসন
ওতি বিনয় কোরে কএ লালন
থেকো হুসারে ॥

[২।১২০] : ৬৪ সমাএ গেলে রে ও মন সাদন হবে না।
দিন ধারিএ তিনের সাদন কেনে কল্য না ॥
জানো না মন খালেবিলে
মিন থাকে না জল শুকালে
কি হয় তারো বান্দাল দিলে
শুকন মহানা ॥
অসমাএ কৃশী করে
মিছামিছি খেটে মরে
গাছ জদি হয় বিচের জোরে
ফলো ধরে না ॥
আমাবস্য পুন্নিমা হয়
মহাজোগ সেই দিনে উদায়
লালন বলে তারো সমায়
ডণ্ডে করএ না ॥

[২।১৩৫] : ৭২ এবার কি সাদনে সমন জালা জায়।
ধর্মাধর্ম বেদের মর্ম সমনের ওধিকার তায় ॥
দান ব্রেতো তপ জর্গ করে
মুক্তি ফল পেতে পারে
সে ফল ফুরালে তারে
ঘুরিতে ফিরিতে হয় ॥
নির্ব্বান মুকতি সেদে সে তো
লয় হবে পশুর মতো

সাদন করে এমন প্রাপ্ত
কি গুকে সাদকে চায় ॥
পতেরো গোলমালে পড়ে
ডুবলাম কুব জল মাঝরে
নালন বলে কেশে ধরে
কুলে নেও গুরু আমায় ॥

[২।১৪৬] : ৮০ পারো নির হেতু সাধনা করিতে।
জাওরে ছেড়ে জরা মৃত নাই জে দেশে তে ॥
নিরহেতু সাদকো জারা
তাদের সাদন খাটি জবান খারা
উপসথা কেটিএ তারা
চলেচে পতে ॥
মুক্তিপদ তেজিএ সদায়
ভক্তিপদ রেখো রিদয়
শুর্দ্দ প্রেমের হবে উদায়
সাই রাজি জাতে ॥
শুমজে সাদন করো ভবে
এবার গেলে আর কি হবে
নালন বলে পড়বি তবে
লর্ক্ষ জুনিতে ॥

[২।১৪৭] : ৮০ সবায় কি তার মর্ম জেন্তে পায়।
ও গো জে সাধন ভজোন কোরে
সাদকে অটল হয় ॥
অমৃতো মেঘেরী বোরিসোন
চাত্তোক ভাবে জানরে আমার মন
ও তার একোবিন্দু পরশীলে
সমন জালা ঘুচে জায় ॥
জোগেশরির সঙ্গে জোগ কোরে
মাহাযই জোগ সেই জেন্তে পারে

ও সে তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
একদিনেতে সেদে লয় ॥
বিনে জলে হয় জর্ম্মামৃত
জা খাইলে জায় জরামৃত
ওধিন নালন বলে চেতন গুরুর
সঙ্গ নিলে দেখিএ দেয় ॥

[২।১৫৬] : ৮৫ জে জোন সাদকের মুল গোড়া।
বেসুরিদ বেতালিব সে তো
ফিরচে সদাএ বেদ ছাড়া ॥
গোপ্তো সুরে হয় তারো শীজ্জন
গোপ্তো ভাবে কোরছে রে ভ্রেমণ
সুরেতে নূর নবি হোলো
সেই কথাটী দেয জোড়া ॥
পিরের পির ও দস্তোগীর হয়
মুরশীদেরও মরশীদ বলা জাএ
চিস্তে পারে তারে জদি পায়
সে পতের দাড়া ॥
কেউ বলে সে মুল ধরের মুল
মুরশীদ বিনে জেনবে কে তার উন
সাই নালন বোলে ভেদ না জেনে
ঝাকমারি তার বেদ পড়া ॥

[২।১৭২] : ৯৫ কি সাদনে আমি পাই গো তারে।
ও সে ব্রেহ্মা বিষ্ট ধ্যানে পাএ না জারে ।।
শর্ন শীকর জার নিজ্জন গোফা
স্বরূপে, সেহি তো চন্দ্রের আভা
ও সে আভা ধরতে চাই হাতে নাহি পাই
কেমনে শে রূপ জাএ গো সরে ॥

[অসম্পূর্ণ]

ভাবাত্মিকা

[১।৩৩] : ১৯ চাতোক সভাব না হলে।
অম্রেতো মেঘের বারি কথা কি মেলে ॥
মেঘে কতো করে ফাকি
তবু চাতোক মেঘের ভুকি
তন্নী নিরিক রেখলে আখি
সাদক্যে বলে ॥
চাতোকেরি এম্নী ধারা
তেষ্টায় জিবন জাএ রে মারা
অন্ন´ বারি খাএনা তারা
মেঘের জল বিনে ॥
মন হোয়েছে পবন গতি
উড়ে বেড়ায় দিবো রাতি
নালন বলে গুরুপ্রীতি
রয় না স্বহালে ॥

[১।৬০] : ৩৩ আছে ভাবের তালা সেই ঘরে।
যে ঘরে সাই বাষ করে ॥
ভাব দিএ খোল ভাবের তালা
দেখবি সে মানুষের খেলা
ঘুচে জাবে সোমন জালা
থেকলে সে রূপ নেহারে ॥
ভাবের ঘরে কি মুরতি
ভাবের লণ্টন ভাবের বাতি
ভাবের বিভাব হএক রতি
অন্নী সেরূপ জাএ সবে ॥
ভাব নৈলে ভক্তিতে কি হয়
ভেবে বুঝে দেখ না এবার মহুরায়
জার জে ভাব সে দেখিতে পায়
নালন কয় ধেনয় কেশব ॥

[১।৭৫]: ৪১ বল কারে খুজিব খেপা দেষ বিদেশে।
আপন ঘর খুজলে রতোন পাএ আনাসে॥
দোড়োদোড়ি দিল্লী লাহোর
আপনার কোলে রএ ঘোর
নিরূপ আলেক সাই মর
আত্মারূপ সে॥
জে নিলে বের্ম্মাণ্ডের পর
সেই নিলে ভাণ্ডো মাজার
ঢাকা জমন চন্দ্র আকার
মেঘের পাসে॥
আপ্পাকে আপ্পী চিনা
সেই বটে উপসোনা
নালন কয় আলেক চেন
হয় তার দিশে॥

[১।৭৮]ঃ ৪৩ পাগোল দেয়ানের মন কি ধোন দিএ পাই।
বল্লি আমার আমার
আছে কি ধোন আমার
সদায় মনে মনে ভাবি তাই॥
দেহো মন ধন দিতে হয়
সেও ধোন তাই রি আমা তো নয়
আমি মটে মট চালাই
আবার ভেবে দেখি
আমি বা কি
ওগো তাও তো আমার হিসাব নাই॥
ওসে পাগলা বেটার পাগলা খিজি
নয় সামান্ত ধোনে রাজি
কোন ভাবে কোন ভাব মিসাই,
পাগলার ভাবনা জেনে
জদি জাএ সসানে,
পাগোল হয় কি অংজে মেখলে ছাই॥

ওসে পাগোল ভেবে পাগোল হৈলাম
সেই পাগোল কৈ সরন হইলাম,
আপন পর তো ভুলি নাই,
ওখিন নালন বলে
আপ্নারে আপ্নী ভুলে
ঘটে প্রেম, পাগোলের এম্নী বাই ॥

[১।৮৫] : ৪৭ পাপ ধর্ম্ম জহি পুর্ব্বে লেখা জাএ।
করমের লিখিত কাজ করিলে
দোষগুণ তার কি হয় ॥
শোনিতে পাই সাদ সোমেষ কার
পূর্ব্বে থেকলে পরে হয় তার
পুর্ব্বে নাই হলো না এবার
আর কি তার আশায় ॥
বাদসার আজ্ঞায় দিলে ফাশী
ফাশীদার তো হয় না দুশী
জিবেরে পাপ করি এ কি
সাই তার নরক দেয় ॥
কর্মের দোষ কি কাজকে দোষাই
কোন কথাতে গিয়ে দেই ভাই
নালন বলে আমার বোদ নাই
সোনল্যে কি বা হয় ॥

[১।৮৬] : ৪৮ আপনারে অপ্নী চিনি নে।
দিন দোনের পর জার নাম অধার
তারে চিনবো কেমনে ॥
আপ্নারে চিনতাম জদি
মিলতো অটল চরণ নিধি
মানসের করণ হতো সীদ্ধী
শুনি আগম পুরানে ॥
কত্তারূপের নাই অন্বেসন
আত্তাযিকি হয় নিরূপন

আগ্তো তর্তে পায় সার্দ্দি ধোন
সহজ সাধোক জোনে ॥
দির্ঘ্য গ্যানী জে জোন হোলো
নিজতর্তে নিরাঞ্জন পেলো
ছেরাজ সাই কয় লালন বৈল
জর্ম্ম অন্দো মনগুনে ॥

[১।৯৪] : ৫২ আপনারে আপ্নী চেনা জদি জায়।
তবে তারে চিন্তে পারি সেই পরিচয় ॥
উপরওালা সদর বারি
আর্ত্তা রূপে অবতারি
মনের ঘোরে চিন্তে নারি
কিশে কি হয় ॥
জে অঙ্গ সেই অংস কলা
কায় বিশেষে ভিন্ন বলা
যার ঘুচেচে মনের ঘোলা
সে কি তা কয় ॥
সেই আমি কি আমি ২
তাই জানিলে জায় দুর্নামি
লালন কয় তবো কি
ভ্রিমি ভব কুপায়।

[১।৯৫] : ৫২ ভাবের উদায় যে দিন হবে।
সে দিন রিদ কোমলে রূপ ঝলক দিবে ॥
সতোদল সহস্র দলো
একরূপে কোরচে আলো
সে রূপে জে নওন দিলো
মহাকাল সমনে তার কি করিবে ॥
ভাবর্সয় হইলে রিদয়
বেদ পড়িলে কি ফল দেয়
ভাবের ভাব থেকলে সদায়
গোপ্তা ব্যক্তো সব জানা জাবে ॥

অদিষ্ট সাদনা করা
জমন আন্দার ঘরে সর্প ধরা
নালন বলে ভাবোক জায়া
ভাবের বাতি জেলে সে চরণ পাবে ॥

[১।৯৬] : ৫৩ সার্দ্দি কি রে আমার সে রূপ চিনিতে
অহর নিসি মায়া ঠুশী গ্যান চক্ষেতে ॥
ঘরের ইসান কোনে হামেষ খোড়ি
সেই নড়ে কি আমি নড়ি
আমি আমায় হাতড়া পাড়ি
পাইনে দেকতে ॥
আমি আর সে অচিন এক জোন
এক জাগাতে থাকি দুজন
ফাকে দেখি লক্ষ জোজন
চাইলে ধরতে ॥
ধুড়ে হর্দ্দো মেনে আছি
একন বোশে খেদায় মাচি
নালন বলে মরে বাচি
কোন কাজ্জেতে ॥

[১।১০৪] : ৫৭ কি হবে আমারো গতি
কতই জেনে কতই শুনে ঠিক পড়ে না কোন প্রীতি
মুচির কোটাএ গঙ্গা বোলো
কলার ডেগো সর্প হলো
সকলি ভক্তির বলো
আমার নাই কোন বল সক্তি ॥
জাক্রা ভক্ত জার সোনে
সেহি বানর হোনুমানে
নিষ্ঠাগুন রাম চরণে
সাদুর খাতায় তার শুকখ্যতি ॥
মেঘপানে চাতোকের ধিআন
অন্ন জল সে করে না পান

নালন কয় জগতে প্রমাণ
ভক্তির ছেষ্ট সেহি ভক্তি ॥

[১।১০৭] : ৫৮ অন্ত্রিম কালের কালে ও কি হয় না জানি।
কি মায়া ঘোরে কাটালাম হারে দিনমনি ॥
এনে ছিলাম বশে খেলাম
উপার্জ্জন কৈ কি করিলাম
নিকাশের বেলা থেটপে না ভোলা
এলো বানি ॥
জেনে শুনে সোনা ফেলে
মন মজালাম রাঙ্গ পিতোলে
এ লাজের কথা বলিবো কোথা
আর এখনি ॥
ঠকে গেলাম কাজে কাজে
ঘিরিল তনু পঞ্চাশে
নালন বলে মন কি হবে এখন
বলরে সনি ॥

[১।১১০] : ৬০ কুলের বোউ ছিলাম রাড়ি হলাম নাড়ি নাড়ার সাতে
কুলের আচার কুলের বিচার আর কি ভুলি
সেই ভোলাতে ।।
ভাবের নাড়ি ভাবের নাড়া
কুল নাসালাম জগত জোড়া
করন তার উল্ট দাড়া
বিদির ফাড়া কেটবে জাতে।
হোএচি নাড়ারো নাড়ি
পরণে পরেচি ধোড়ি
দিব না আচাই কড়ি
বেড়াবো চৈতন্ত পতে ॥
এস্তে নাড়া জেতে নাড়া
ছুফিবল ঘোড়া জোড়া

নালন কয় আগাগোড়া
জানিএ মাতা হয় মড়াতে॥

[১।১১১] : ৬১ বাকির কাগোচ গেলো হুজুরে॥
কখন জানি আসবে সমন সন্তোষপুরে॥
জখন ভিটেএ হও বসতি
দিএ ছিলে খোষ কোবলতি
হরদমে নাম রেক বশীতি
এখোন ভুলোচে তারে॥
আএন মাফিক নিরিক দে না
তাতে কোন ইতোর পানা
জাবেরে মন জাবে জানা
জানা জাবে আখেরে॥
শুক পেলে হয় শুকে ভোলা
দুখ পেলে হও দুখ উতালা
নালন কয় সাদনের খেলা
কিশে জুত ধরে॥

[১।১১৫] : ৬৩ ও তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েচে মন।
কিশে চিনবিরে মানুষ রতোন॥
আপন খবোর নাই আপ্নারে
বেড়াও পরের খাবোর কোরে
মন রে আপ্নারে চিনিলে পরে
পরকে চেনা জাএ তখন॥
ছিলি কোথা আলি কোথা
সরন কিছু হোলো না তার
মন রে কি বুজে মুড়ালি মাতা
পতের নাই অন্নসোন।
জার সাতে এই দেশে আলি
তারে আজ কোথায় হারালি,
দরবেষ ছেরাজ সাই কয় পেট সাকালি
তাই লয়ে পাগোল নালন॥

[১।১২১] : ৬৬ দিনে দিন হোল আমার দিন আখিরি।
আমি ছিলাম কোথাএ এলাম কোথা
আবার জাবো কোথায় সদাএ ভেবে মরি॥
বসত করি দিবা রাতে
সোলো জোন বোমবেটের সাতে
আমায় জেতে দেয় না সরল পতে
আমায় কাজে ২ করে দাগাদারি॥
বাল্যকাল খেলাএ গেলো
জুবকাল কলংক হোলো
আবাব ব্রেদো কাল ছামনে এলো
মহাকালে কল্যে ওধিকারী॥
জে আসাএ ভবে আসা
তাতে হোলো ভগ্ন দসা
লালন বলে হায় কি দশা
আমার উজাইতে ভেটেন পলো তোরি॥

[২।৯] : ৬ আর কি হবে এমন জনম বোষবো সাভুর মেলে।
হেলায় ২ দিন বএ জায় ঘিরে এলো কালে॥
মানব দলেতে আশায়
কতো দেব দেবোতা বাঞ্চীত হয়
হেনো জনম দিন দয়াময়
দিচে কোন ফলে॥
কতো কতো লক্ষ জুনি
ভ্রেমন কোরেছো তুমি
মানম কুলে মন রে তুমি
এসে কি করিলে॥
ভুল না রে মন রসোনা
শুমজে করো বেচাকেনা
লালন বলে কুল পাবানা
এবার ঠকে গেলে॥

[২।১০] : ৭ জগত মকতিতে ভোলালে সাই।
ভক্তি দেও হে জাতে চরোন পাই॥

রাঙ্গা চরোন দেকবো বলে
বাঞ্চা সদায় রিদ কোমলে
তোমার নামের মিঠায় মন মজেছে
রূপ কেমন তাই দেখতে চাই ॥
ভক্তি পদে বঞ্চীত কোরে
মকতি পদো দিছো তারে
জাতে জিব ব্রেমাণ্ড ঘোরে
কাণ্ডো তোমার দেখি তাই ॥
চরণেরো জগ্গ্য মন নয়
তথাপি মন ঐ চরণ চায়
ওধিন লালন বলে হে দয়াময়
দয়া করো আজ আমাএ ॥

*[২।১৮] : ১১ আমি কি দোশ দিবো কারে রে।
আপন [ম] মনের দোশে পলাম ফেরে রে ।।
গুবুদ্ধী গুসভাব গেলো
কাগের সবাব মনের হোলে
তেজিএ অম্রেতো ফল
মাথাল ফলে মন মজিলো রে ।।
জে আশায় এ ভবে আশা
ভাঙ্গিলো রে আশার বাসা[১]
ঘটীলো রে কি দুর্দ্দশা
ঠাঙ্গর গোড়তে বানোর হলো রে ॥
গুরু বস্তু চিল্লী নে মন
অসমাএ কি কোরবি তথন
বিনয় কোরে বোলচে লালন[২]
জগ্যার ব্রতো কুত্তায় খেলো রে

* দুটি চরণে সামান্য পাঠান্তর ছাড়া এই গানটির সঙ্গে ২নং খাতার ৪৫ নং গানের সাদৃশ্য থাকায় সেটি বর্জিত হলো।

পাঠান্তর : ১ হোলো না তার রতি মাশা।
২ ছেরাজ সাই কয় অবোদ লালন।

[২।২৫]: ১৪ সকলি কপালে করে ॥
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুএ গোবরে ॥
জদি থাকে এই কপালে
রত্ন এনে দেয় গোপালে
কাপালো বিমতি হইলে
দুর্ব্ব বোনে বাগে মারে ॥
কেউ রাজা কেউ হয় ভিকারি
কপালের ফের সবারি
মনের ফেরে বুজতে নারি
থেটে মরি অনাকারে ॥
জার জমন মনের কোরুনা
তেম্নী ফল পেএছে সে না
নাল [ন] বলে ভেবলে হয় না
বিধির কলম আর কি ফেরে ॥

[২।৩১]: ১৭ ভুলবো না ২ বলি, কাজের বেলা ঠিক থাকে না ।
আমি বলি ভলবো না রে,
সভাবে ছাড়ে না মরে
কটাক্ষে মন পাগোল করে,
দির্ব্বগ্যান দিএ হানা ॥
সংঙ্গ গুণে রঙ্গধার
জানিলাম কার্জ্জ ওনুসারে
কুসংঙ্গে সমন্দো জুড়ে
শুমতি মোর গেলে ছেড়ে
খাবি খেলাম আপায় পড়ে
এ লজ্জা ধুলেও তো জাএ না ।
জে চোরের দায় দেসা [স্ত] হুরি
সে চোর দেখি সংঙ্গ ধারি
মদন রাজার ডাক্কা ভারি
কাজ জালা দেয় সন্তোষপুরি

ভুলে জাএ মর মন কাণ্ডারি
কি করিবে গুনরি জোনা ॥
রঙ্গে মেতে সং সাজি
বোশে আছি মগন হোএ
শু সাকারে সঙ্গ করে
জেন্তাম জদি শু-সংঙ্গেরে
নালন বলে তবে কি রে
ছেচোড়ে মারে মালখানা ॥

[২।৩৪] : ১৯ মন কি তু ভোড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া ।
সদোরের সাজ করচো সদায়
পাচ বাড়িতে নাই রে [বে] ড়া ॥
কোথা বস্ত কোথা রে মন
চৌকি পারা দেও হামেষ কোন
[কাজ দেখি] কাজ দেখি পাগোলের গুমান
কথাএ জমন কাট ফাড়া ॥
কোন কোনায় কি হচ্চে ঘরে
একদিনে তো দেখলি না রে
পৈত্রিক ধোন গেলো চোরে
হলি রে তুই ফোক তারা ॥
পাঁচ বাড়ি আটে না করো
ঘর চোরারে চিনে ধরো
নালন বলে নৈলে তারো
থেকবে না মল এক কড়া ॥

[২।৩৭] : ২০ জেতে সাদ হএরে কাশী কর্ম্ম ফাশী বাদে গলায় ।
আমি আর কতো দিন [ন] ঘুরবো এমন নাগোর দোলায় ॥
হোলো রে একি দশা সর্ব্বনাশা মনের ভোলায় ।
ডুবলো ডিঙ্গে নিশ্চয় বুজি ধর্ম্ম নালায় ॥
বিধাতা দেয় বাজি কি বা মন পাজি হোএ
ফেরে ফেলায় ।
বাও না বুজে বাই তোরোনি ক্রোমে তলায় ॥

কলুর বলোদো অমন ঢাকে নওন পাকে চালায়।
ওধিন নালন বলে পোলো তন্নী পাকে
হেলায় হেলায়॥

[২।১৬২] : ৮৯ ওরে মন আমার গেলো জানা
কারো রবে না এ ধোন জিবন জৈবন
তবেরে কেনে এতো বাসনা॥
একবার ছবুরেরো দেসে
রয় দেখি দম কশে
উটিব নে রে ভেসে, পেয়ে জাতোনা॥
জে করিলো কালার চরনেরি আসা
জান না রে ও মন তাহারো কি দষা
ভক্ত বলি রাজা ছিলো
রাজথ্য তার নিলো
বামন রূপে প্রভু করে ছালনা॥
কর্ন রাজা ভবে বড়ো দাতা ছিলো
অতিত রূপে তারো সবংস নাসিল
তবু না হৈল ডুখি কল্য
ওনুরাগি ওতিতেরো মন কল্য
সান্তোনা [না]॥
প্রলাদো চরিত্র দেখো চিএ ধামে
কতো কষ্টো তার হলো কৃষ্ট নামে
তারে ওগনিতে ফেলিলো জলে ডুবা হলো
তবু না ছাড়িলো শ্রীনাম সাদনা॥
রামের ভক্ত লক্ষন ছিলো সর্ব্বকালে
সক্তসেল হানিলো তাহার বুকুস্থলে
তবু রামচন্দ্রের প্রীতি না ভুলিলো ভক্তি
নালন বলে করো এ বিবেচনা॥

[২।১৭১] : ৯৪ জেও না অন্দাজি পতে মন রসনা।
কুপেচে কুপাকে পড়লে প্রান বেচপে না॥

পথেরো পরিচয় করে
জাও না মনের সন্দো মেরে
লাব লোকসান বুদ্দির দারে
জাএ গো জানা ॥
উজন ভেটেন পতো দুটী
দেখে নিওন করে খাটী
দেও জদি মন গড়া ভাটী
কুল পাবা না ॥
ওনুরাগ তোরনি করো
ধার চিনে উজনে ধরো
নালন কয় শে কোরতে পারো
মন ঠেকে না ॥

দেহতত্ত্ব :

[১১১৭] : ১০ কোন রসে কোন রতির খেলা জেন্তে হয় এই বেলা ॥
সাড়ে তিন রতি বটে
লেখা জাএ ছাস্ত্র পাটে
সার্দ্দির মূল তিন রস ঘটে
তিনস সাইট রসের বালা
জেনল্যো সে রসের মরম
রশীক তারে জাএ বলা ॥
তিন রষ সাড়ে তিন রতি
বিভাগে করে স্থীতি
গুরুর ঠাই জেনে পাতি
সাসন করে নিরালা।
তার মানব জনব সাপল হবে
এড়াবে সমন জালা ॥
রস রতির নাই বিচাক্ষণ
আন্দাজি করি সাদন
কিশে হয় গ্রপ্ত কি ধন
ঘোচে না মনের ঘোলা।

আমি উজাই কি ভেটেনে পড়ি
ত্রি পীনির তির নালাএ ॥
শুর্দ্দ প্রেম রশীক হইলে
রস রতি উজন চলে
ভিয়ানে সর্দ্দ ফলে
অন্ত্রেতো মিছরি ওলা
নালন বলে আমার কিবল
শুদই জল তোলা ফেলা ॥

[১।২১] : ১৩ জে সাদন জোরে কেটে জাএ কর্ম্ম ফাশী ।
জদি জানবি সে সাদনের কথা হ'ও গুরুর দাসি ॥
স্ত্রিলিঙ্গ পুলিঙ্গটি আর
নপংশক সাসিত কর
আছে জে লিঙ্গ বেম্মাণ্ডের উপর
করো প্রকাশী ॥
মারে মৎস্য না ছোএ পানি
রশীকের ওম্নী করণি
ও সে আকোরসনে আনে টানি
থিরদ সশী ॥
কারণ শুমুদ্রুর পারে গেলে
পায় অধার চান্দে রে
ওধিন নালন বলে
নৈলে ঘুরে মরবি চৌরাসি ॥*

[১।২৩] : ১৪ না জেনে ঘরের খবর তাকাই আচমানে ।
চাঁদর এ যে চান্দে ঘেরা ঘরের ইসনা কোণে ॥
প্রথমে চাঁদ উদায় দক্ষীণে
কিষ্ট পক্ষে আদো হয় বামে
আবার দেখি শুক্ল পক্ষে
কিরূপে জাএ দক্ষীণে ॥

* এই গানটি সঙ্গে ২ নং খাতার ১৪৯ গানের সাদশ্য থাকায় সেটি বর্জিত হলো ॥

খুজিলে আপন ঘরখানা
পাইবে সকলো ঠেকেনা
বারো মাসে চব্বিষ পর্ক্ষ
অধার ধরা তার সনে ।।
সর্গচন্দ্র মণিচন্দ্র হয়
তাহাতে বিভিন্ন কিছু নয়
এ চাঁদ ধর‍্য সে চাদ মেলে
নালন কয় তাই নিজ্জনে ।।

[১।২৫] : ১৫ কি আজব কলে রশীক বানিএচে কোটা ।
অনাস্তো কুঠরি থরে থরে
চারি দিগে আএনা মহল তার
হাওার পত নাই রূপ দেখা জায়
মণি মানিকের ছাটা ।।
জেদিন জাবে রশীক চাঁদ সরে
হাওা প্রবেষ হবে সেই ঘরে
নিভাইবে রশের বাতি
ভেঙ্গে জাবে সব ঘটা ।।
দেখিতে বাসনা জারো হয়
দেল দরিআয় ডুবলে দেখা জায়
নালন বলে ফল ছুটালে
কারে আর দেখবি কেটা ।।

১ ২৬] : ১৫ জানা চাই আমাবস্ত থাকে চাঁদ কোথায় ।
গগনে চাদ উদায় হলে দেখে জে আছে জথায় ।।
আমাবস্তের মর্ম না জেনে
বেড়াই তিতি নক্ষত্র গুনে
প্রীতিমাসে নবিন চাঁদ সে
মরি একি ধরে কায় ।।
আমাবস্তে আর পুর্নমাসি
কি মর্ম হয় কারে জিগ্‌গাসি

তোমরা জে জানো সে বলছ
মন জুড়াই আজ সেতায় ॥
সাতাশ লক্ষত্র হয় গগন
সীতি লক্ষত্র জোগ কথন
না জেনে অধিন নালন
সাদক নাম ধরে ত্রেথায় ॥

[১।২৭]: ১৬ অনেকো ভাগ্যর ফলে সে চাঁদ কেও দেখিতে পায়।
আমাবস্তে নাইলে চাঁন্দে দি-দলে তার কিরন উদায় ॥
বিন্দু মাঝে শীন্দু বারি
মাজখানে তার সর্ব গিরি
অধার চাঁন্দের সর্ব পুরি
সেহিছে তিল প্রমান জায়গায় ॥
জথারে সে চন্দ্র ভুবন
দিব রেতেরে নাই আলাপন
কটী চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলি সঞ্চরে সদায় ॥
দরসনে তুথ হরে
পরসনে পরষ করে
এমী সে চান্দের মহিমে
নালন ডুবে ডবে না তায় ॥

[১।২৮]: ১৬ চাঁদ আছে চান্দে ঘেরা।
আজ কেমন করে সেথায় ধরাব গো তারা ॥
লক্ষ ২ চাঁদে কোরেচে সোবা
তাহার মাজে অধর চান্দরি আভা
একবার দিষ্ট করে দেখি
ঠিক থাকে গ আথি
রুপেরো কিরণে চমকে পারা ॥
রুপের গাছে ফল ধরেচে তায়
থেকে ২ ঝলক দেখা জায়
ও সে চাঁদের বাজার দেখে

চাঁদ ঘুরানি লেগে
দেখিব ২ পাচে হোসনে জ্ঞানহারা ॥
আলেক নামে সহর আজব কুদরতি
রেতে উদায় ভানু দিবশে বাতি
জে জোন আলের খবর জানে
দিষ্ট হয় নয়নে
নালন বলে সে চাঁদ দেখেচে তারা ॥

[১।৩১] : ১৮ জে জোন পর্দ্দহিন সরবরে জাএ।
অটল অমল্য নিধি সেই অনাসে পায় ॥
অপরূপ সেই নদির পানি
জন্মে তাতে মকক্ত মণি
বৈলবো কি তার গুন বাখানি
পরশে পরোষ হয় ॥
পলক ভরে পড়ে চরা
পলকে বএ তরকা ধারা
সে ঘাট বেন্দে মৎস্য ধরা
সামান্য কাজ নয় ॥
বিনে হাওায় মৌজা খেলে
ত্রিখণ্ড হয় ভিন্ন পলে
তাহে ডুবে রত্ন তোলে
রশীক মহাশয় ॥
গুরুজি কাণ্ডারি জারো
অথায়ে থাই দিতে পারে
নালন বলে সাদন জোরে
সমন এড়ায় ॥

[১।৩৪] : ১৯ নরে কারে দুজন হুরি ভেসচে সদায়।
ঝরার ঘাটে জুগন্তরে হেচ্চে উদায় ॥
একজোন পুরুষ এক জোন নারি
ভেষচে সদায় বরাবরি

উপরওয়ালা সদর বারি
জোগ তাতে দেয় ॥
মাশ অন্তে সেই দুই জোনা
আবেশে হয় দেখা সনা
জেনেছে সেই উপাসনা
কেউ ভাগ্যদয় ॥
জে জানে সেই দুই সুরিকে
সিদ্ধী হবে জোগে জেগে
নালন ফকির পলো ফাকে
মনের দ্বিধায় ॥

[১১৩৫] : ২০ সোনার মানুষ ভেষচে রসে।
জে জেনেচে রসোপন্তী
সেই দেখিতে পাএ অনাশে ॥
তিন সো সাইট রশের নদি
বেগে ধায় ব্রেম্মাণ্ডো ভেদি
তার মাজে রূপ নিরবদি
ঝলক দিচ্চে এই মানুষে ॥
মাতাপিতার নাই ঠেকেনা
অচিন দেশে বষতখানা
আজগবি তার আওনা জাওনা
কারন বারি জোগ বিস্তাবে ॥
আমাবস্থে চন্দ্র উদায়
দেখ না জার বাসনা রিদয়
নালন বলে থাকো সদায়
ত্রিপিনেতে থাকো বোশে ॥

[১১৩৬] : ২০ গোসাইর ভাব জেহি ধারা।
আছে সাদু সাস্ত্রে তার প্রমাণ
আচার সম্মধ্য রে জিবন ওমী হয় সরা ॥
ওসে মরার সংঙ্গে মরে

ভাবেরো সাগরে ডুবতে জদি পারে
স্বভাবিক তারা ॥
দুগেদতে ননিতে মিশাল সর্ব্বদা
মৈথন দণ্ডে করে আলাদা আলাদা
মনরে তন্নী ভাবের ভাবে. শুধানিধি পাবে
মথের কথা নয়রে সে ভাব করা ॥
অগ্নী হৈছে ঢাকা ভস্তর ভিতরে
শুদা তন্নী আছে গরলে ছল করে
ও কেউ শুধার লোবে জেয়ে মরে গরল খেয়ে
মনথনের শুতার না জানে তারা ॥
জে স্তোনেতে দগ্দ খাএরে সিশু ছেলে
জোথের মুখে তথা রক্ত এসে মেলে
ওধিন লালন ফকির বলে বিচার রো কোরিলে
কুরসে শুরসো মেলে সেই ধারা ॥

[১।৩৭] : ২১ নদির তির ধারা বএরে নদির তির ধারা বয়।
উওর কোন ধারাতে কি ধোন প্রপ্তী হয় ॥
তারন্য কারন্য এসে
লাবন্য তে কথ [ন] মেশে
জার আছে মন এসব দিশে
স্বচেতোন তারে বলা জায়।
সক্তি তর্ত্ত পরম অর্থ
সর্ত্ত সর্ত্ত জাহারো রিদয় ॥
তিরোধারায় জোগ আনান্দো
কাহার সংঙ্গে কিশোমন্দো
জেনল্য মনের ঘোচে সন্দো
প্রেম আনান্দো বাড়ে সাদায় ॥
আমার হোলো মতি মন্দো
সে পতে ডুবল না মহুরায় ॥
কথন শথন নদি কথন বরসা অতি
কোথা রে শে কলের স্থিতি
সাদকে করেচে নির্নয়।

আমি এ অভাগা লালন
না জেনে ভেবতেছি কেনারায় ॥

[১।৪২] : ২৪ সদাএ সে নিরাঞ্জন নিরে ভাশে।
জে জানে সে নিরের খবর
নির ঘাটায় তার খুজলে পাএ অনাসে ॥
বিনে মেঘে নির বরিসোন
করিতে হয় তার অন্নসন
জগতে হলো ডিম্বুর গটন
থাকিএ আবিম্বু গুমো বাশে ॥
জতা নিরের হয় উতপতি
সেই আবেম্মে জনমে সক্তি
মিলন হলো উভায় রতি
ভেবলে জখন নরে কারে এশে ॥
নিরে নিরাজ্জন অবতার
নিরেতে সব করবে সংহার
ছেরাজ সাই তাই কয় বারেবার
দেকরে লালন আপ্তত্তে বশে ॥

[১।৪৪] : ২৫ ধরো চোর হাওার ঘরে ফান্দ পেতে।
সে কি সামান্ত চোরা ধরবি কোনা কাঞ্চীতে ॥
পাতালে চোরের বহর
দেখায় আচমানের উপর
তিন তারে কোরেচে খবর
হাওা মুল ধর তাতে ॥
কোথা ঘর কি বাসোনা
কে জানে ঠিক ঠেকে না
হাওায় তার বারামখানা
শুভ ২ জোগ মতে ॥
চোর ধোরে রাকবি জদি
ঝিদ গারদ কোরগে খাটী

নালন কয় নাটী দটী
থেকতে কি শে তেয় ছুতে ॥

[১।৪৫] : ২৫ আজব আএনা মহল মনি গোভিরে।
সেতা সদত বিরাজে সাইজি মেরে ॥
পূর্বদিগে রতন বেঁদি
তাহারো উপরে খেলচে জতি
[তারে জে দেখেচে]
তারে জে দেখেচে ভাগ্‌গ গতি
সে জোন স্বচেতোন সব খবরে ॥
জলের ভিতরে শুকন জমি
১৮ মকামে তাই কাএমি
নিস্বদে স্বদের উদ্গামি
সে মকামের খবর জেনগে জারে ॥
মনিপুরের হাটে মনহারি কল
তেহাটা ত্রিরপিনি তাহে বাকা নীল
মাকড়ার আসে বন্দী সে জল
নালন বলে সঙ্গী বুজবে ফেরে ॥

[১।৪৬] : ২৬ মন চোরারে ধরবি জদি মন
ফাঁদ পাতো আজ তিরপিণে।
আমাবস্ত পুন্নিমাতে বারামখানা সেইখানে ॥
ত্তিরপিনের তিরধারা বয়
তার ধারা চিনে ধর্ত্তে পার্ল্য হয়
কোন ধারায় তার সদায় বেহার
হচ্চে ভাবের ভুবানে ॥
সামান্ত কি জাএ তারে ধরা
আট পহরি দিতে হয় পারা
কথন এশে ধারায় মেশে
কথন রএ নির্জ্জনে ॥
শুক্লপক্ষে বেমায়াতে গমন
কিষ্ট পক্ষে জাএ নিজ ভুবন

সাই লালন বলে সেরূপ নিলে
দিব্বগ্যানি সেই জানে ॥

[১।৪৭] : ২৬ রং মহলে সিদ কাটে সদায়
জানি কোথা সে চোরের বাড়ি।
পেলে তারে কয়াদ করে
পাএ দিতাম মনবেড়ি ॥
সিং দরজাএ চৌকিদার একজোন
অহনিসি আচে সে চেতোন
কিরূপ তারে ভিব্কী মেরে
চুরি করে কোন ঘোড়ি ॥
ঘর বেড়িএ সোলো জোন ছেপাই
তার এক ২ জোনার গুনের সীমা নাই
তারাও চোরের না পেলে টের
কার হাতে দিবে দড়ি ॥
পিক্তি ধোন আজ সব নিলো লুটে
নিংটী ঝাড়া কল্য আ.ারে
নালন বলে একোই কালে
চোরের হলো কি আড়ি ॥

[১।৪৯] : ২৭ হাএ একি কলের ঘরখানি বেন্দে
সদায় বিরাজ করে মাহ আমার।
দেখবি জদি সে কুদরতি
দেল দরিয়ার খবর কর ॥
জলের জোড়া সকল সেই ঘরে
তার খুটীর গোড়া সর্প্প'র উপরে
সর্প্প ভরে সন্দী কোরে
চার জগে আছে অধর ॥
তিল পরিমাণ জাএগা বলা
জায় সতো ২ কুঠরি কোঠা তার
ও তার নিচে উপর নএটা দুয়ার
নয় ভাবে সাই দিচ্ছে বার ॥

ঘরের মালেক আছে বর্ত্তমান একজোন
তারে দেখলি নারে দেখবি আর কখন
ছেরাজ সাই কএ লালন তোমার
বলব কি সাইর কিত্তি আর ।।

[১।৫৪] : ৩০ আপন ঘরের খবর লেনা।
অনাশে দেখতে পাবি
কোনখানে কার বারামখানা ॥
কোমল ফোটা কারে বলি
কোন মাকাম তার কোথাএ গোলি
কোন সামাএ পোড়ে ফুলি
মদু খাএ সে ওলি জোনা ॥
ওন্য গ্যান জার সর্ক্ষ মর্ক্ষ
সাদোকের উপলক্য
অপরূপ তার র্বেক্ষ
দেখলে চক্ষের পাপ থাকে না ॥
শুস্ক নদির শুক সরবর
তিলে তিলে হয় গো সাতার
লালন কএ কিত্তি কর্মার
কি কারখানা ॥

[১।৬৫] : ৩৫ সে করণ সিদ্দী করা সামান্য কি হয় ॥
গরল হৈতে শুদা বিতে আস্তো সে প্রাণ জায় ॥
সাপার কাছে নাচাএ বেঙ্গা
সে বড় আজব রোঙ্গা
রোশীক জদি হয় শে খোঙ্গা
ওমনি ধরে জাএ ॥
ধর তারির গুন সিকিলে
তাই কি মানে রূপের কালে
সেগুন তার উলটাএ ফেলে
মস্তোকে তংসায় ॥

একান্তো জে অনুরাগি
জেন্তে মরা ভয় তেগি
লালন কয় সে রশীক জগি
আমার কর্জ্জ নয় ॥*

[১৬৭] : ৩৬ তিন দিনের তিন মরম জেনে।
রশীক সাদলে ধরে তা একদিনে ॥
অকৈতাপ সে ভেদের কতা
কৈতে মর্মে লাগে বেথা
আবার না কৈলে জিবেরো নাহিকো নিস্তারো
কয় সেই জন্য ॥
তিন সো সাইট রশের মাঝার
তিন রষ গর্ম্ম হয় রসিকার
সাদিলে সে করন এড়াইবে
সমন এ ভুবানে ॥
অমাবশ্য প্রীতিবতো
দুতি আর প্রথমে সে তো
ওধিন লালন বলে তাহি কার আগামন
সেহি জোগের সোনে ॥

[১৬৮] : ৩৭ চারটী চন্দ্র ভাবের ভুবানে।
ও তার দুটী চন্দ্র প্রকাশ্য হয়
তাই জানে অনেক জোনে ॥
জে জানে শে চন্দ্র ভেদ কথা
বোলব কি তার ভক্তির ক্ষেমতা,
সে চাঁদ ধোরে পায় চাঁদ অন্নসোন
জে চাঁদ না কেউ পায় গুণে ॥
এক চন্দ্রে ৪ চার চন্দ্র মিশে রয়,
ক্ষেনেক ২ বিভিন্ন রূপ, [হয়]
ওশে মনি কোঠার খবর জেনগে
সকল খবর সেই জানে ॥

এই গানটির সঙ্গে ২ নং খাতার ১৫৩ নং গানের সাদৃশ্য থাকায় সেটি বর্জ্জিত হলো।

ধরতে মল চন্দ্র কোন জোন
গরল চন্দ্রের কর অন্তসোন
দরবেষ ছেরাজ সাই কয় দেখ রে নালন
বিসাত্রেতে মিলনে ॥

[১।৭০] : ৩৮ দিনের ভাব জেহি ধারা,
আছে সাদু সাস্ত্রে তার প্রমাণ
আছে মনস্ত রে জীবন
ওমণি হয় সারা ॥
ও সে মরার সংঙ্গে মরে
ভাবেরো সাগোরে
ডুবতে জোদি পারে
সাভাবিক তারা ॥
অগ্নী জৈচে ঢাকা ভস্যের ভিতরে
শুধা ওগ্নী আছে গরলে ছল কোরে
ও কেউ শুদার লোভে জেএ মরে গরল খেয়ে
মনথনের শুতার না জানে জারা ॥
দুগ্দেতে পানিতে মিলন সর্ব্বদা
মনথন দণ্ডে করে আলাদা ২
মনরে ওগ্নী ভাবে ভাবে
শুদা নিধি পাবে
মুখের কথা নয় রে সেভাব করা ॥
জে স্তোনেতে দগ্ দু খাএরে সিশু ছেলে,
জোথের মুখে সেতা রকতো এসে মেলে
ওখিন নালন বলে বিচার কোরিলে
কুরসে শুরসো মেলে সেই ধারা ॥

[১।৭৪] : ৪১ একি আজগবি এক ফুল
ও তার কোথা ব্রেক্ষ কোথায় আছে রে মূল ॥
ফুটেচে ফুল মান সরবর,
সপ্ত গোকায় ভেমরা তার,

কখন মিলন হয় রে দোহার

রোশীক হলে জানা জাএরে স্থুল ॥

ভূবিন্দু নাই সে ফুলে,

মদুকর কেমনে খেলে

পড়ো সহজ প্রেম ইস্কুলে

জ্ঞ্যানের উদায় হবে জাবে ভুল ॥

স্বনি শুকল এরা দূজোন

সে ফুলে হইলো শের্জন

সিরাজ সাই বলে রে নালন

ফ্ুলের ভেমর কে তা কোরগে উল ॥

[১।১০১] : ৫৫ আমাবস্য দিনে চন্দ্র থাকেন জেয়ে কোন সহরে।

প্রতিবদে হয় সে উদায় দিষ্ট হয় না কেনে তারে ॥

মাশে ২ চান্দের উদায়

আমাবস্য মাষ অস্তে হয়

ভুর্জ্জের আমাবস্য নির্নয়

জেন্তে হবে নেহাজ করে ॥

সোলো কলা হইলে সসি

তবে তো হয় পুর্নমাশী

১৫রোই পুর্ন্নিমা কিশী

পণ্ডিতেরা কয় সংসারে ॥

জেন্তে পারে দেখে চন্দ্র

সর্গ চন্দ্রের পায় সে খবোর

ছেরাজ সাই কয় নালন রে

তোর মুল হারালি কোলের ঘোরে ॥

[১।১০৫] : ৫৭ রূপেরো তুলনা রূপে।

ফনি মনি সদামীনি কি আর তার কাছে সোভে ॥

জে দেখেচে সেই অটল রূপ

বাগ নাহি মেরেচে রে চুব

পার হোলো সে এ ভবকুপ

রূপের মালা হিদয় জপে ॥

আমি বিন্দে বুর্দ্দা হানি
ভজন সাদন নাহি জানি
বোলবো কিশে রূপ বাখানি
মন মহিনির মন জাতে কল্লে ॥
বেদে নাই সে রূপের খবর
কিবল শুর্দ্দ নামে বিভোর
ছেরাজ সাই কয় নালন বেত্তোর
নিজ রূপে রূপ দেখ সংখ্যাপে ॥

[১।১১৮] : ৬৪ কি বা রূপের ঝলক দিচ্চে দিদলে।
সে রূপ দেখলে নওন জাএ ভুলে ॥
ফনি মনি সদামিনি জিনি
এরূপ উজ্জলে ॥
অস্তী চর্ম্মর সস্ত রূপ
আছে মহা রশের কুপ
বেগে ঢেউ খেলে
তার এক বিন্দু অপার সিন্দু
হয় রে এ ভুমণ্ডলে ॥
দেহেরো দলপর্দ্দ জার
উপাসনা নাই জার,
কোথা কি মেলে তর্ত্তো বের্ত্ত
জার জন্ম এই দেহে
তার সব নিলে ॥
রশীক জারা সচেত্তোন
রসরতি টেনে উজন
রূপ উদায় পেলে।
নালন গোড়া নেঙ্গটী এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ বলে ॥

[১।১১২] : ৬৬ চেএ দেখনা রে মন দির্ব্ব নজরে।
চারিচাঁদ দিচ্চে ঝলক মনি কোটার ঘরে ॥

হলে সেই চান্দের সাদোন
অধার চাঁদ পায় দরসোন
পাএরে চাঁন্দেতে চাঁন্দের আসন
রেকেচে ফিকিরে ।।
চাঁন্দে চাঁদ ঢাকা দেওা
চাঁন্দে দেয় চান্দের খেওা
দেখ রে জমিনেতে ফলচে মেওা
চাঁন্দের শুদা ঝরে ।।
নওন চাঁন্দ প্রর্সয় জার
সকল চাঁদ হয় গো নেহার
ভারে নালন বলে বিপদ আমার
গুরু চাঁদ ভুলে রে ।।

[১।১২৩] : ৬৭, ৬৮ নিচে পর্দ্দ চরক বানে জুগল মিলন চাঁদ চকোরা।
স্বজ্জেরো শুসংঙ্গে কোমল কিরূপ হয় প্রেম জুগল
জান না মন হোলি ক্রিবল কামাবেশে মাতোয়ারা ।।
স্ত্রীলিঙ্গ পুলিঙ্গ নাহি [নাহি]
লপুংসক সেহি
জে লিঙ্গ ব্রে´ম্মাণ্ডের উপর
কি দিবো তুলনা তাহার
রোসিক জোনা জেনচে এবার
অরশীকের চমতকারা ।।
সামরর্থারে পূ´র্ন জেনে
বশে আছো সেই গুমানে
জে রতিতে জর্ম্মে´ মতি
সে রতির কেমন আক্রিতি
জারে বলে শুধার পতি
স্ত্রীলোকেরো সেই নেহারা ।।
সনি স্বন্দল চম্পকলি
কোন স্বরূপ কাহারে বলি

ব্রেক্ষ রত্তির কর নিরাপন
চম্পক কলির ওলি জে জোন
ভাব অনুসার কহে লালন
কিসে জাবে তারে ধরা ॥

[১।১২৪] ৬৭ চাঁন্দে চাঁন্দে চন্দ্রগ্রহণ হয়।
সে জোগেরে উদ্দীশসন জানে সেই সে মহাশয় ॥
চাঁন্দ রাহু চাঁন্দেরী গ্রহণ
সে বড়ো করণ কারণ
বেদ পড়ে তার ভেদ নিরাপন
পাইবে কোথায় ॥
উভয় জেনো বেন্মুক থাকে
মাশঅন্তে শুদিষ্টী দেখে
মহাজোগ তার গ্রহণ জোগে
ওড়া বলতে লাগে ভয় ॥
কখন রাহু রূপ ধরে
কোন চাঁন্দে কোন চাঁদ দেখে রে
নালন বলে স্বরূপ দারে
জেনলে জানা জায় ॥

[২।৩৬] : ২০ মন আমার কি ছার গৌরব কোরচো ভবে।
দেখ না রে সব হাওার খেলা
বন্দো হইতে দের কি হবে ॥
থেকতে হাওা হাও খানা
মওলা বলে ডাক রসোনা
মহাকাল বোসেছে রানায়
কখন জানি কু ঘটাবে ॥
বন্দো হইলে এ হাওাটী
মাটীর দেহো হবে মাটী
দেখে শুনে হও না খাটী
কে তোরে কতোই বুজাবে ॥

ভবে আশার অগ্রে তখন
বোলেছিলে কোরবো সাদোন
লালন বলে সে কথা মন:
ভুলেছো এই ভবার লোভে ॥

[২।৪৭] : ২৬ দেকলাম কি কুদরতি ময়।
বিনে বিছে আজগবি গাচ চাঁদ ধোরেচে তায় ॥
নাই সে গাছের আগা গোড়া
সর্ন ভরে আছে থাড়া
ফুল ধরে তার ফলটী ছাড়া
দেখে ধান্দা হয় ॥
বৈলবো কি শেই গাছের কথা
ফুলে মধু ফলে শুদা
সৈরবেতে হরে খুদা
দরিদ্রতা জায় ॥
জেনলে গাছের অর্থবানি
চেতোন বটে সেহি ধুনি
শুরু বলে তারে মানি
লালন ফকির কয় ॥

[২।৫১] : ২৮ আই হারালি আমাবতি না মেনে।
ও তোর হয় না সোবুর এগদিনে ॥
হোলো আমাবত্তির বার
মাটী রশে শরোবর
[মাটী রশে শরোবর]
সাদ শুরু বোষ্টম তিনে
উদায় সে রশের সোনে ॥
তুই খোতনা চাসা ভাই
ওতোর জ্ঞান কিছুই নাই
[রে তোর জ্ঞান কিছুই নাই]
এবার আমাবস্তে প্রতিবাতে
হাল বয়ে কাল হও কেনে ॥

জে জোন বসীক চাসা হয়
ও সে জোগ বুজে হাল বএ
[রে শে জোগ বুজে হাল বএ]
এবার নালন ফকির পাএনা ফিকির
হাপুর হুপুর ভুই বোনে ॥

[২।৫৫] : ৩০ হুজুরে কার হবে রে নিকাশ দেনা।
পঞ্চজন আছে ঘরে বেয়াদার তার সোলোজোনা ॥
খেতি জল ও বাই হুতাসনে
জে বোস্ত যার সেই সেখানে
মিসাতা আকাশে মিশেপ্ আকাশ
জানা গেলো পঞ্চবেনা ॥
মুনসী মৌলবির কাছে
জনম ভোর গুদায় এসে
ঘোর গেলো না।
পরে নেয় পরের খবোর
নিজের খবোর নিজে হয় না ॥
আওা কওা কারে বলি
কোন মকাম তার কোথা গলি
আনাজানা সেই মহলে
নালন কোন জোন তাও নালনের
ঠিক হোলো না ॥

[২।৫৬] : ৩১ দেখোরে দিনরোজনি কোথা হইতে হয়।
কোন পাকে দিন আশে ঘুরে
কোন পাকে রজনি জাএ ॥
রাত্র দিনের খবোর নাইরে জার
কিশের একটা উপসোনা তার
নাম গোওলা কাজি ভর্জন.
ফকিরি তার তন্নী প্রায় ॥

কএ দোমে দিন চালাচ্চে বারি
কয় দোমে রজোনি আখিরি
আপো [ন] ঘরের নিকাশ করে
জে জানে যে মহাশয় ॥
বাইরি খুজে কে জাবে জানা
কারিগরের কি বাগুন পানা
ওধিন লালন বলে তিনটী তারে
অনাস্তো রূপ কল খাটায় ॥

[২।৬৯] : ৩৭ আব হায়াতের নদি কো[ন] খানে।
আগে জেন্দা পিরের খান্দানে
জা ও দেখিএ দিবে সন্দানে ॥
সেই নদির পিচোল ঘাটায়
চাঁদ কোটালে খেলচে রে ভাটা
দিন দুনিয়া জোড়া একটী
মিন আছে তার মাজখানে ।
মওলার মহিমা রে এমী
ও সে নদিতে বএ অম্রেতো পানি
তার এক রতি পরশে শনি
অমর হবে সেই জোনা ॥
আবহায়াতের মর্ম্ম জে জন পায়
উপসনা শীমা তাইরি হয়
ছেরাজ সাইর আদেশে
ওধীন লালন ফকির তাই ভনে ॥

[২।৭০] : ৩৮ তোরা দেখ না রে মন দির্ব্ব নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্চে ঝলক মনি কোটার ঘরে ॥
হলে সে চাঁদের সাধন
আধার চাঁদ হয় দরোসন
হয় রে ও সে চাঁদেতে চাঁদের আলোন
রেখেচে ফিকিরে ॥

চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওা
চাঁন্দে দেয় চাঁন্দের খেওা
দেওরে জমিনেতে ফোলচে মেওা
ঐ চাঁন্দের শুদা খোরে ॥
নওন চাঁদ প্রসন্ন্য জার
সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার [হয় রে]
ওধিন নালন বলে বিপদ আমার
গুরু চাঁদ ভুলে রে ॥

[২।৭১] ঃ ৩৮ মাএরে ভজিলে হয় শে বাপের ঠেকেনা।
নিগুর বিচারে সর্ত্ত গেলো তাই জানা ॥
পুরুশো পরওার দেগার
অঙ্গে ছিলো প্রীকিতি তার
প্রিকিতি প্রিকিতি সংসার
ছিষ্টি সব জোনা ॥
নিগুন খবর নাহি জেনে
কেবা শে মাএরে চেনে
জাহারো ভার দিন দোনিএ
দিলেন রর্ব্বানা ॥
ডিম্বু মধ্যে কে বা ছিলো
বের হোএ কারে দেখিলো
নালন কয় তার ভেদ জে পেলো
ঘুচলো দিন কানা ॥

[২।৭৩] ঃ ৩৯ আজু কোরছে সাই ব্রে মাণ্ডের উপর
শে রূপো নিলে
নরেকারে সেশে ছিলো
জে রূপ হালে ॥
নরেকারের গন্ত ভারি
আমি কি বুজতে পারি

কিঞ্চীত প্রমাণ তারি
সনি শুকুলে ॥[1]
আবিষ উৎলিএ নিরো
পড়িছে শে নরেকারে
ডিম্বরূপ হয় গো তারো
ছিষ্টীর ছলে ॥
আপন তর্তে আপ্নী কানা
মিছে করি পড়া সোনা
নালন বলে জাবে জানা
আপনারে চিনিলে ॥

[২।৭৫] : ৪০ সহরে সোলো জনা বোমবেটে।
কোরিএ পাগোল পারা নিলে তারা সব লুটে ॥
পাচ জোনা ধনি ছিলো
তারা সব ফতুর হলো
কারবারে ভঙ্গ দিলো
কখন জানি জায় উঠে ॥
রাজ্জেশ্বর রাজা জিনি
চোরেরো শীরোমণি
নালিষ করিবো আমি
কোনখানে কার নকটে ॥
গেল গেলো ধোনমানো নামায়
খালি ঘর দেখি জমায়
নালন কয় খাজনারো দায়
তাও কবে জাএ লাটে।

[২।৭৬] : ৪২ দেখ না এবার আপনারো ঘর ঠাউরিএ।
আখির কোনায় প [া] খির বাসা
জাএ আশে হাতের কাজ দিএ ॥

১ শুনি শু কুকলে

সবেতে পাখি একটা
শহস্র কুটরি কোটা
আছে আড়া পাতিএ
নিগুমে তার মুন একটী ঘর
অচিন হয়-সে তা জেএ ॥
ঘরের আএনা আটা
চৌপাশে মাজানে প [া] কি বাশে
আছে আনান্দীত হোএ।
তোরা দেখনা রে ভাই
ধরার জো নাই
সামান্ত হাত বাড়িএ ॥
কেউ দেখতে জদি সাদ করো
সোন্দানি চিনে ধরো
দিবে দেখাএ ।
ছেরাজ সাই কয় নালন তোমার
বোজাতে দিন জাএ বএ ॥

[২।৮৬] : ৪৬ জে দিন ডিম্ব ভরে ভেশে ছিলো সাই ।
সেদিন কে হলো তার সঙ্গী কাহারে শুদাই ॥
পয়ার রূপ ধরি এশে
দেখা দিলো ঢেউতে ভেসে
কি নাম তারো না পাই দিশে
আগোমে ইসারায় বলে কহে তাই।
ছিষ্টী না করিল জখোন
কে ছিলো তার আগে তখন
সস্তে অসোমভাব শে বচোন
একেয়ো কুদরতে দুজনা তারাই ॥
তারে না চিনিতে পারি
অধার কেমনে ধরি
নালন বলে সেই জে হুরি
খোদায় ছোটো নবির বড়ো কেহো কয় ॥

[২।৮৭] : ৪৬ এ বড়ো আজব কুদরতি।
আঠারো মকামের মাঝে জলচে একটি রূপের বাতি ॥
কি বা রে কুদরতি খেলা
জলের মাঝে ওগ্নী জালা
খবোর জেন্তে হয় নিরালা
নিরে ঘিরে আচে জাতি ॥
ছনি মণি লাল জহরে
সে বাতি রেখেচে ঘিরে
তিন সমাএ তিন জোগ সেই ঘরে
জে জানে সে মহারতি ॥
থেকতে বাতি উজালাময়
দেখতে জার বাসোনা হৃিদয়
লালন কয় কখন কোন সমাএ
অন্দোকার হবে বসতি ॥

[২।১২১] : ৬৪ নরেকারে ভেশচে রে এক ফুল।
বিদি বিষ্ট হর আদি পুরন্দর
আদের সে ফুল হয় মাত্রীকুল ॥
বোলবো কি সে ফুলের গুন বিচার
পঞ্চমুখে সিমা দিতে নারে হর
জারে বলি মুলাধার সেওতো অধর
ফুলে আছে ধরা চোর গুমাতুল ॥
নিলে নিও পাত্রস্থীতো সে ফুলে
সাদকের মুল বস্তু এ ভুমণ্ডলে
সে জে বেদের অগোচোর সে ফুলের নাগর
সাদু জনা ভেবে কোরেছে উল ॥
কোথাএ বের্ক্ষ হা রে কোথায় রে তার ডাল
তরংগে পড়ে ফুল ভেষচে চিরোকাল
সে জে যখন এশে ওলি মধু খাএ সে ফুলি
লালন বলে চেতে গেলে দেয় ভুল ॥

[২।১২৪] : ৬৬ এক ফুলে চার রেংগ ধরেচে।
ও সে ভাব নগর ফুলে কি আজব সোভা করেচে ॥
কারন বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একুল ওকুল
সেত বরন এক ভ্রেমর বোকুল
সে ফুলে মধুর আসে ॥
মুল ছাড়া সে ফুলের নতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা।
একবড়ো অকৈতপ কথা
কে পেয় ভাবে কৈ কার কাছে ॥
ডুবে দেখ মন দেল দরিয়াএ
জে ফুলে নবির জর্ম হয়
সে ফুল তো সামান্ত ফুল নয়
লালন কয় জার মুল নাই দেশে ॥

[২।১৩৬] : ৭২ কোন রাগে মানুষ আছে মহারসের ধনি।
পর্দ্দে মধু চন্দ্রে শুদা জোগাএ রাত্র দিনি ॥
সাদক সিদ্ধী প্রবর্ত্তস্ত
তিন রাগ ধরে আছে তিনজন
এ তিন ছাড়া রাগ নিরাপন
জেনলে হয় ভাবি নি ॥
ম্রেনাল গতি রশের খেলা
নব ঘাট নব ঘেটেলা
দষমে জোগ বারি গোলা
জোগেশ্বর অজনি ॥
ছেরাজ সাইর আদেশে
লালন বলচে বানি সোন রে মর্দ্দ
ঘুরতে হবে নাগোর দলন ;
না জেনে মন বানি ॥

[২।১৪০] : ৭৫ রূপের ঘরে অটল রূপ বেহার চেঞে দেখ না তোরা ॥
ফনি মনি জিনি রূপেরো বাখানি,
 দুইরূপে আছে সেই রূপ ছলকরা ॥
 জে জোন ওনুরাগী হয়
 রাগে[র] দেশে জাএ
রাগের তালা খুলে সেরূপ দেখতে পায়।
রাগোরি করন বিধি বিস্বরণ
 নির্ত্ত নিলের উপর রাগ নেহারা ॥
ওসে অটল রূপ সাই ভেবে দেখো তাই
সে রূপেরো কভু নিলে নিত্ত নাই
জে জোন পঞ্চতত্ত ভজে নিলেরূপে মজে,
 সে কি জানে অটল রূপ কি ধারা ॥
আছে রূপের দরজাএ ছিরূপ মহাশয়
রূপের তালা ছোড়ান তার হাতে সদায়
জে জোন্ ছিরূপ গতো হবে তালার ছোড়ান পাবে
 ওধীন [নালন] বলে অধর ধোরবে তারা ॥

[২।১৪৩] : ৭৮ খেলচে মানুষ নিরে থিরে।
আপন২ ঘর বোজো মন আমার
 কেনে হেতড়ে বেড়াও কোলের ঘোরে ॥
সর্ন মেঘের উদায়
নিরদ বিন্দু বরিসন তায়
তাতে ফোলচে ফল রংবিরং হাল
 আজব কুদরতি কল ভাবের ঘরে ॥
নির নদি গোভিরে ডোবা কঠিন হয়
ডুবগে কতো আজব দেখা জাএ
ওশে নিরভাণ্ডো পোরা ব্রেহ্মাণ্ডো
 কাণ্ডো বলতে আমার নওন ঘোরে ॥
ইন্দ্রডাক্কা নাহি সে রাজ্জে
সহজ ধারা ফেরে সহজে

ছিরাজ সাইর চরন মিথ্যে নয়
নালন এগবার ডুব দিএ্‌ দেখ-স্বরূপ দারে ॥

[২।১৪৫] : ৭৯ ভমজে করো ফকিরি মন রে।
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি ঘোরে ত়ারে ॥
ওগ্নী জৈছে ভর্শে ঢাকা
শুধা তন্নী গরল মাখা
মৈথন দণ্ডে জাবে দেখা
বিভিন্ন কোরে ॥
বিসাম্রত আছে মিলন
জেন্তে হয় তার কি রূপর্সাদন
দেখো জন গরল ভর্ক্ষন
করো না হা রে ॥
কবার কল্য আসা যাওয়া
নিরাপন কি রেকলে তাহা
নালন বলে কে দেয় খেওা
ভবো মাজারে ॥

[২।১৫০] : ৮২ সে কথা কি কবার কথা জানিতে হয় ভাবাদেশে ॥
আমাবস্য পুর্নশশী পুর্ণিমাতে আমাবস্য ॥
আমাবস্য পুর্ণিমার জোগ
আজব সম্ভোব সম্ভোগ
জল্যে থণ্ডে এ ভবো রোগ
গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥
রবি শশী রএ বেমুখা
মাশ অন্তে হয় একদিন দেখা
সেই জোগের জোগ লেক্ষা
সেদলে সিদ্ধী হয় অনাশে ॥
দেবাকার নেশাকার সদায়
উভয় অঙ্গে উভয় লুকায়

এসারাতে ছেরাছ শাই কয়
নালন ভেড়ের হয় না দিশে ॥

[২।১৫১] : ৮৩ সে ভাব উদায় না হোলে
কে পাবে শে অধার চান্দের বারাম কোনখানে ॥
ডাঙ্গাতে পাতিএ আশন
জলে রএ তার ক্লিতি এমন
বেদে কি তার পাএ অর্ন্যাসন
রাগের পত ভুলে ॥
ঘর ছেড়োছো নেচ্‌তে বাসা
অ পতে তার জাওা আশা
না জেনে তার ভেদ খোলোসা
কথা কি মেলে ॥
জলে জমন চাঁদ দেখা জায়
ধরতে গেলে হাতে কে পাএ
নার্লন ওমী সাদন দ্বারায়
পলো গোলমালে ॥

[২।১৫২] : ৮৩ বিসাত্রতো আছে রে মাকাচোকা।
কে বা সোনে কে বা বাজাএ
জাএ না জিবের দেল ধোকা ॥
বিকার জার সাস্তো হোলো
রিদ কোমল তার সদায় আলো
জথায় মন্দ তথায় ভালো
অবশ্য শে পাএ দেখা।
মাএর জমন সিশু ছেলে
দুদ্দা, খাএ তার দুগ্দ মেলে
সে এই আগাতে জোক লাগিলে
রক্ত দেখো পাত্র জোকা ॥
হোলে আপন দেহের নির্ন্নয়
সব খবরে জবর সে হয়

লালন তোমার মুক সরল নয়

মন বেকা ॥

ইসলামী

[১।১] : ১ দেখ রে আমার রছুল জার কাণ্ডারি এই ভবে ।
ভাব নদির তুফানে তার কি লোক[ও] ডোবে ॥

ভুল না মন কারু ধোকাএ
চড় [জ] সে তোরিকার লৌকায়
বেসম ঘোর তুফানের দাএ

বাচবি তবে ॥

তরিকরে লৌকাখানি
এক্স [স্ক] নাম তার বলায় শুনি
বিনে বাওয়ায় চোলচে ওমনি

রাত্র দিবে ॥

সে লৌকাতে জে না চড়ি
কেমনে দিবো ভবো পাড়ি
লালন বলে এহি ঘড়ি

দেখ মন ভেবে ॥

[১।২] : ১ মদিনায় রছুল নামে কে এলো ভাই ।
কায়াধারি হোএ কেনে তার ছায়া নাই ।

কি দিবো তুলনা তারি
খুজে পাইনে এ সংসারে
মেঘে জারো ছায়া ধরে

ধুপের সামাএ ॥

ছায়াহিন জাহারো কায়া
ত্রিভুবনে তারো ছায়া
এ কথার মর্ম নওা

ওবস্ত চাই ॥

কায়ার সরির ছায়া দেখি
আর নাই সে না সরিকি

লালন বলে তাও ওহকি
বোলতে ডরাই ॥

[১১৩] : ২ নবি না চিনে কি অল্যা পাবে।
নবি দিনের চাঁদ আজ দেখ না রে ভেবে ॥
জার নুরে হয় পয়াল সংসার
সেই আজ কলির ভাবে নবি পয়গম্বর
হাটের গোলমালে আমার
মন রে তারে চিল্যাম না তবে ॥
বাতুলের ঘরে নুর নবি
ও সে পুরুস কি প্রৌকিতি ছবি
পড়ো দেল কেতাব করোরে বিধান
মনের অন্দোকার জাবে ॥
বোঝা কটীন কুদরতো খেয়াল
আমার নবিজি গাচ সাইজি তারি ফল
সে ফল জে পাড়ো ঐ গাচে চড়ো
লালন কয় কাতোর ভাবে ॥

[১১৪] : ২ অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার
ভজোন সাদন ব্রেথা নবি না চিনে।
ও সে আওল অখের বাতুল জাহের
নবি কখন কিরূপ ধারোন করে কোনখানে ॥
আচমন জমিন জল
জল আদি পবোন
ছে নবির নুরে হয় শীজ্জন
বলো কি শে ছিলো সে নবির আসন
নবি পুরুস কি প্রৌকিতি আকার তখনে।
আল্যা নবি দুটী অবতার
গাছ বিচ জেরূপ দেখি জে প্রকার
তোমরা শুবুদ্দীতে করো হে বিচার
ও তার গাছ বড়ো কি [পৃ. ৩] ফলটি বড়ো লও জেনে।

আপ্ত তত্ত্বে ফাজিল জে-জোনা
জেন্তে পাএ সে নিগুড় কারখানা
হলো রছুল রূপে প্রকাশ রব্বানা
ওখিন লালন বলে দরবেষ ছেরাজ সাইর গুনে ॥

[১।৫] : ৩ ভবে কে তাহারে চিন্তে পারে।
এসে মদিনায় তরিফ জে জানালে এ সংসারে ॥
সবে বলে নবি নবি
নবি কি নিরাঞ্জন ভাবি
দেল ধুড়িলে জেন্তে পাবি
আহামদ নাম হলো কারে ॥
তার মর্ম সে না জদি কএ
কার সার্দ কে জানিতে পাএ
তাইতে আমার দিন দয়াময়
মানুষ রূপে ফেরে ঘোরে ॥
নফি এজবাত জে বোজে না
মিছে রে তার পড়া সোনা
লালন কএ ভেদ উপসোনা
না জেনে চটকে মারে ॥*

[১।৬] : ৩ মন কি এহাই ভাবো আল্যা পাবো
নবি না চিনে।
কারে বলিষ নবি দিসে পালিনে ॥
জার নুরে হয় আদম পয়দা
সে নবির তরিক জুদা
নুরেরো পেয়ালা খোদা
দিলেন তারে খোদ অঙ্গ জেনে ॥
বিচ মালেক সাই ত্রেক নবি
দেল ধুড়িলে জেন্তে পাবি

*এই গানটির একটি পাঠান্তর পাওয়া যাচ্ছে ১নং খাতার ৫৩ নং গানে।

আমি বোলবো কি সে ব্রেক্ষের খুবি
তার এক [পৃ. ৪] দিল আর ডালে দোলে ॥
চার কারের উপরে দেখো
রাগ পাত্রে সে ছিলো কেগো
পূবের পর তার খবর রাখো
তবে জানবি লালন নবির ভেদ মনে ॥

[১১৮] : ৫ নবি অঙ্গে জগত পয়দা হয়।
সেই জে আকার কি হলো তার কে করে নির্ণয় ॥
আব্দুল্যার ঘরে বলো
সেই নবির জর্ম্ম হলো
মূল দেহো তার কোথায় বোলো
শুধাবো কোথায় ॥
কিরূপে নবির জান সে
জুক্ত হয় বাপের বিজে
আবহায়াত জার নাম লেখেচে
হাওা নাই সেতায় ॥
এক জানে দুই কাএ ধরে
কেউ পুন্নি কেও পাপ করে
কি হবে তার রোজ হাসোরে
হিসাবের সমায় ॥
নবির ভেদ পাএ একান্তী
ঘুচে জার তার সব সন্দী
দিষ্ট হয় তার আলেক ফন্দী
লালন ফকির কয় ॥

[১১৯] : ৫ নবি না চিন্যে কিশে খোদার ভেদ পায়।
চিনিতে পালে যে খোদে সেই দয়াময় ॥
জেনবি পারেরো কাণ্ডার
জেন্দা সে চার জুগের উপার
হায়া তোল মরছলিম নাম জার
সেই জন্ত কয় ॥

কোন নবি হইল উম্মাত
কোন নবি বান্দারো হায়াত
নেহাজ করে জেনো নেহাত
জাবে সংসয় ॥
জে নবি আজ সংঙ্গে তোরো
চিনে মন তার দাওন ধরো
লালন বলে পারের কার
সাদ জদি হয়

[১১১০] : ৬ আএ গো জাই নবির দিনে।
দিনের ডাঙ্গ বাজে সদায় মাকাম দিনে ॥
তোরিক দিচে নবি জাহের বাতুলে
জথা জর্গ লাএকো জেনে,
ও সে রোজা আর নামাজ
ব্যেক্ত এহি কাজ
গোপ্ত পতো মেলে ভক্তি সন্দানে ॥
অমূল্য দোকান খুলেচে নবি
জে ধোন চাবি সে ধোন পাবি
বিনে কোড়ির ধোন সেদে দেয়
এখন না লইলে আখের পস্তাবি মনে ॥
নবির সংঙ্গে এয়ার ছিলো চারিজন
সুর নবি চারকে দিলে চার জাজোন
ওশে নবি বিনে পথে গোল
হোলো চার মতে
লালন বলে জেনো গোলে পড়িব নে ॥

[১১১১] : ৬ মনের ভাব বুজে নবি মর্ম খুলেচে।
কেউ টাকা দিল্যী হাতড়ে ফেরে
কেউ দেখে কাচে ॥
ছিনা আর ছাপিনার সানি
কাকাকাকি দিন রোজনি

ও কেউ দেখে মর্ত্ত কেহ মনে
আকার ধেএচে ।।
ছপানাএ সরারো কথা
জানাইলে জথা তথা
কারু ছিনায় ছিনায় ভেদ পুশীদা
বলিএ গিয়ে চে ।।
নবুওতে নিরাকার কয়
বিলাএতে বরজোক দেখাএ
ওধিন লালন পলো পূর্ন্ন ধোকায়
এ ভবো মাজে ।।

[১১১২]: ৭ নবির আএন বোজা সার্দ নাই ।
জার জমন বুদ্ধীতে আশে বলে তাই ।।
ভেস্তের লাএক আম্বক সবে
তাই শুনি হাদিচ কেতাবে
এমতো কথার হিসাবে
আমি ভেস্তের গৈরব কিশে জেন্তে পাই ।।
ঠকলে বলে আমরক বোকা
সেই আমরক পায় বেস্তে জাগা
এতো বড়ো পূর্ন্ন ধোকা
কে ঘোচাবে ধোকা কোথা জাই ।।
রোজা নামাজ ভেস্তের ভজন
তাই করে কি আম্বক সে জোন
বিনয় করে বলছে লালন
থেকতে পারে ভেদ মরশীদের ঠাই ।

[১১১৩]: ৭ একি আএন নবি কল্য জারি ।
পাচে মারা জাই আএন সাদ ভালা ভাবি ।।
সরিওত আর মারফত আদায়
নবির আএনে এই দুই হুকুম সদায়

সরা নবুওত বেলাএত
মারফত জেন্তে হয় রে গোভিরি ॥
নবুঅতে অদেখা খেয়ান আছে
বেলাএতে রূপে রো নিসনে
নজোর একদিগ জায় আরদিগ আন্দার হয়
দুইরূপ কিরূপ ঠিক করি ॥
সরাকে সরপোষ লেখা জায়
বস্তু মারফত সে ঢাকা আছে
তায় সরপোষ থুই তুলে
ওকি দেই ফেলে নালন বস্তুভিকারি ॥

[১৫৩] : ২৯ ভুল না মন কারো ভোলে।
রোছুলের দিন সত্ত মানো
ডাকো সদায় আল্লা বলে ॥
খোদা গুপ্ত মল সাদনা
রছুল বিনে কেউ জানে না
জাহের বাতুন উপাসনা
রাছুল হইতে প্রকাশীলে ॥
দেখাদেখি সাদিলে জোগ
বিপদ ঘটবে বাড়িবে রোগ
জে জোনা হয় শুর্দ্দ সাদক
নবির ফরমানে সে চলে ॥
অপরকে বুজাইতে তামাম
করে বছুল জাহেরা কাম
বাতুনে মসগুল মুদাম
কারু কারো জানাইলে ॥
জেরূপ মুরশীদ সেইরূপ রাছুল
জে ভেজে সে হবে মকবুল
ছেরাজ সাই কয় নালন কিরূপ পাবি
মুরসিদ না ভজিলে ॥

[১।৫৬] : ৩১ কে তাহারে চিন্তে পারে।
এসে মদিনায় তোরকি জে জানালে এ সংসারে ।।
সবে বলে নবি নবি
নবি কি নিরাঞ্জন ভাবি
দেল ধুড়িলে জেন্তে পাবি
আহাম্মদ নাম হলো কারে ।।
তার মর্ম সে না জদি কয়
কার শার্দ্দ কে জানিতে পায়
তাইতে আমার দিন দয়াময়
মানুষ রূপে ফেরে ঘোরে ।।
নকি এছবাত জে বোজে না
মিছেরে তার পড়া সোনা
লালন কয় ভেদ উপাসনা
না জেনে চটকে মারে ।।*

[১।৭৩] : ৪০ মেয়া রাজের কথা শুদাবো কারে।
আদোম তোমার নিরাকার মিথ্যে ফিকরে।।
নবি কি ছাড়িলো আদোম তোন
কিবা আদম রূপ হইলো নিরাঞ্জন,
কে বলিবে সে অন্বষণ
এ ওধিনেরে ।।
নওনে ২ বুকে বুক
উভায় মেলে হইএ কৌতুক
তবে জে দেখল না সাইর রূপ
নবির নজরে ।।
তুণ্ডে তুণ্ড করিলো কাহার
সেই কথাত্তি সন্তে চোমেৎকার
ছিরাজ সাই কয় লালন তোমার
বোজো গ্যান দারে ।।

১নং খাতার ৫নং গানটিকে এর পাঠান্তর হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

[১।৮২] ঃ ৪৬ কিশে আর বোজাই মন তোরে।
দেল মার্কার ভেদ না জেন্যা
তার হজ কিশে হয় রে॥
দেল মাক্কা খোদ কুদরতি কাম
খোদ খোদা দেয় তাতে বারাম
সেই জন্ন হয় দেল মার্কা নাম
সর্ব্ব সংসারে॥
এক দেল জারো জেয়ারত হয়
হাজার হজি তার তুল্য নয়
কেতাবেতে ছাপ লেখা জায়
তাই তে বলি রে॥
মানুসেরো মাক্কা গঠন
মানুসে তাই করে ভজোন
লালন কয় আদ মার্কা কেমন
চিনবি কবে রে॥

[১।৮৪] ঃ ৪৭ ধড়ে কোথায় মক্কা মদিনে চেএ দেখ নজরে।
ধড়ের খবর না জেন্যে ঘোর জাবে না কোন দিনে॥
ওহাদানি এতের বাহা
ভুল জদি মন করো তাহা
হুজুরেতে পত্ত পাবানা
ঘুরবি কতো ভুবানে॥
উপরওালা সদর বারি
অচিন দেশে তার কাচারি
সদাএ করে হকুম জারি
মাক্কায় বসে নিজ্জনে॥
চারি রাহে বারি মকবুল
ওহাদানিএতে রোছুল
ছেরাজ সাই কয় না জেনে উল
লালন তুই ঘুরিছ কেনে॥

[১।১১৩] : ৭২ আপন ছুরাতে আদম গটলে দয়াময়।
নইলে কি ফেরেস্তাকে ছেজদা দিতে কয়॥
আল্লা আদম না হলে
পাপ হোতো ছেজদা দিলে
সেরেক পাপ জারে বলে
এদিন দুনিয়াত॥
দুশে সে আদম ছপী
আজাজিল হোলো পাপী
মন তোমার লাপালাপী
তমী দেখা জাএ॥
আদমি শে চেনে আদম
পশু কি তার পাএ মরম
লালন কয় অর্দ্ধ ধরন
আদম চিন্ন্যে হয়॥

[১।১১৭] : ৭৪ রোছুলকে চিনিলে খোদা চেনা জায়।
রূপ ভাড়িএ দেখ বেড়িএ গেলেন সেহি দয়াময়॥
জর্ম্ম জার এই মানবে
ছায়া তার পোলো না ভোমে
দেখ দেখি ভায় বুদ্ধীমানে
কে আইলো মদিনায়॥
মাটে ঘাটে রোছুলেরে
মেঘে রইতো ছায়া ধরে
জেস্তে হয়তো নেহাজ কোরে
জিবেরো কি দর্জ্জা হয়॥
আহামদ নাম লিখিতে
মিম হরফ কয় নফি কর্ত্তে
ছেরাজ সাই কয় লালন তাতে
দেখরে কিঞ্চিত নজির দেয়॥

[১।১১৯] : ৬৫ দিবো রেন্তে থেকো সব যে বাহসারি।
রছুল বলে এ ছুনিয়া জেন খকমারি ॥
পড়িও আউজ বিদ্যা
জুরে জাবে লানোতুল্যা
মুরসীদ রূপ জে করে হেল্যা
শঙ্কা জাএ তারি ॥
জাহের কথা সব ছপীনা
গোপ্তো কথা দিলাম ছিনায়
এমনি রূপে তোমরা সবায়
দিও সব্বারি ॥
অসতো অভতো জোনা
তারে গোপ্তো ভেদ বলো না
বলিলে সে মানিবে না
কোরবে এঙ্কারি ॥
খলিফা আওলিয়া রোল
জে জা বোজে দিও বলে
নালন বলে রছুলের জে
নছিহৎ জারি ॥

[১।১২০] : ৬৫ তোমার মতো দয়াল বন্দু আর পাবো না।
দেখা দিএ ওহে রাছুল ছেড়ে জেও না ॥
তুমি হে খোদার দোস্ত
অপারের কাণ্ডার সর্ত্ত
তোমা বিনে পারের লর্ক
আর দেখা জাএ না ॥
আমরা সব মদিনা বাশি
ছিলাম জমন বোনবাশী।
তুমি এসে জ্ঞান পেএছি
আছি সান্তোনা ॥

আছমানি আএন দিএ
আমাদের সব এনলে য়াহে
আজ কি মদের ফাকি দিএ
তুমি পালাবা ॥
তোমা বিনে এরূপ সাসন
কে কোরবে আর দিনের কারণ
লালন বলে আর তো এমন
বাতি জলবে না ॥

[২।২৪]: ১৪ এমন দিন কি হবে রে আর।
খোদা সেই কোরে গেলো রছুল রূপে অবোতার ॥
আদোমের রূহ সেই
কেতাবে শুনিলাম তাই
নিষ্ঠা জার হোলো রে ভাই
মানুষ মুরশীদ কল্লো সার ॥
খোদ ছুরাতে পএদা আদম
এও জানা জায় ওতি মরম
আকার নাই তার ছুরাত কেমন
লোকে বোলিবে তাও আবার ॥
আহামদের নাম লেখিতে
মিমন কি কয় তার কিশেতে
ছেরাজ শাই কাএ লালন তাতে
কিঞ্চীত নজির দেখ এবার ॥

[২।৫০]: ২৭ কে বোজে মন মওলার আলেক বাজি।
কোরেচে রে কোরানের মানি
জা আশে জার মনের বুজি ॥
একই কোরান পড়াশোনা
কেউ মৌলবি কেউ মওলানা
দাহিরে হয় কতোজোনা
সে মানে না সরার কাজি ॥

রোজ কিয়ামত বলে সবায়
কেউ বলে না তারিখ নির্ণয়
হিসাব হবে কি হর্চ্ছে সদায়
কোন কথায় মন রাখি রাজি ॥
মলে জান ইল্লীন সিজ্জিন রয়
জতোদিন রোজ হিসাব না হয়
কেউ বলে জান ফিরে জর্মায়
তবে ইল্ল্যীন সিজ্জিন কোথায় আজি ॥
আরাক [পৃ. ২৮] বিধান সনিতে পাই
এক গোরো মানসের মউত নাই
সে অমরি কোন ভজোন রে ভাই
বোলচে লালন কারে পুছি ॥

[২।৫৩] : ২৯ জদি ফানার ফিকির জানা জাএ।
খোদারূপ ফানা কোরে খোদে খোদা হয় ॥
খোদারূপ খোদ কোরে ধারোন
অকৈথফ সে করোন কারোন
আই থাকিতে হৈলে মরন
ফানার তাইরি কয় ॥
একে ২ জেনে চেনা
কেরিতে হয় চার রূপ ফানা
এক রূপে করে ভাবো না
এড়াইবে সেই সমন দায় ॥
না জানিলে ফানার কোরোনি
করোন তার ঐ মির্থা জানি
ছেরাজ সাই কয় অর্থবানি
দেখরে লালন মজে মুরশীদের পায় ॥

[২।৫৪] : ৩০ অজান খবোর না জানিলে কিসেরো ফকিরি।
জে হুরে হুর নবি আমার তাহে আরোব বারি ॥

বোলবো কি সেই হুরের ধারা
হুরেতে হুর আছে ঘেরা
ধোরতে গেলে না জায় ধরা
জৈছেরে বিজরি ॥
মূল ধরের মূল সেহি হুর
হুরের ভেদ অকুল শুমদুর
জার হোএচে প্রেমের অংকুর
ঐ হুর ঝলক দিচ্চে তারি ॥
ছেরাজ শাই বলেরে নালন
কোরগে আপন দেহের বলন
হুরে নরে কোরে কোরে মিলন
ঐ রূপে থেকোরে নেহারি ॥

[২।৫৮] : ৩২ না হোলে মন সরোলা কি ফল মেলে কোথা খুড়ে।
হাতে হাতে বেড়াই মিছে তৌবা পড়ে ॥
মাক্কা মদিনায় জাবি ধাক্কা খাবি সর্ব্ব ঘরে,
হাজি নাম পারম লর্ব্ব তাই দেখিরে ॥
মনে জে পড়ে কালাম তাইরি শুনাম হুজুর বাড়ে
মন খাটী নয় বেন্দেনে কি হয় বোনে কুড়ে ॥
মন জার হোয়েচে খাটী
মুখে জদি গলোদ পড়ে
খোদা তারে নারাজ নএরে
নালন ভেড়ে ॥

[২।৫৯] : ৩২ মনে না দেখলে নেহাজ কোরে
মুখে পড়লে কি হয়।
মনের ঘোরে কেশের আড়ে
পাহাড় হুকায় ॥
আহম্মদ নামে হাদি
মিম হরফটী নফি রেখায়।

ওরে মিম গেলে শে কি হয় দেখো
পড়ুয়া সবায় ॥
আহাদ আর আহামদের
একলা এক শে মর্ম কে পায় ।
আকার ছেড়ে নিরাকারে
শে জদা কি দেয় ॥
জানাতে ভজোন কথা
তাইতে খোদা ওলিরূপ হয় ।
লালন গেলো খোলায় পড়ে
দাহারি আর স্বয় ॥

[২।৬৪] : ৩৫ আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা ।
আহামদ আর আহাদ নামের
বিচার হোলে জাএ জানা ॥
খুদিতে বান্দার দেহে
খোদা সে লুকাইএ
আহাদে মিম বসাএ
আহামদ হোলে শে না ॥
আহামদ নামে দেখি
মিম হরোফ লেখে নফি
মিম গেলে আহাদ বাকি
আহামদ নাম থাকে না ॥
এই পদের অর্থ ধুড়ে
কারো গ্যান বোশপে ধড়ে
কেউ কবে লালন ভেড়ে
ফাকড়াম সই বোজে না ॥

[২।৬৫] : ৩৫ ও দুটী নুরের ভেদ বিচার জানা উচিত বটে ।
নবি জি আর নিরূপ খোদা
নুর সে কি প্রকার ॥

নবির জেন আকার ছিলো
তাহাতে হুর চোওায় বলো
নিরাকারে কি প্রকারে
হুর চোয়াএ খোদার ॥
আকার বলিতে খোদা
সরাতে নিশেদ সদা
আকার বিনে হুর চোওানে
প্রমাণ কি গো তার ॥
জাত এলাহি ছিলো জুতে
কিরূপে এলো ছিফাতে
লালন বলে হুর চিনিলে
যে তো ঘোর আন্দার ॥

[২।৭৬] : ৪১ নজোর এগদিগ গেলে আর দিগে অন্দোকার হয় ।
হুরে নরে ছুটী নিহার কেমনে ঠিক রাখা জায় ॥
আইন জারি জগত জোড়া
ছেজদা হারাম খোদা ছাড়া
মুরশীদ বরজোক ছামনে বেড়া
কোথা থুই ছেজদার সমায় ॥
সোগোনো রাবেতা বলে
বরজোকো লেখে দলিলে
কারে রাখি কারে ফেলি
একমনে দুই কই দাড়ায় ॥
বেলাএতের হলে বিচার
ঘুচে জেতো ঘোর অন্দকার
লালন বলে এধার ওধার
দো ধারাতে খাবি খায় ॥

[২।৮২] : ৪৪ খাকি আদমের ভেদ সে ভেদ পশু কি বোজে ।
আদম কালেরে খোদা খোদে বিরাজে ॥

আলেফ আল্যাজি মিম মানে
নবি নামের হয় দুই মনে,
ও তার এক মানে হয় স্বরায় প্রচার
আর মানে মারফতে ॥
দরমি আনে লাম আছে ডানে বাম
আলেক মিম দুজনে,
অমন গাচ বিচ অংকুর
এই মতো ঘুর না পারি বুজিতে ॥
ইসারা লিখন কোরানেরি মান
হিসাব কর দেহেতে
তবে পাবি লালন সব অন্যসন
ঘুরিষ নে ঘুরপাকে ॥

[২।১১৭] : ৬২ পড়রে দাএমি নামাজ এদিন হলো আখিরি।
মাশুক রূপ রিদয় রেখে
দেখ আশক বাতি জেলে
কিবা সকাল কি বৈকালে
দাএমির নাই অবধারি ॥
কে কায়া আএনি জিন্নি
এহো ফরজ জাত নিসানি
দামি ফরজো আদাএ জে করে
তার নাই জেতের ভয়
জাত এলাহি ভাবে সদায়
মিশাইএ জাতের নুরি ॥
ছালাকেরো বার্জ্জপানা
মজ্জবি আসক দেও না
আশকে দেল করে ফানা
মাশুক বৈ অন্ত জানে না
আশা ঝুলি লএ সে না
মাশুকের চরণ ভিকারি ॥
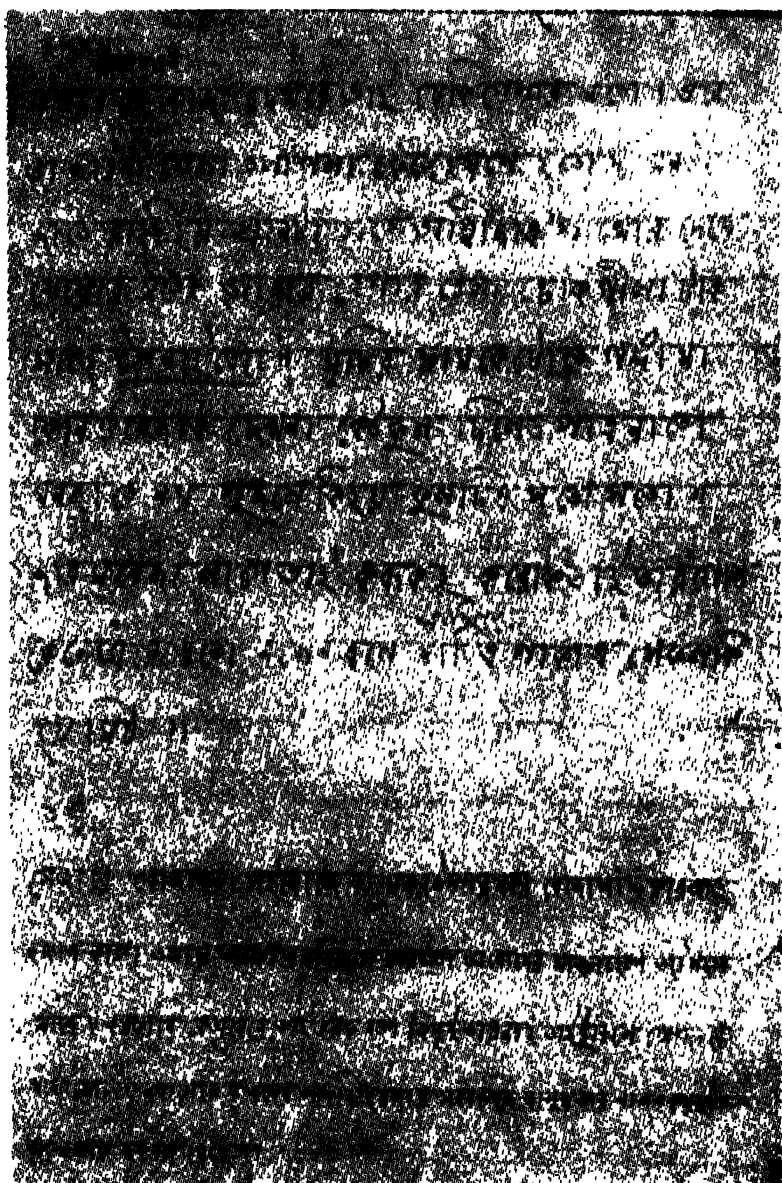
ঐ একই খাতার ৫৫ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এখানেও ১০৭নং গানটিতে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন লক্ষ্য করা যাচ্ছ।

[প্রতিলিপিদ্বয় 'রবীন্দ্র ভবনে'র সৌজন্যে প্রাপ্ত

আএনির অদেখা তরিক
দামির বরজোকে নিরিক
জেরাজ সাই দরবেশের চরণ
ভেবে কহে ফকির নালন
দাএমি নামাজি জে জন
সমন তারো অজ্ঞাকারী ॥

[২।১৬৮] : ১৩ ডাক রে মন আমার হক নাম আল্যা বলে।
ভেবে বুজে দেখ সকলি
না হক হক মোর আল্যার নামটী তাও ভুলিলে ॥
ভরসা নাই এ জেন গানি,
জমন পর্দ্দ পাতার পানি
পড়িবে টলে শুকের বাড়ি ঘর
কোথা রবে,কার হক না হক
তাই কি বল সঙ্গে চলে ॥
ভবেরো ভাই বন্দু জারা
বিপদ দেখিলে তারা
পালাবে ফেলে
কায় প্রাণেতে ভাই
আথের শুপদ নাই।
ক্ষেনেক পক্ষ জমন থাকে ব্রেক্ষ ডালে ॥
অকাজে দিন হলো রে সাম
কথন নেবা সেই মধুর নাম
বাজার ভাঙ্গিলে।
পেয়ে ছিলে মন দুর্ল্যাব জনম
নালন কয় এ জনম জাএ বিফলে ॥

বিবিধ

[১।৩৯] : ২২ ও সে ফুলের মর্ম জেস্তে হয়।
জে ফুলে অটল বেহার সস্তে লাগে বেসম ভয় ॥

ফুলে মধু প্রফুল্লতা
ফলে তার অম্রেতো শুধা
এমন ফুল দিন দনিয়ায় পএদা
জানিলে দুর্গতি জায় ॥
চির দিনে সেহি জে ফুল
দিন দুনিয়ার মকবুল
জাতে পএদা দিনের রাছুল
মালেক সাই জার পউরষ পায় ॥
জর্ম্ম পতে ফুলের ধজা
ফুল ছাড়া নয় গুরু পুজা
ছেরাজ সাই কয় এ ভেদ বোজা
লালন ভেড়ের কার্জ্জ নয় ॥

[১।৮১] : ৪৫ অন্তোরে জার সদায় সহজ রূপ জাগে ।
নাম বলুক না বলুক মুখে ॥
জার কত্রিক সংসার
নারের [?] কিছু তার
বলুক জে নাম ইচ্চে হয় জার
বলে জদি রূপ দেখে ॥
জে নয় গুরু রূপের আশ্রী
দস্ত্রোন জেয়ে ভুলায় তারি
ধর্ম্ম জারা রূপ নিহারি
রূপ দেখে রয় ঠিক বাগে ॥
নামি চেয়ে রূপ নেহারা
সর্ব্ব জয় সাদক তারা
ছেরাজ সাই কয় লালন গোড়া
আলি গেলি কি লেগে ॥

[১।৯৩] : ৫১ হাএ চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাকি ।
ভেদ পরিচয় দেয় না আমাএ
ঐ দেখে ঝোরে আখি ॥

পাকি বুলি বলে সম্ভে পাই
রূপ কেম [ন] দেখি না ভাই
এ তো বেসম ঘোর দেখি।
চিনাল পেলে চিনে নিতাম
জেতো মনের ঢুকঢুকি ॥
পুসে পাকি চিল্যাম না
এ লজ্জা তো জাবে না
আজ উপায় কোরি কি।
পাকি কখন জানি জাবে উড়ে
ধুলা দিএ দুই চকি ॥
আছে নয় দুওর এই খাচাতে
জাএ আশে পাকি কোন পতে
চক্ষে দিএরে ভিক্কী।
ছেরাজ সাই কয়,
বএ নালন রয় ফান্দ পেতে
ঐ পত মুকি ॥

[২।৪৪] : ২৪ ও মন তিন পোড়ায় তো খাটী হোলো না।
না জানি আর কর্মে তোমার
কি আছে তাও বুজলাম না ॥
লোহা জন্মো কামার সালে
জে পর্জন্তো থাকে জালে
সবাব জাএ না তা মরিলে
তোমনি মন তুই একজোনা ॥
ওনুমানে জানা গেলো
৮৪ আশী লোক্কোর ফের পড়িলো
আর কথ [ন] কি কোরবী বলো
হয় না সে বিবেচনা ॥
দেব দেব তার বাসোনা জে
মানুশো জর্মের লাগিএ

নালন কয় সে মানুষ হয়ে
মাল্সের করোন জেনলে না ॥

[২।৫২] : ২৮ সোনার মান গেলো রে ভাই
বেঙ্গা এক পিতোলের কাছে।
সাল সাল পোটুকের কপালের ফের
কোষ্টার বানাত দেখ জুড়েছে ॥
বাজিলো কেলির আরোতি
পেচ পোলো ভাই মানির প্রতি
[পৃ. ২৯] মণ্ডরের নির্ত্ত দেখে পেচায়
ফেকোম ধোরতে বশে ॥
সালগ্রমকে করিএ নোড়া
ভুতের ঘরে ঘোণ্টা নাড়া
কোলির তো এমী দাড়া
স্থুল কাজে সব ভুল পোড়েছে ॥
সবাএ কেনে পিতোল দানা
জহরির তো মূল হোলো না
নালন কএ গেলো জানা
চটকে জগত মেতেছে ॥

[২।৬২] : ৩৪ সেই অটল রূপের উপাশোনা।
কেউ জানে কেউ জানে না।
বৈকণ্টো গোলোকের উপর
আরে রে শে রূপেরো বেহার
ক্রিশ্‌টের কেউ নয় রাধের
পতি শে জনা ॥
স্বরূপ রূপের এই জেনো ধরোন
দোহার ভাবে টলে দোহার মন
অটলকে টলাতে পারে
কোন জোনা ॥

নরেকারো জা হতে জর্মায়
সক্তি ধারা সেই আবেষে
ওখিন লালন বলে
দিন থাকিতে জেনলে না॥

[২।৬৭] : ৩৬ ক্ষিতি কর্মারো খেল কে বুজতে পারে।
জে নিরাঞ্জন সেই হুর নবি নামটী ধরে॥
গটীতে সয়ালো সংসার
এক দেহে দুই দেহো হয় তার
আহাদ আহামদের বিচার
দেখ বিচারে॥
চারেতে নাম আহামদ হয়
এক হরফ তার নফিকেন কয়
সে কথাটী জেনবো কোথায়
নিশ্চয় করে॥
এ মর্ম জাহারে শুধাই
ফাজিল ঝগড়া বাদায় শে ভাই
লালন বলে স্থল ভুলে জাই
তার তোড়ে রে॥

[২।৭৭] : ৪১ উদায় কাল কলি রে ভাই
কলি আমি বলি তাই।
হাগড়া বেদে নিংটী ছিড়ে
লোক বুজি হাশীএ জাই॥
কোলি কালে অমানুসের জোর
জতো ভালোমানুষ বানায় তারা চোর
শুমজে ভবে না চলিলে
বোমবেটের হাত পড়বি ভাই॥
কারু বিশ্বাষ কেহ করে না
ওগো সটে সটে সকল কারখানা

ছিটে ফোটা তন্ত্রমন্ত্র
কলির ধর্ম দেখতে পাই ॥
জতো মা মারা বাপ বদলানে
সবাএ কলিকালে বেশী ভাগ উদায়
ফকির নালন বলে ঘোর কলিতে
ধর্ম রাখা কি উপায় ওরে কি উপায় ॥

[২।৮০] : ৪৩ সামান্য কি তার মর্ম জানা জাএ ।
রিদ কোমলে ভাব দাড়ালে
আজান খবর আপনি হয় ॥
দুগ্ধে জল মিশাইলে
বেচে খাএ রাজ হংশো হলে
কারো সাদ জদি হয় সাদন বলে
হএ শে হংশ রাজের ন্যয় ॥
মানুশে মানুসের বেহার
মানুষ হইলে দিষ্ট হয় তার
সে কি বেড়ায় দেশ-দেশোনতার
পিড়ে পেড়োর খবোর পায় ॥
পাথোরেতে ওগ্নী থাকে
বের করতে হয় ঠুনকি ঠুকে
দরবেষ ছেরাজ সাই দেয় ওগ্নী শীক্ষে
বোকা নালন সং নাচায় ॥

[২।৮৫] : ৪৫ হিরে নাল মতির দোকানে গেলে না ।
সদায় কিনলি রে সব পিতল দানা ॥
[চ] টকে ভুলে রে ও মন
হারালি তুই অমুল্য ধোন
এবার হেরে বাজি কেন্দলে তখন
আর সারে না ॥
শেশের কথা আগে ভাবে
উচিত বটে তাই জানিবে

এবার গত্তো কর্ম্মের বিদি কিরে
মন রশোনা ॥
বেপারের লাভ কল্যা ভালো
সে গুণপানা জানা গেলো
ওধিন নালন বলে মিছে হোলো
আনা জানা ॥

[২।৯১] : ৪৮ মলে ঈশ্বর প্রাপ্তো হবে কেন বলে।
সেই জে কথার পাইনে বিচার
কারু কাছে শুদালে ॥
মলে হয় ঈশ্বর প্রাপ্তো
সাদু অশাদু সোমস্তো
তবে কেনে তপজপ এতো
করে রে জলে স্থলে।
জে পঞ্চে পঞ্চ ভুত হয়
মলে তা জদি তাতে মিসায়
ইশ্বর অংস ইশ্বরে জাএ
সর্গ নরক কার মেলে ॥
জিবেরো এই শরিরে
ইশ্বর অংসো বলি কারে
নালন বলে চিনল্য তারে
মরার ফল তাজায় ফলে।

[২।৯৩] : ৫০ কারে বলে অটল প্রাপ্তী ভাবি তাই।
অঙ্গে লয় হইলে নির্ব্বান মুক্তি বলে
তাও দোসাই ॥
দেখারে কয় অটলপ্রাপ্তী
কিবা হবো সাতের গাতি
ভজন কি সারা সেই অবদী,
কুম্ভরের কি সাস্তী নাই ॥

সিলা সালগ্রাম হওা
অচল বলে দোসাই তাহা
সর্গে জেয়ে, শুক পাওা
সেও তো নহে চিরস্থাই ॥
কেহ জেয়ে সর্গ বাশে
পাপ হলে ফের ভবে আশে
নালন কয় উর্ব্বশী নামে
নির্ত্তনি তার প্রমাণ পাই ॥

[২।১৫] ঃ ৫০ জিব মলে জিব জাএ কোন সংসারে।
ইশ্বরের ঘর বাড়ি জদি হয়ে অশার ভুবনে ॥
রাম নারাওন গউর হরি
ইশ্বর জদি গর্ম্ম করি
তারা তবে গর্ভ ধারি
এ সংসারে হয় কেনে।
জারে তারে ইশ্বর বলা
বুদ্দী নাই তার অর্দ্দ তোলা
ইশ্বরের হয় জমো জালা
ভাবো কি সে তাই মনে ॥
ত্রিজতের মলধর সাই
জর্মম্রেতো তার কিছু নাই
ছিরাজ সাই কয় নালন রে তাই
থাকো সদায় ঠিক জেনে ॥

[২।১৯] ঃ ৫২ এখন আর ভেবলে কি হবে।
কুতি কর্মার লেখা পড়া আর কি ফিরিবে ॥
তুশেতে পাড় কেও জদি দেয়
আর কি তাতে দানা বের হয়
মন হলো সেই তুশের ন্যয়
বস্তহিন ভবে ॥

কোর্পুর উড়ে জাএ শে জমন
গোলমরিজ মিশায় তার কারোন
মন হোতো গোল মরিচ তমন
বোস্ত কেন জাবে ॥
কথার চিড়ে হাওার দোধ
ফলার দিলে বিরবদি
লালন বলে তমী প্রাপ্তী
কেনে না পাবে ॥

[২।১০১] : ৫৩ পড়ে ভুত মন আর হণনে মনুরায় ।
কোন হরফে কি ভেদ আছে
নেহাজ কোরে জেন্তে হয় ॥
আলেক হে আর মিম দালেতে
আহামর্দ্দ নাম লেখা জাএ
ওশে মিম হরফকে নফি কোরে
দেখ না খোদা কারে কয় ॥
আকার ছেড়ে নি আকারে
ভজলি রে আধেলার প্রায়
আহাদে আহাম্মদ হোলো
কল্যী না তার পরিচয় ॥
জাতে ছেফাত ছেফাতে জাত
দরবেশে জেন্তে পায়
নালোন বলে কাট মল্যাজি
না বুজে শে গোল বাদায় ॥

[২।১০৬] : ৫৬ উপবেদে কাজ দেখ রে ভাই
ঢেকি গেলার মতো ।
ওরে তা জাএ না গেলা
ওলা গলা ফেড়ে হয় শে হতো ॥
মনটা জাতে রাজি হয়
প্রানটা তাতে আপ্নী জাএ

পাথোর দেখে সোনার মতো
আবার বেগার ঠেলা ঢেকি গীলা
টাকসালে সৈনাই তো ॥
মুচির চাম কেটোতে গঙ্গা মা
কোনগুনে জাএ দেখ না
কেউ ফুল দিলেও পাএ না তো
মন জাতে নয় পুজলে কি হয়
ফুল দিএ সতো সতো ॥
জার মনে জা লাগে ভাই
করুক ২ করোক তাই
তার গোল কেনে আর এতো
নালন বলে নাতিএ পাকাএ
সে ফল কি হয় মিঠ ॥

[২।১১৬] : ৬৭ আমার হয় না রে যে মনের মতো মন।
আমি জেনবো কি শে রাগের করোন ॥
পড়ে রিপু ইন্দ্রের ভোলে
মন বেড়ায় রে ভালে ২
এবার তুমনে একমন হলে
এড়াই সমন ॥
রশীক ভকতো জারা
মনে মন মিসালো তারা
এবার সাসন করে তিনটী ধারা
পেলো রতোন ॥
কিশে হবে নাগিনি বষ
সেদবো কবে অম্রত রষ
দরবেষ ছেরাজ সাই কএ
বিশেতে নাষ হলি নালন ॥

[২।১২৭] : ৬৭ অবদ মন রে তোমার হলো না দিশে।
এবার মানসের করন হবে কি শে ॥

কোন দিন এষণে জোমের চেলা
ভাঙ্গে জাবে ভবের খেলা
সেদিন হিসাব দিতে বেষম লেটা
ঘটবে শেষে ॥
উজন ভেটেন ছুটী পতো
ভুক্তি মুকতির করোন সেত
এবার তাতে জাএ না জরাম্রিত
জোমের ঘর সে ॥
জে পরশে পরষ হবি
সে করন আর কবে জানবি
দরবেষ ছেরাজ সাই কয়
লালন রলি ফাকে বশে ॥ *

[২।১৫৮] : ৮৭ পাবে সামার্ন্য কে তারে দেখা।
জার বেদে নাই রূপ রেখা ॥
নি আকারা ব্রেহ্ম হয় সে
সদায় থাকে অচিন দেশে
দোষর নাই কো তারো পাশে
সে ফেরে একা একা ॥
সবে বলে পরমিষ্ট
কারো না হইলো দিষ্টী
বরাতে করিলো ছিষ্টী
তাই লএ লেখা জোকা ॥
কিঞ্চীত ধ্যানে মহাদেব
সে তুলনা কি আর হবো
লালন বলে গুরু ভাবো
তবে জাবে সকল ধোকা ॥

* এর সঙ্গে ২ নং খাতার ১৩৪ নং গানের সাদৃশ্য থাকায় সেটি বর্জিত হলো।

[২।১৬০] : ৮৮ ফের পলো তোর ফিকিরেতে।
জে ঘাট মারা ফিকির ফাকার
ডুবে মলি সেই ঘাটেতে ॥
ফিকির ছিলো এক নাচাড়ি
অধর ধরে দিতাম ধোড়ি
পাত্তানি খোলা দোয়াড়ি
তাই দেখে রেখেছি পেতে ॥
না জেনে ফিকিরি আটা
সিরেতে পাড়ালেম জটা
সার হলো ভক্তে ধুতরো ঘোটা
ভজন সাদন সব চুলাতে।
ফকিরি ফিকিরি করা
হইতে জেন্তে মরা
লালন ফকিরি লেংটি এড়া
আট বশে না কোন মতে॥

★

খ.

প্রসঙ্গ : লালন পদাবলী সংগ্রহ

১.

ওপরে আমরা 'বিবিধ'সহ ষোলটি পর্যায়ে মোট দু-শ পঁচাশীটি লালন-পদ সংকলিত করলাম। এই লালন সংগীতগুলি শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র ভবনে' রক্ষিত দুটি খাতায় [পাণ্ডুলিপি নং ১৩৮ এ I, II][১] লেখা আছে। খাতা দুটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৬৭+৯৫=১৬২। এই একশ বাষট্টি পৃষ্ঠায় মোট গানের সংখ্যা হচ্ছে দু-শ সাতানব্বই। তার মধ্যে দু-নম্বর খাতার ছাপান্ন পৃষ্ঠায় একটি গানকে সম্পূর্ণরূপে লিখে কেটে দিতে দেখা যাচ্ছে।[২] এই কাটা গানটি হচ্ছে ঐ দু-নম্বর খাতারই বাহান্ন পৃষ্ঠায় আটানব্বই নম্বর গান [দ্রষ্টব্য ২৪৮ পৃষ্ঠার সংলগ্ন আলোক-চিত্র]। এ ছাড়াও বারোটি গানের হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটায়, যত্নসহ তাদের বাদ দিয়েছি। তারপরেও কয়েকটি

গানে কিছু পাঠান্তর আছে, তাদের সম্বন্ধেও যথাস্থানে যথাযথ মন্তব্য করা হয়েছে।

'রবীন্দ্র-ভবনে'র ঐ দুই খাতা এখন মাইক্রোফিল্ম করে রাখা আছে। মাইক্রোফিল্ম হওয়ার আগে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে শান্তিনিকেতনের মাননীয় উপাচার্য ও রবীন্দ্র-ভবনের অবেক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে লালনের গানের পাণ্ডুলিপি দুটির মূল খাতা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়। খাতা দুটি দেখে এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা বিচার করে এই কথা মনে করা যেতে পারে যে ঐ খাতাদুটির বয়স প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি। এখন প্রশ্ন, কেন এমন মনে করা হলো? কারণ, এক. রবীন্দ্রনাথ ঐ খাতা থেকে নিয়েই সাড়ে উনিশটি[৩] গান 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত করেছিলেন। অতএব যদি ঠিক ঐ সময়েই [১৩২২ বঙ্গাব্দ/১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ] খাতা দুটি সংগৃহীত হয়ে থাকে তবে সে ঘটনাটির বয়স হয় চৌষট্টি বছর। কিন্তু তা হয়নি, তারও বেশ কিছু আগে খাতা দুটি সংগৃহীত হয়েছে। যেহেতু, দুই. রবীন্দ্রনাথের যখন বাইশ বছর বয়স [১৮৮৩ খ্রী:] তখন তিনি 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় [বৈশাখ ১২৯০ পৃ. ৩৪-৪১] একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'বাউলের গান'। ঐ প্রবন্ধে তিনি ঐ সময়ে প্রকাশিত 'সঙ্গীত সংগ্রহ/বাউলের গাথা' নামে একটি পুস্তিকার সমালোচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি লোক-সাহিত্যকে যেমন 'বাংলা ভাব ও ভাবের ভাষা' বলে অভিহিত করেছিলেন, তেমনি সেইখান থেকেই বাঙালী শিক্ষিতজনকে 'বাংলা দেশের ঘাট মাঠের পয়দা-করা' উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবং কেবল তাই-ই নয়, তিনি ঐ প্রবন্ধের শেষে নিজের সংগ্রহ থেকে তিনটি লোকসংগীত উদ্ধৃত করেও দিয়েছিলেন। অতএব বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ এই বয়সেই লোক-সাহিত্য সংগ্রহে আগ্রহ অনুভব করেছেন। অবশ্য এই আগ্রহ দেখেই আমরা দ্রুত মন্তব্য করার অনৈতিহাসিক আনন্দ পেতে পারি না যে, তিনি এই সময় থেকেই লালনের গান সংগ্রহ করতে থাকেন। কারণ, আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি যে, রবীন্দ্রনাথের সংগে লালনের কোনো ভাবেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়নি। এবং লালনের মৃত্যুর পরেই তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৌতুহল সৃষ্টি হয়। তিন. কৌতুহল খুব সম্ভবত ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে [১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট/সেপ্টেম্বর] কবির

দুই বোন-ঝি হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় [পৃ. ২৭৫-৮১] সরলা দেবী লিখিত 'লালন ফকির ও গগন' প্রবন্ধটি পাঠ করে বিশেষ ভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলো। প্রথমত, ঐ প্রবন্ধে লালনের আটটি এবং গগন হরকরার দুটি এবং ভণিতাহীন একটি গান মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয়ত, ঠাকুর পরিবারের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত ও সুশিক্ষিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক একটি সংক্ষিপ্ত লালন-জীবনী ওরই সঙ্গে ছাপা হয়েছিলো। এই পত্রিকার ঐ সংখ্যা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই দেখেছেন এবং লালনের গানের স্বভাব সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধও হয়েছিলেন, এমন মনে না করার কোনো কারণ দেখি না। এবং এই সময়ে তাঁর যা মনোভাব, জীবন যাপনের যে ক্লান্তিকরতা; তাতে বাউল গানের মতো উদাস ও ভাবাত্মক গান বা কাব্য-রস কবিকে যে আকর্ষণ করবে তাতে বিচিত্র কি ?[৪] কারণ, এর দু-এক বছর আগে থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে লোক-সাহিত্য চর্চায়, এবং তার সংগ্রহে নিজে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং অন্যদেরও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করছেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' [ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ. ৪২৩-৭৪] এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' পত্রিকার [মাঘ] পৃষ্ঠায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। **চার.** বর্তমানে সত্তর উর্ধ্ব শিলাইদহের প্রাক্তন কর্মচারী শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী লিখেছেন : "বামাচরণ ভট্টাচার্য বলে আর একজন আমলা ছিলেন, তিনি একটু শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয় আলোচনা করে বুঝেছেন এ ব্যক্তি ছড়া, পাঁচালি, লোক-প্রবাদ প্রভৃতির ভক্ত। বামাচরণবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ঐ রকম ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতি সংগ্রহের ভার দেন। **আমি বামাচরণ বাবুর কাছে মাঝে মাঝে পড়তে যেতাম।*** দেখতাম তাঁর একখানা প্রকাণ্ড খাতা, তাতে অসংখ্য ছেলেভুলানো ছড়া, পাঁচালীর গান বোঝাই।"[৫] অতএব শচীনবাবুর বর্তমান বয়স[৬]ও বামাচরণবাবুর কাছে মাঝে মাঝে পড়তে যাওয়া ও 'প্রকাণ্ড খাতা'-র জন্ম-সময়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করলে গত শতাব্দীর শেষ দশক বেরিয়ে আসে,—যখন লালন গীতিগুলি সংগৃহীত হয়েছে বলে ধরতে চাইছি আমি। এ-ছাড়াও, **পাঁচ.** রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় 'বাউল' নামে যে ছোট্ট পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন [দ্রষ্টব্য ৬৫ পৃষ্ঠায় সংলগ্ন আলোকচিত্র] তার পেছনে প্রকৃত বাউলদের

---

* স্থূলাক্ষর আমার।—লেখক।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুষঙ্গ না থাকলে তা অমন ভাবে রচিত হতে পারতো না। ছয়. ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'-র যে 'হারামণি' বিভাগ বৈশাখ থেকে সুরু হয়, তা কুড়ি বছর আগের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'লালন ফকির ও গগন' নামক প্রবন্ধেরই প্রথম গানটি দিয়ে।[৭] সাত. এ-ছাড়াও আরও একটি কাল্পনিক কাহিনীর ঘটনাগত উদ্ভটত্ব [এই গ্রন্থের ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] বাদ দিয়ে লালন-পদাবলী সংগ্রহের সময়-সম্বন্ধে একটি প্রমাণকে আমরা এই হিসেবে গ্রহণ করতে পারি যে : রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার [১৯১৩] বেশ কিছু আগেই উক্ত গানগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। অতএব আমরা বলে এসেছি যে শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র-ভবনে' রক্ষিত লালনের খাতা দুটির বয়স প্রায় শতেক বছরের কাছাকাছি,—এই বক্তব্য নানা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হলো।

২.

এখন আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উক্ত রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালন পদাবলীর খাতা দুটির লেখক কে? এর উত্তরে বর্তমানে জীবিত বর্ষীয়ান রবীন্দ্র-অনুষঙ্গী ব্যক্তি শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে উক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ই ঐ খাতা দুটির লিপিকর। কিন্তু ঐ পাণ্ডুলিপিদ্বয় বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করে এবং অপরাপর পারিপার্শ্বিকতা বিচার করে উক্ত বক্তব্য মেনে নিতে পারা যায় না। কারণ, এক. শচীনবাবু নিজেই বলেছেন যে : 'বামাচরণ ভট্টাচার্য বলে আর একজন আমলা ছিলেন, তিনি **একটু** শিক্ষিত ছিলেন'। এবং এই **একটু** শিক্ষিত লোকের কাছেই আবার শচীনবাবু 'মাঝে মাঝে **পড়তে**'* যেতেন। কিন্তু কোন 'একটু শিক্ষিত' লোক কখনই ঐরকম বানান বিপর্যয় ঘটিয়ে লালনের লেখা গানগুলিকে অনুলিপি করতে পারে না। বাংলা বানানের ওপর এমন ভীষণ ও কঠিন উৎপীড়ন কোন 'একটু শিক্ষিত' লোক যে কখনও সহ্য করতে পারে তা আমার কেন, অন্য কোন একটু শিক্ষিত লোকেরও পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে [আমি খাতার বানানকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখেই এখানে সংকলন করেছি, তা দেখে নেওয়া যেতে পারে]। এই বক্তব্যের উত্তরে কেউ হয়তো

* স্থূলাক্ষর আমার।—লেখক।

বলতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ বামাচরণবাবু বা অন্য 'যে কেউ হোক লিপিকর'কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আখড়ার খাতায় যেমন যেমন ভাবে লালনের গান-গুলিকে পাওয়া যাবে ঠিক সেই ভাবে, 'মাছি মারা কেরানীর মতো', কপি করে নিয়ে আসা হয় যেন। কিন্তু তা যদি হতো বা লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের সেই সংস্কার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যদি থাকতো তবে: ১. 'হারামণি' বিভাগে লালনের গানগুলির ভাষা বা শব্দের বানান-উচ্চারণের সংস্কার ঘটিয়ে তিনি প্রকাশ করতেন না। এবং তা করায় লালন-ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা, তার উচ্চারণ, বাক্য-গঠন পদ্ধতি ও intonation সবই পালটে গিয়ে গানগুলি একেবারে 'সাহেব বাউল'-এর গান হয়ে গেছে। Folklorist-এর কাছে অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ—এ-বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অবহিত থাকলে কখনই এমন হতে দিতেন না। ২. রবীন্দ্রনাথ এর আগেও এই কাজ করেছেন। যেমন, তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের একটি ছড়ায় ব্যবহৃত 'ভাতারথাকী' শব্দটিকে পাল্টে দিয়েছেন।[৮] ৩. এর পরেও হয়তো কেউ বলতে পারেন যে বামাচরণবাবু শিলাইদহ কুঠিবাড়ীর কর্মচারী হিসাবে বরাদ্দ যে কাজ তা সেরে নিয়মিত যেতেন ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় এবং আখড়ার লালন-শিষ্যদের মুখ থেকে [এই লিখন-কার্যের সময় লালন মৃত] শুনে শুনে লালনের গানগুলিকে লিখে নিয়ে আসতেন। কিন্তু খাতার লেখা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে এমন পরিচ্ছন্ন, খুব কম কাটাকুটি করে এমন ভাবে কখনও শুনে লেখা যায় না। তাই একথা বলতে কোন বাধা নেই যে খাতা দুটি সম্পূর্ণতই দ্বিতীয় স্তরের অনুলিপি কর্ম। এই কথা বলা মাত্রই প্রশ্ন উঠবে যে: তবে তো ঠিকই হয়েছে; আখড়ায় লালনের নিজস্ব যে খাতা ছিলো, তার থেকেই বামাচরণবাবু বা রবীন্দ্র-নিযুক্ত অন্য কোন লিপিকর পরিষ্কার করে [Fair Copy] লিখে নিয়ে আসেন। কিন্তু এমন মনে করার পেছনে কিছু অসুবিধা আছে। কারণ, ক. কোন লেখাপড়া জানা লোকই এমন বানান কানা হতে পারেন না। যেমন: একই চরণে 'মানুষ' একবার 'মানুষ,' আরবার 'মানুস' হয়েছে [দ্র. পৃ. ১৬১]। যেখানে সেখানে 'রেফ'-চিহ্ন ব্যবহার। যেমন: 'নির্ত্ত' [নিত্য], 'পর্দ্দ' [পদ্ম], 'নির্শ্বাস' [নিঃশ্বাস] ইত্যাদি। খ. এ-ছাড়াও সমস্ত গানগুলির ভণিতায় 'লালন' কোথাও নেই—সর্বত্রই 'নালন' হয়ে আছেন। কিন্তু আমরা

জানি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [তাঁর আঁকা স্কেচে তাঁর হাতের লেখা দ্রষ্টব্য], রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর নিযুক্ত লিপিকর সকলেই লালনকে লালন বলেই চিনতেন নালন বলে নয়। অতএব লালন-কে নালন বলতে পারেন লালন নিজে বা ঐ আশ্রমেরই কোন সদস্য। গ. ঐ খাতার লিপিকর আশ্রমেরই কোন সদস্য—লালন-শিষ্য। কারণ, উক্ত প্রকারের বানান, স্থানীয় উচ্চারণের টানে যখন যে শব্দ যে ভাবে এসেছে সেই ভাবেই লেখা এবং প্রয়োজনে বাক্য বা চরণ সংশোধন করে নতুন বাক্য বা শব্দ বসানো বা ব্যবহার করা হয়েছে।[৯] এই কাজ বাইরের অনুলেখকের দ্বারা করা সম্ভব নয়। ঘ. এই রকম একটি গল্প ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় চলিত আছে যে 'রবিবাবু মশায়' লালনের আসল খাতাখানি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আর ফেরৎ দেন নি। 'যা রটে তার কিছুটা বটে' এই প্রবাদবাক্যকে যদি নাও গ্রহণ করি, তবুও আখড়ার লালন-পদ সমৃদ্ধ একটি খাতা রবীন্দ্রনাথ যে ব্যবহার করেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের জবানীতেই ধরা আছে [দ্রষ্টব্য ১১ নং পাদটীকার প্রবন্ধ] এবং রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থাতেও লালনের শিষ্যরা এই ঘটনাকে যেমন ভুলতে পারেন নি ; তেমনি তাঁরা উক্ত গল্প যে কোন লোকের কাছে করতে কখনও সংকোচ করেন নি।[১০] তাঁরা একে আশ্রয় করে যে গল্প-কাহিনী তৈরী করেছেন তার অবাস্তবতা সম্পর্কে হাসি পেলেও মূল খাতাটি যে ভাবেই হোক আশ্রম থেকে শিলাইদহের কুঠি-বাড়ীতে চলে গিয়েছিলো—সে-সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণের কোন কারণ দেখি না।

এ-তদ্‌সত্ত্বেও সমগ্র সন্দেহ নিরসনকারী আরও একটি পদ্ধতিকে আমাদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হলে ভালো হতো। তা হচ্ছে বামাচরণ ভট্টাচার্যের হস্তাক্ষর এবং শচীন্দ্রনাথ অধিকারী কথিত পূর্বোক্ত 'প্রকাণ্ড খাতা'খানার হদিশ করা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পূর্বোক্ত দুটি কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ফলে, পূর্ণ গবেষণার পক্ষে এই অপূর্ণতাটুকুকে মনে রেখেই আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি এবং সেই কাজ সমাপ্ত হলেই অনতিপরবর্তী সময়ে আমাদের বক্তব্যকে গ্রানিট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো বলে আশা রাখি।

আমাদের কাজে উক্ত সংকোচ থাকলেও লালন-খাতা দুটি সম্পর্কে আমরা যে মন্তব্য করে এসেছি সে-বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই আমাদের

লেখনীকে ঋজু করে তুলেছে। 'রবীন্দ্র-ভবনে'র দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মী এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব তাঁর এক প্রবন্ধে[১১] বলেছেন: "কিন্তু সংগ্রহ ব্যাপারটা যে মোটেই সহজ ছিল না সে-কথা রবীন্দ্রনাথই বলেছেন: 'I remember how troubled they were, when I asked some of them to write down for me a collection of their songs. When they did venture to attemped it, I found it almost impossible to decipher their writing —the spelling and lettering were so out-rageously unconventional'. রবীন্দ্রনাথের এ উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয় থাকে না রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত তাঁরই সংগৃহীত লালন ফকিরের গানের খাতা দেখলে।"

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বামাচরণ বা আর কাউকে দিয়ে ঐ দুর্বোধ্য লেখাকে অনুলিপি না করিয়ে মূল খাতাটাকেই যে নিজের দেখার ও ব্যবহারের জন্যে আনিয়ে নেবেন তাতে আর অসম্ভব কি? কেন না তাঁর খুবই আশঙ্কা ছিলো যে, দুর্বোধ্য লেখার নকল দুর্বোধ্যতর হয়ে 'সাত নকলে আসল খাস্তা'য় পরিণত হবে হয়তো।

এর পরেও রবীন্দ্রনাথের আরও একটি মন্তব্যকে গ্রহণ করে শ্রীদেব উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথই উক্ত খাতা সংগ্রহ করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তার প্রমাণ এই যে খাতায় লিখিত অপ্রচলিত বানানের কোনো কোনোটির প্রচলিত রূপ তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে।

কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে এবং কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন সে কথা এখনও জানা যায় না। এ বিষয়ে আমরা তাই অনুসরণ করি তাঁর নিজেরই উক্তি: 'বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলদের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাণ খাতা দেখেছি'।

এই 'খাঁটি' বাউল কি আমাদের লালন ফকির, আর রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত খাতা কি লালন ফকিরেরই গানের খাতা [পুরান খাতা]।"

অতএব পরিশেষে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে 'রবীন্দ্র-ভবনে'র খাতা দুটিই ছেঁউড়িয়ার আশ্রমের আসল খাতা এবং যে ভাবেই হোক তা 'রবিবাবু মশায়ে'র হাতে পৌঁছানোর পর আখড়ায় আর ফিরে যায় নি।

৩.

আমরা এই গ্রন্থের 'লালন-পদাবলীর' সূচনায় বিশেষ জোরের সঙ্গে বলে এসেছি যে রবীন্দ্র-সংগৃহীত এবং 'রবীন্দ্র-ভবনে' রক্ষিত খাতা-দুটির অন্তর্গত ২৮৫টি গানই প্রকৃত 'লালন পদাবলী'—তার বাইরে যে 'হাজার হাজার' গানের সন্ধান পাওয়া যায় তা ভেজাল ; অন্য কেউ রচনা করে লালনের নামে চালিয়ে দিয়েছে। লালনের এই হাজার হাজার গান রচনার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রখ্যাত পল্লীগীতি সংগ্রাহক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব বলেছেন : 'লালন অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তা যে কত তা সঠিক ভাবে বলা মুস্কিল। তবে কয়েক হাজার যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সব গান এখনো সংগৃহীত হয় নি'।[১২] ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দেই এই অবস্থা, আরও কিছু পরে এই সংখ্যা এক লাখে পৌঁছালে আমরা কিছুই আশ্চর্য হবো না। কারণ, পূর্ববঙ্গে [বর্তমান 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র] যে ভাবে 'লালন-আগ্রহ' [!] সৃষ্টি হয়েছে তাতে অচিরেই লালন-গীতিকার সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে যাবে।[১৩] এ-প্রসঙ্গে আরও একটি মজার কথা এই যে উক্ত সংগ্রাহকগণ যেমন একে অপরের সংগ্রহকে সন্দেহ করেন, তেমনি অনেক গানকেই ভেজাল বলে মন্তব্য করেন। প্রথমে আমরা পারস্পরিক সন্দেহের কিছু উদ্ধৃতি দিই।

ক. সর্বপ্রবীণ লোক-সঙ্গীত সংগ্রাহক এবং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ধন্য শ্রদ্ধেয় মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব অবশ্য অন্য কোন সংগ্রাহককে অভিযুক্ত না করলেও গোটা লালন-গান সংগ্রহের উৎসকেই সন্দেহ করেছেন : 'লালন শাহ্ ফকীর সাকুল্যে কতগুলি গান রচনা করিয়াছেন তাহা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তাঁহার সমগ্র গানের সংগ্রহের কোন প্রামাণ্য ও নির্ভরশীল পাণ্ডুলিপি কিংবা মুদ্রিত পুস্তক আদৌ পাওয়া যায় না'।[১৪]

খ. এরপর প্রখ্যাত বাউল গবেষক ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন : 'ইতিমধ্যে একটা বিষয়ে মনে মনে যথেষ্ট পীড়া অনুভব করিতে-ছিলাম। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব লালনের লোকমুখে শোনা অনেক গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ...কিন্তু লালনের যে গানগুলি তিনি...প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এমন বিকৃত, খণ্ডিত, অশুদ্ধ ও অনেকস্থলে অর্থহীন যে, লালনের গানের সম্যক্ পরিচয়-প্রদানে তাহাদের সার্থকতা নাই। অধ্যাপক সাহেব অশিক্ষিত গায়কের

মুখে যাহা শুনিয়াছেন, অত্যধিক উৎসাহে কিছুমাত্র বাছ-বিচার না করিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন…'।[১৫]

গ. আধুনিক লালন-গবেষক মুহম্মদ আবু তালিব লালন-গীতি সংগ্রহ সম্বন্ধে বলেছেন: 'লালনের যথার্থ জীবন কথা নির্ণয় ব্যাপারে যেরূপ সমস্যায় পড়তে হয়েছে, সঠিক গানের পাঠ নির্ধারণ ব্যাপারে তার চেয়ে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ··বলা বাহুল্য, এই সব ভণিতার বা উল্লেখের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার দরুণ একের গান অন্যের নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে গুরুর গান শিষ্যের নামে এবং শিষ্যের গান গুরুর নামেও চলিত হয়েছে।…যাঁরা লালন গুরু সিরাজ শাহকেও কবি বলে উল্লেখ করেছেন, বাংলা সাহিত্যের মশ্‌হুর ঐতিহাসিক ডক্টর সুকুমার সেনও তন্মধ্যে অন্যতম।…এই ভণিতার দ্বারাও বিভ্রান্ত হয়ে অনেকে দুদ্দুর গানকেও লালনের গান মনে করেছেন। অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেব উপরি উদ্ধৃত দ্বিতীয় গানটিকে লালনের গান সংগ্রহে স্থান দিয়েছেন'।[১৬]

এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কৃত লালন-পদাবলী সংগ্রহের পর আজ পর্যন্ত যাঁরাই লালনের গানের সংকলন করেছেন তারাই নিজেদের সংগ্রহ সম্বন্ধে যেমন একটা দোলাচলচিত্ততার মনোভাব দেখিয়েছেন, তেমনি পূর্বতন বা সমসাময়িক সংগ্রাহককে যতদূর সম্ভব সমালোচনা করেছেন। [কিন্তু মজার বিষয় এই যে, ঐ অস্বীকার সত্ত্বেও পূর্বসূরী বা সমকালীনের সংগ্রহকে বিনা স্বীকৃতিতে নিজেরা গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন নি]।

এইবার আমরা বিশেষজ্ঞ সংগ্রাহকগণ লালন-পদাবলীর ভেজালত্ব সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেন তা দেখি।

ক. 'আমার নিকট লালনের আরো প্রায় দেড়শত গান রহিল,… তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভেজাল-মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়'।[১৭]

খ. "এ-কথা অবশ্যি স্বীকার্য যে, 'লালন-গীতিকা' নামে যত গানই সংগৃহীত হয়েছে, তার সবগুলিই লালনের রচিত নয়। লালনের নাম ভণিতারূপে পাওয়া গেলেই এবং তা কোন ভক্তের কাছে পাওয়া গেলেই তাকে লালনের গান বলে মনে করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।…কিন্তু আফসোসের বিষয়, লালনের বেনামীতে এত বাজে লেখকের

গান বাজারে চালু হয়েছে যে, আজ কোনটি খাঁটি, কোনটি অ-খাঁটি, তা-চেনাও এক সমস্যা হয়ে উঠেছে"।[১৮]

এবং লালনের গানের এই 'দু-নম্বরী' কারবারের রমরমে বাজারে দাঁড়িয়ে উক্ত খ্যাতিমান লালন-গবেষক একটি অভূতপূর্ব মন্তব্য করেন : 'মোট ছ'শ' গান নিয়ে এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়…এগুলো সংগৃহীত হয়েছে একাডেমী নিযুক্ত সংগ্রাহকের দ্বারা। অতএব, আশা করা যেতে পারে এগুলো প্রামাণ্য গানই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন কোনো প্রামাণ্য দলিল-ভিত্তিক প্রাপ্ত নয় বলে এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়'।

ফলে, ঐ সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েই আমরা দৃঢ়ভাবে তাই বলেছি, এখনও বলছি যে 'রবীন্দ্রনাথের সংকলন বিশ্বস্ত'।[১৯] এবং বাকী সবই ভেজাল। এই প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে আমাদের বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করবো। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় উপস্থিত হয়ে সকালের এক আসরে বিখ্যাত এক বাউলের গান শুনছি। আসরে যেমন অসংখ্য বাউল উপস্থিত আছেন, তেমনি হাজির আছেন দেশ-বিদেশের বহু বোদ্ধা শ্রোতা ও রসিক। আমি মঞ্চের ওপর উক্ত গায়কের পাশে বসেই গান শুনছিলাম। দু-একটি গানের পর আসরের অনুরোধে গায়ক 'লালনের গান গাইছি' বলে লালনের ভণিতা দিয়ে যে গানটি শেষ করলেন সেটি শুনে আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ হলো। খুব স্থির নিশ্চয় নয়—খানিকটা আন্দাজেই ফিস্‌ফিস্ করে গায়কের কানে কানে বললাম : 'দাদা, এটা কি লালনের পদ ? কেমন যেন একটু সন্দেহ হচ্ছে'! আমার গায়ক দাদা একটু মৌন থেকে হঠাৎ মাইকে ঘোষণা করলেন যে : 'আমার ভুল হয়েছে; আমি যে গানটি এখনই লালনের ভণিতায় গাইলাম, সেটি লালনের পদ নয়। আমার ভুল ক্ষমা করবেন' এর পরেও কিন্তু আমার কাছে রহস্য থেকেই গেছে যে, উক্ত বাউল গায়ক যে গানটি লালনের বলে গাইলেন সেটি ঠিক : না লালনের গান নয় বলে যে স্বীকারোক্তি করলেন সেটি ঠিক। অর্থাৎ সবই 'লক্ষ্মীবাবুর আসলী সোনে-চাঁদী কা দোকান'।

এই যেখানে অবস্থা, যেখানে 'স্বরচিত লালন-গীতি' রচিত ও প্রচারিত হওয়ার আশঙ্কা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা ; যেখানে 'প্রামাণিকতা

সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়' সেখানে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের গানগুলিকেই আসল ও নির্ভরযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে সেগুলির অকৃত্রিমত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলেই লালনের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা এবং তাঁর সৃষ্টিকে প্রকৃত মর্যাদা জ্ঞাপন করা হবে বলে মনে করি।

সব শেষে লালনের নামে প্রচারিত ও অত্যন্ত সুপরিচিত অন্তত তিনটি গান সম্পর্কে দু-চার কথা এখানে বলি। ১. লালনের জাত-জিজ্ঞাসা সম্পর্কিত বিখ্যাত গান 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'…ইত্যাদি। এটি 'লালন খাত'ায় নেই। এবং মনে হয় 'হিতকরী'-র সময়েই এটি 'সুপার ইম্পোজ' করা হয়েছিলো। রবীন্দ্র-সংগৃহীত লালন-খাতায় জাত-বিষয়ে একটি গান আছে [দ্র. পৃ. ১৭২] এবং আশ্চর্য 'হিতকরী'র পাঁচ বছর পরে একই প্রবন্ধে গানটি দু-বার ব্যবহৃত হয়েছে দু-রকম চেহারা নিয়ে [দ্র.পৃ. ৭৭ ও ৭৯] এবং সঙ্গে একটি গল্পও জুড়ে গেছে। ফলে গানটি সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। ২. রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে ব্যবহৃত দু-টি চরণ 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী'… গানটিও রবীন্দ্র-খাতায় নেই। এটিকে পরবর্তী সংগ্রাহকেরা [১৯১৫-র পরে] সম্পূর্ণ করেছেন। তাই এটিকেও 'লালনের নামে চালিয়ে দেওয়া গান' বলা যেতে পারে। 'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে' গানটির সম্বন্ধে আমরা 'স্বরলিপি' অংশে কয়েকটি কথা বলেছি। এখানে তাই আর কোন মন্তব্য করা হলো না।

অতএব আমরা আগেই যে কথা বলে এসেছি [পৃঃ ৫৪-৭] তাই-ই ঠিক ; অর্থাৎ লালনের কবি-বিশেষত্ব যতটুকু বা সাধন-বক্তব্য যতখানি তার সবটাই খুঁজে পাওয়া যাবে ঐ প্রথম সংকলিত প্রায় শ-তিনেক গানের মধ্যে। তার চেয়ে বেশী বা তার পরের গান যা লালনের নামে চলছে বা চালানোর চেষ্টা হচ্ছে, তার সবই ভেজাল।[২০]

---

১. আমার এই গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তাতে অনবধান বশত একটু ত্রুটি থেকে গেছে। 'রবীন্দ্র-ভবনে'র পাণ্ডুলিপির সংখ্যা অনুযায়ী লালনের ঐ খাতার সংখ্যা 138A(I) ও (II). পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাতে 138 ও 138A ছাপা হওয়ার জন্ম আমি দুঃখিত।

২. এই পৃষ্ঠাটির ফটোচিত্র ২৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে দেখার জন্মে পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

৩. দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের ৯১-২ পৃষ্ঠা।

৪. কবির এই সময়ের মনের ও জীবনের ইতিহাস জানার জন্যে দ্রষ্টব্য গ্রন্থ : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-জীবনী' : প্রথম খণ্ড : ১৩৬৭ : পৃ. ৩৮৭-৯।

৫. শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী : 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' [১৯৭৪] পৃ. ২০৫-০৬।

৬. শচীনবাবুর জন্ম হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৩০শে শ্রাবণ, শিলাইদহে।

৭. বর্তমান গ্রন্থের ৮৩-৮৬।

৮. দ্রষ্টব্য : মৎ লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য' [১৯৭১] : পৃ. ৪৬-৭।

৯. এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে মূল পাণ্ডুলিপি দুটি [বর্তমানে মাইক্রোফিল্ম] দেখা দরকার। সে-দুটি দেখলেই দেখা যাবে যে লেখক ছন্দ বা ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে অনেক স্থলেই কিভাবে শব্দ বা বাক্য পরিবর্তন করেছেন। এখানে আমরা সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দেবো। যেমন ১নং খাতার ১০ পৃষ্ঠার ১৭নং গানের ছ-লাইনে 'নিরালা, তার করোন রিতি সাই দরদি দরসদ দিবে তারে'-র মধ্যে 'করোন'......দিবে তারে' কয়টি কেটে দেওয়া হয়েছে [দ্রষ্টব্য ২০২ পৃষ্ঠার গান]। আবার ঐ একই গানের শেষ লাইনে 'জা করে সাই' শব্দ কয়টি কেটে দিয়ে ছন্দ ও অর্থকে সুসমঞ্জস করা হয়েছে। ঠিক এই ভাবেই ঐ একই খাতার ১৮ পৃষ্ঠার ৩১ ও ৩২ নং গানে যথাক্রমে ৬ ও ৫ নং লাইনের 'মালি' ও 'আসায়' শব্দ দুটি কেটে দেওয়ায় কবির কাব্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ২ নং খাতার ১৩৩, ১৬৭, ১৭০ নং গানগুলিও দেখতে পারেন। ঠিক এর পরের পৃষ্ঠাতেই ৩৪নং গানের ২ এবং ৭ নং লাইনে 'সদায়' এবং 'পায়না ফিকির' পদ তিনটিকে কেটে দেওয়া দেখলেই প্রত্যয় যেতে এতটুকু কষ্ট হবে না যে এই খাতা দুটি বাইরের কোনো অনুলেখকের দ্বারা আদৌ লিপিকৃত নয়। কবির অনুমোদনে আখড়ারই কেউ এ-দুটি লিখেছেন। এ রকম আরো উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে যে ঐ খাতা দুটির লিপি-কর্মে সচেতন এক কবিমন সব সময়েই ক্রিয়াশীল ছিলো।

১০. দ্রষ্টব্য : ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'দ্বিতীয় খণ্ড : 'বাংলার বাউল গান'

[১৩৬৪] : পৃ. ১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই অংশে ড. ভট্টাচার্য লালন আখড়ার খাতার ভুল ও দুর্বোধ্যতা এবং পাঠোদ্ধারের দুরূহতার কথা উল্লেখ করেছেন।

১১. দ্রষ্টব্য : 'পরিচয়' [চৈত্র ১৩৬৪] : পৃষ্ঠা ৮৯০–১।

১২. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন স্মারক গ্রন্থ' [১৯৭৪] : পৃ. ১২৭।

১৩. মুহম্মদ আবু তালিব তাঁর দুইখণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ 'লালন শাহ ও লালন গীতিকা'-য় মোট ৬৪২টি গান সংগ্রহ করেছেন। পূর্বোক্ত ১২নং পাদটীকার গ্রন্থের এক প্রবন্ধে অপর এক প্রবন্ধকার ৫৬৩টি লালন গানের সূচীপত্র দিয়ে উল্লেখ করেছেন : 'সম্প্রতি আমার পরম স্নেহভাজন কল্যাণীয় আবুল আহসান চৌধুরী লালন শাহের গানের একটি পুরনো সূচীপত্র উদ্ধার করেছেন। এই সূচীটি লালনের কোনো শিষ্য তৈরী করেছিলেন বলে মনে হয়। এতে লালনের ৫৩০টি গানের উল্লেখ আছে।'

১৪. 'হারামণি' : ৭ম খণ্ড [ভাদ্র ১৩৭১] পরিশিষ্ট 'খ' : পৃ. ক। এবং ১২নং পাদটীকার গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠা।

১৫. দ্রষ্টব্য ১০নং পাদটীকার গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৩-৪।

১৬. দ্রষ্টব্য : 'লালন শাহ, ও লালন গীতিকা' : ১ম খণ্ড [১৯৬৮] : পৃষ্ঠা ১৯৯-২০১।

১৭. দ্রষ্টব্য ১০নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৬।

১৮. দ্র. ১৬নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৯৯।

১৯. দ্র. ১৪ নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. 'ক'।

২০. এ প্রসঙ্গে পঠনীয়, অধ্যাপক শ্রীমানস মজুমদার-এর প্রবন্ধ : 'অচিন পাখির সন্ধানী : লালন ফকির' ['রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'] : ২১ শে আশ্বিন ১৩৭৪।

পরিশিষ্ট

ক.

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্র-সংগৃহীত লালন-খাতার বানান

যাঁরাই বাউলের, বিশেষ করে লালনের খাতা অনুসরণ করে তাঁদের গান সংগ্রহ করতে গেছেন তাঁরাই প্রথমত, খাতার হাতের লেখার দুর্বোধ্যতার এবং দ্বিতীয়ত, বানানের ব্যভিচারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা সরজমিনে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে লালন-খাতার লেখকের হাতের লেখা বেশ স্পষ্ট ও গোটা গোটা। কয়েকটা মাত্র বর্ণ [বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুক্ত ব্যঞ্জন] ছাড়া বাকী সবটাই অত্যন্ত সুবোধ্য [গ্রন্থস্থ আলোক-চিত্র দেখুন]। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় বানান। এই বিষয়ে লিপিকর এমন অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করছেন যে, এই বিচিত্র বানানের ফলে বহু শব্দ বিচিত্র সব চেহারা ধারণ করেছে। নীচে আমরা ঐ সব বিচিত্র-বানানের পদ-গুলিকে বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে শুদ্ধ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। হয়তো এটাকে অনেকের অসম্পূর্ণ মনে হবে, তথাপি এর থেকে লালন-খাতার লিপিকরের বানান লেখার প্রবণতাটুকুকে ধরতে বোধ হয় অসুবিধা হবে না। আমার মনে হয় একটু অবধানতার সঙ্গে পাঠ করলেই বানান বিভ্রাটে বিপর্যস্ত পদগুলির মূল চেহারা এবং অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে।

এ-প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে লালন-খাতার গানগুলি চরণ ভেঙ্গে সাজানো নয়। গদ্যের মতো লাইন ধরে পর পর লিখে যাওয়া হয়েছে। [দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠা]। এভাবে লেখার ফলে চরণ-বিভ্রাট ঘটেছে, অনেক স্থলেই অর্থ বা ভাবের পতন হয়েছে।

অধিকন্তু লালন-খাতার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে মুসলমানী রীতি অনুসরণে খাতার শেষ পৃষ্ঠাই এখানে প্রথম পৃষ্ঠা রূপে গণ্য। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন : ['লালন-গীতিকা' : 'ভূমিকা' পৃ. II/০] "'রবীন্দ্র সদনে' রক্ষিত গানের খাতা উর্দুর ন্যায় ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে লিখিত ;"—তা আদৌ ঠিক নয়। তাঁর মতো প্রবীণ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে এমন মন্তব্য করেছিলেন তা বুঝতে পারি না। আসলে তাঁর সম্পাদকদ্বয় তাঁকে ভুল তথ্য পরিবেষণ করেছিলেন। এই ত্রুটিটি আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধিত হবে।

যে পদগুলি বানান বিভ্রাট-কারণে দুরূহ রূপ নিয়েছে নীচে সেগুলি ও তাদের শুদ্ধ রূপ দেওয়া হলো। বানান অশুদ্ধি সত্ত্বেও যেগুলি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, সেগুলিকে আর এখানে টানা হলো না।

অক্রিম—অন্তিম।
অজুনি [অজুনি]—অযোনি।
অটাল—অটল।
অথায় অরঙ্গে আতোঙ্গে—
অথই অরঙ্গে আতঙ্কে।
অধার ধরায় শুত—
অধর ধরায় সুতো।
অপোবাদ—অপরাধ।
অবাএ—অবয়বে।
অর্ন—অন্য।
অলকি—টল কি
অশুয়ার—অ-সুসার।
অসমার সকা—অসময়ের সখা।
অস্তী চর্মর সন্ন রূপ—
অস্থি-চর্মের শূন্যরূপ।
আক্ষি—আঁখি।
আকোরসনে—আকর্ষণে।
আত্তারিকি—আত্মার কি।
আদের—তাদের।
আনকা—আনখা, অপরিচিত।
আবেম্মে—অব্রহ্মে।
আর্দ্দি—আদ্য।
আর্ত্তারূপ—আত্মারূপ।
আলোষ—আলস্য।
আল্যীব—আলস্য।
উদ্দ মক—উর্ধ্ব মুখ।
উপবেদে—উপরোধে
উর্শ—উষ্ণ।
এসারাতে—ইসারাতে।
ওধন—অধীন।
ওহিল্লে—অহল্যা।
কটী—কোটি।
কত্তারপের—কর্তারূপের।
কথা—কোথাও।
কন্দে—কান্দে।
করংঙ্গে—করছে।
কহরু—কাহারো, কারু।
কান্দা—কাঁদা।
কিরসী—কৃষি।
কুত্‌র্কী—কু-তর্ককারী।
কুপেচে—কুপথে।
কুব—কূপ।
কেভে—কভু।
কেলির—কলির।
খিরদ শশী—ক্ষীরোদ শশী।
খেতি—খ্যাতি।
খোদকে—খোদাকে।
গঙ্যান—জ্ঞান।
গঙ্গা বোলো—গঙ্গা বহিলো।
গুমো বাসে—শুভ বাসে

গ্রপ্ত—গুপ্ত।

ঘয়ে—ঘরে।

চতে তিতে—জেতে নিতে।

চাচিতো—যাচিত।

চেক্ত—এই পদটির তাৎপর্য নির্ধারণ করা যায় নি।

ছেচোড়—ছ্যাচোড়।

জগ্যার ব্রতো—যজ্ঞের ব্রত।

জত্র্না—যন্ত্রণা।

জবান—যবন।

জমুনায়—যমুনায়।

জর্মিলে—জন্মিলে।

জর্ম্মা বদি—জন্মাবধি।

জল্যে—জানলে।

জাত্রা—যাত্রা।

জায়ে—জারে।

জাহের—জাহির।

জির্ব্বায়—জিহ্বায়।

জের্দ্দারো—জেল্দারো।

জোঙ্গালা টিএ—জঙ্গলা টি য়ে।

জেল্যাম—জানলাম।

ঠেকনা—ঠিকানা।

ডণ্ডী বেষ—দণ্ডী বেশ।

তন্তের স্তুতরি—তন্ত্রের তস্তরী।

তব জর্গ—তপ যজ্ঞ।

তরং—তরঙ্গ।

তর্তে—তত্ত্বে।

তাইরি—তাহারি।

ত্বিবির্ধ—ত্রিবিধ।

তোন—তিন।

তোর্ন্নী—তরণী।

থাএ—থাই, তল।

দদেবতে—দুখেতে।

দর্শ—দস্যু।

দর্শ—দুষ্য, দোষ।

দিদায়—দ্বিধায়।

দিন বোন্দুর—দীন বন্ধুর।

দিব না জেল্যে—দীপ না জালিলে।

দির্ব্ব্ গ্যানী—দিব্যজ্ঞানী।

দেলে দিধা—দিলে [হৃদয়ে] দ্বিধা।

দেসা [স্ত] সুরি—দেশান্তরি।

দোড়িএ জেএ দৌড়িয়ে যেয়ে।

দোমের—দমের।

দ্বর্দ্দসাএ—দুর্দশায়।

ধোড়ে—ঢুঁড়ে বা ধারে।

নকটে—নিকটে।

নতা—লতা [লক্ষণীয় : নাল—লাল, নালন—লালন ; লোকা—নৌকা]।

নরেকারের গন্ত—নিরাকারের দন্ত।

নালোষ—লালসা।

নিগুর—নিগূঢ়।

নিজতর্তে—নিজতত্ত্বে।

নিব বিপার—নির্বিকার।

নিস্বদে—নিঃস্বাদে।

নেচ্তে—নিচুতে অথবা নাছ বা খিড়কীতে।

নীলেনি—নলিনী।

পক্কনওরে—পক্কান্তরে।
পংক—পঙ্ক।
পঞ্চতত্ত্ব গ্যানি—পঞ্চতত্ত্বজ্ঞানী।
পরশীরে—স্পর্শ করিবে>পরশিবে।
পরোস>পর্সে>পরোসো—স্পর্শ।
পক্ষ—পক্ষী।
পর্দ্দহিন—পদ্মহীন।
পারা—পাহারা।
পুর্ন বেক্ষ—পূর্ণ বৃক্ষ।
প্রবন্তের—প্রবর্তের।
প্রিকিতি প্রিকিত—প্রকৃতি প্রকৃত।
প্রীতিবতো—প্রতিপদো।
প্রেমসন্ন—প্রেমশূন্য।
বন্দোর—বন্ধুর।
বাও—বাতাস।
বাছুল—রসুল।
বাজ্য—বাহ্য।
বাঞ্চীত—বাঞ্ছিত।
বান্দোবো—বান্ধব।
বাল্য ব্রেদো—বাল্য বৃদ্ধ।
বিদ্দে বুর্দ্দী—বিদ্যা-বুদ্ধি।
বিবদ—বিপদ।
বিরদি—বিরোধী।
বেদ বিদি—বেদ-বিধি।
বেন্তে পেলো—বাঁধতে পারলে।
বেবে—ভেবে।
বেভাণ্ডো—ব্রহ্মাণ্ড।
বেমুক—বিমুখ।
বের্মা বৃঅন্দো—ব্রহ্ম বৃন্দ।
বেহুবিদ—বে-বুঝদ।
বৈবার্গ—বৈরাগ্য।
ব্রম—ব্রহ্ম।
ভষ—ভস্ম।
ভাবসন্ন—ভাবশূন্য।
ভুজং ননা—ভুজঙ্গনা।
ভুবলে—ভুবনে।
ভেস্তের—বেহেস্তের।
ভক্তিসন্ন—ভক্তিশূন্য।
ভ্রিমি ভব কুপায়—ভ্রমি ভব কূপায়।
মকক্ত—মুক্ত।
মত্র—মন্ত্র।
মম—মর্ম।
মর/মরা—মোর/মোরা।
মহত্ত—মহত্ত্ব।
মর্ত্ত—মত্ত, উন্মত্ত বা পাগল।
মাধজ্জ—মাধুর্য।
মাত্রীকুল—মাতৃকুল।
মালোও—মলয়।
মুন্দীরে—মন্দিরে।
ম্রেনালে—মৃণালে।
রক্ষো—রাখো।
রশপাস্তী—রসপন্থী।
রাগিনীর—নাগিণীর।
রাজথ্য—রাজত্ব।
রাত্তে—সাথে।
রোলি—বলি [এই ভাবে বহু-ক্ষেত্রেই 'র' এবং 'ব' তাদের পার্থক্য ঘুচিয়েছে]।

রাজ্জ'স্বর—রাজ্যেশ্বর।
শর্ন' সিন্নাশোনে—স্বর্ণ সিংহাসনে।
শার্জ্জনে—সাযুজ্যে।
শিদ্দী—সিদ্ধি।
শিরর্জন/শীজ্জন/সের্জন—সৃজন।
শীন্দু—সিন্ধু।
শুপে—সঁপে।
শুভার্গ—সৌভাগ্য।
শুমাতুল—সমতুল।
সঅংরূপ—স্বয়ংরূপ।
সওদামিনি—সৌদামিনী।
সত্রে—সত্যে।
সনি সুন্দল—শুনি সুন্দর।
সস্তে—শুনতে।
সন্দানে—সন্ধানে।
সন্নকায়—শূন্যকায়।
সন্নিতে—সন্ধিতে।
সপ্তোপাস্তীর—সপ্তপর্ণীর।
সবংঙ্গে—সর্ব অঙ্গে।
সমস্কার/সোমেস্কার—সংস্কার।
সম্মথ্য—সম্মত।
সরবস্ত/সবস্ত—সর্বস্ব।
সরায়—শরিয়তীতে।
সর্ক' মর্ক'—সখ্য মোক্ষ।
সর্ণ—শূন্য।
সন্নগিরি—শূন্যগিরি।
সর্পনে—স্বপনে।
সর্ব—শম্ভু।
সসানে—শ্মশানে।
সাক্ত সাক্রটি—শাক্ত শক্তি।
সাজ্জবর্ত্ত—সাধ্য যত।
সাদক-সিদ্দী-প্রবর্ত্তন্ত—সাধক-সিদ্ধি প্রবর্ত্তক।
সাদবার—সাতবার।
সাদা—সাধা।
সাদু টীক্র [চীত্র]—সাধু চিত্ত।
সির্দ্দি—সিদ্ধি।
সীতি—স্বাতী [?]।
সুজ্জ—সূর্য।
সেদবো—সাধবো।
সোন্দান—সন্ধান।
স্বথে—সাথে।
স্বনি শুকলে—শনি শুক্রে।
স্বরণ—স্মরণ।
হুংকার—হুঙ্কার।
হক্কে'র—হক্কের।
হিন হোচি—হীন হয়েছি।

খ.

১.

লালন-পদের স্বরলিপি

পূর্ববঙ্গ [অধুনা বাংলা দেশ রাষ্ট্র]-এর কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত লালনের যে আখড়া,—যা ছেঁউড়িয়ার আখড়া নামে সুবিখ্যাত, সেখানে যে সুরে লালনের পদ গান করা হয় তার অনুসরণে একটি স্বরলিপি এখানে মুদ্রিত করা হলো। এই স্বরলিপিটি তৈরী করেছেন মকছেদ আলী সাঁই। এবং আমার একান্ত প্রীতিভাজন ও প্রখ্যাত লালন-গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী আমারই অনুরোধে সাঁইজি রচিত এই স্বরলিপিটি পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

প্রসঙ্গত, একটি কথা এখানে বলি যে, লালনের যে পদটি এখানে স্বরলিপিকৃত হয়েছে সেটি আমাদের 'লালন পদাবলী' সংগ্রহে নেই। অর্থাৎ এটি রবীন্দ্র-সংগ্রহের অন্তর্গত নয়। আমরা আগেই বলে এসেছি যে রবীন্দ্র-সংগ্রহের বাইরে দু-একটি গান এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও থাকতেও পারে, এটা হয়তো তারই একটা; অথবা ভেজাল। কিন্তু যেহেতু বন্ধুবর চৌধুরী রবীন্দ্র-সংগ্রহের মূল খাতা দেখার সুযোগ পান নি এবং ঐ খাতা সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্তও জানেন না, কেবল আমার অনুরোধে 'যে কোন একটি' গানের স্বরলিপি পাঠিয়ে দিয়েছেন,—সেহেতু আমার সিদ্ধান্ত থেকে সরে না গিয়েও এটিকে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ মুদ্রিত করলাম।

।। গান ।।

বাড়ীর কাছে আরশী নাগর/সেথা এক পড়শী বসত করে/আমি একদিনও না দেখিলাম তারে॥

গিরাম বেড়ে অগাধ পানি/নাই কিনারা নাই তরণী, পারে/বাঞ্ছা করি দেখবো তারি/কেমনে সে গাঁয় যাইরে॥

কি বলিবো পড়শীর কথা/হস্ত-পদ-স্কন্দ-মাথা, নাইরে/ক্ষণেক থাকে শূন্য-ভরে। ক্ষণেক ভাসে নীরে॥

পড়শী যদি আমায় ছুঁতো/যম-যাতনা সকল যেত, দূরে/সে আর লালন একখানে রয়/লক্ষ-যোজন ফাঁকরে॥

উক্ত গানের স্বরলিপিটি নিম্নরূপ:

০ ১	২	০	৪	৫	+৫			০			+
ধা	সা	রে	গা	মা	ধা	পামা	মা	মামা	মা	গা	গা
বাড়ী	—	র	কা	ছে	আর	শীন	গ	— —	র	—	—।

							০			+
ণ	নি	—	ধা	পা	ধা	ণ	ণ	ধা	পা	।
সে	থা	—	এ	ক	প	ড়	শী	ব	স	ত

		০			+			০			+
মা	পা	পা	পা	মা	পা	মা	গা	গা	রে	সা	মা
ক	—	—	রে	—	—	আ	মি	—	—	—	এ

		০			+			০			+
সা	রে	রে	গা	পা	পা	ণ	নি	ধা	পা	মা	পা
ক	দি	ন	না	—	—	—	—	—	—	—	—

		০			+			০			+
পা	মা	গা	রে	রে	রে	রে	গা	গা	রে	রে	সা
দে	খি	লা	—	ম	—	তা	—	রে	—	—	—॥

		০			+			০			০
ধ্া	ধ্া	সা	সা	রে	পা	মা	গা	মা	মা	মা	মা
গি	রাম	বে	ড়ে	অ	গা	ধ	—	পা	নি	—	—

		০				+			০			+
পা	ধা	নি	ধা	পা	মা	গা	রে	গা	পা	ধা	ণ	ণ
—	—	—	—	—	—	না	ই	কি	—	না	রা	—

		০			+					
পা	পা	মা	গা	রে	সা	সা	।	।	।	।
না	ই	তর	ণী	—	পা	—	রে	—	—	—।

		০						০			+
ধা	ণ	নি	র্রে	র্সা	।	নি	ণ	ণ	নি	ধা	পা
বা	ঙা	ক	রি	—	—	দে	খ	বো	তা	রি	—

		0			+			0			+
ধা	পি	ণ	নি	ধা	পা	ধা	ণ	ধা	পা	মা	৷
কে	ম	নে	সে	গাঁ	য়	যা	ই	—	রে	—	—

		0			+			0			+
মা	পা	গা	রে	সা	স্া	সা	রে	গা	পা	৷	৷
আ	—	—	মি	—	—	এ	ক	দি	ন	না	—

		0			+						
ধা	ণ	ধা	পা	মা	গা	পা	মা	গা	৷	রে	স্া
—	—	—	—	—	—	দে	খি	লা	ম	তা	রে ॥

[পরবর্তী দুটি স্তবকের স্বরলিপি প্রথম অন্তরার অনুরূপ]

২.

এখানে প্রদত্ত এই দ্বিতীয় স্বরলিপির গানটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেঁদুলী গ্রাম থেকে ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম গানের স্বরলিপির মাধ্যমে যেমন ছেঁউড়িয়ার আশ্রমের বাউল সুরকে উপস্থিত করা হয়েছে, এখানে তেমনি বীরভূমী ঘরানার বাউল সুরকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। লালনের এই পদটি [বর্তমান গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] কেঁদুলীর জয়দেব মেলায় শ্রীসুধীরদাস বাউল গান করেন। এবং আমার টেপ রেকর্ড থেকে শুনে স্বরলিপি করে দেন বড়িষা-বেহালার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রীজগদানন্দ বড়ুয়া মহাশয়। গায়ক এবং স্বরলিপি-কার উভয়কেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। উক্ত গায়ক যে ভাবায় গানটি গেয়েছেন তা প্রথমে উদ্ধৃত হলো, পরে স্বরলিপিটি :

॥ গান ॥

আরে, না বুঝে মজো না পিরিতে/জেনে শুনে করবি পিরিত
ভোলা মন, শেষ ভালো দাঁড়ায় যাতে।
যদি পিরিত করতে হয় বাসনা/তবে সাধুর কাছে জেনে লেনা
যেমন লোহাতে পরশে সোনা/ওরে সেমত হবে তোমাতে ॥
এই ভবের পিরিত ভূতের কেত্তন/একবার বিচ্ছেদ একবার মিলন
আবার শেষ কালেতে হয় রে মরণ/যেতে হয় তেরাথার পথে ॥

এক পিরিতে বিভাগ চলন/আবার কেউ স্বরগে কেউ নরকে
করছে গমন
শেষে তাই না ভেবে বলছে লালন/ওরে কি বলে লা জগতে ॥

সা সা ॥ জ্ঞা —া জ্ঞা । মা পা —মা । জ্ঞা মা — জ্ঞা । —া ঋা ঋা ।
আ রে না ০ বু ঝে ম ০ জো না ০ ০ পি রি

র্সা —া —া । —া —া —া । া —া —া । —া —া —া ।
তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্সা —া । ঋা র্সা —া । ণর্সণা —া না । দা ণা —দপা ।
জে নে ০ শু নে ০ ক০০ র্ বি পি রি ০ত্

—া —া —া । —া —া —া । —া —া র্সা । —া ঋা —া ।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভো ০ লা ০

জ্ঞা —া —া । —া —া —া । —া —া —া । —া —া —া ।
ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

—া ঋা জ্ঞা । ঋা র্সা —া । —া —া —া । —া —া —া ।
০ ০ ০ ০ ন্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা —া ণা । দা পা —া । মা —া —মা । জ্ঞা —া —ঋসা ॥
শে ষ্ ভা লো দাঁ ০ ড়া য়্ যা তে ০ ০০

দা দা ॥ দা দা —া । দা দণা —দা । —া —া —া । —া —া —া ।
য দি পি রি ত কর্ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ণা —া র্সা । ণা র্সা া । —া —া —া । —া র্সা সা
হ য় বা স না ০ ০ ০ ০ ০ ত বে

র্সা র্সা —ঋ ঋ —া । ঋ ঋ —া । —া —া —া । —া —া —া ।
ত বে সা ধু র কা ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ঋ —া জ্ঞ । —া ঋ —া । র্স —া —া । —া —া —া ।
জে ০ নে ০ লে ০ না ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্সা । র্সা র্সা —া । ঋা র্সা —া । ণা ণা —া । দা ণা —দণা ।
যে মন্ লো হা • তে প • র শে • সো না ••

পা পা ॥ ণা ণা —া । দা পা —া । মা মা —া । জ্ঞা —া ঋসা ॥
ও রে সে ম ত্ হ বে • তো মা •• তে • ••

দা দা ॥ দা দা —া । দা দণা —দা । —া —া —া । —া —া —া ।
এ ই ভ বে র্ পি রি ত্ • • • • • •

ণা —া র্সা । ণা র্সা —া । —া —া —া ।
ভূ তে র কে ত ন্ • • •

ঋা ঋা —া । ঋা ঋা —া । —া —া —া । —া —া —া ।
এক্ বা র্ বিচ্ ছেদ্ • • • • • • •

ঋা —া জ্ঞা । —া ঋা —া । র্সা —া —া । —া —া —া ।
এ ক্ বা র্ মি • ল ন্ • • • •

র্স র্সা । র্স র্স —া । ঋ র্সা —া । ণা —ণা —া । দা না —দণা ।
আ বার্ শে ষ্ কা লে তে • হ য় রে ম র্ •

—া —া —া । —া —া —া । —া —া —া । —া পা পা ।
• • • • • • • • • • ও রে

ণা ণা —া । দা পা —া । মা মা —া । জ্ঞা —া —ঋসা ॥
যে তে • হ য় মা ধা র্ প থে • ••

দা —দা দা । দা দণা —দা । —া —া —া । —া —া —া ।
এ ক পি রি তে• • • • • • • •

ণা ণা —র্সা । ণা র্সা —া । —া —া —া । —া —া —া ।
বি ভা গ্ চ ল ন্ • • • • • •

সা´ –া ঋা´ | ঋা´ ঋা´ –া | সা´ –া জ্ঞা´ | ঋা´ সা´ –া |
কে উ স্ব র গে ০ কে উ ন র কে ০

–া –া সা´ | ঋা´ জ্ঞা´ ঋা´ | সা´ –া –া | –া –া –া |
০ ০ ক র্ ছে গ ম ন্ ০ ০ ০ ০

–া –া –া | –া –া –া | –া –া –া | ।সা´ সা´ |
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শে ষে

সা´ –া সা´ | ঋা´ সা´ –া | ণা –া ণা | দা ণা –দণা |
তা ই না ভে বে ০ ব ল্ ছে লা ল ০ন্

–া –া –া | –া –া –া | –া –া –া | –া পা পা
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে

ণা ণা –া | দা –পা পা | মা মা –া | জ্ঞা –া –ঋসা ॥
কি ব ০ লে ০ লা জ গ ০ তে ০ ০০

গ.

'লালন পদাবলী'র প্রথম চরণের সূচী

এখানে আমরা বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত লালন পদাবলীর প্রথম চরণের বর্ণানুক্রমিক সূচী তৈরি করে দিলাম। প্রত্যেক চরণের শেষে যে সংখ্যা দেওয়া আছে তা-হচ্ছে বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা। 'রবীন্দ্র-ভবনে' রক্ষিত বানান অনুসরণে এই সূচীর বর্ণক্রম বিন্যস্ত হয়েছে।

ঘ.

প্রমাণ-পঞ্জী

১. মুহম্মদ আবু তালিব : 'লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা' : দু-খণ্ড : ১৯৬৭।

২. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান : ১৩৬৪।

৩. বসন্তকুমার পাল : মহাত্মা লালন ফকির : শান্তিপুর ১৩৬১।

৪. আবুল আহসান চৌধুরী : লালন স্মারক গ্রন্থ : ঢাকা ১৯৭৪।

৫. মতিলাল দাস সম্পাদিত : লালন গীতিকা : ক. বি. ১৯৫৮।

৬. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর : ৩য় খণ্ড : ১৯৬৭।

৭ আবুল আহসান চৌধুরী : কুষ্টিয়ার বাউল সাধক : ঢাকা : ১৯৭৪।

৮. আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার বাউল : ক. বি. ১৯৫৪।

৯. সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলার বাউল : কাব্য ও দর্শন : ১৯৬৪।

১০. ড. আনোয়ারুল করীম : বাউল সাহিত্য ও বাউল গান : ঢাকা ১৯৭১।

১১. ড আনোয়ারুল করীম : ফকির লালন শাহ : কুষ্টিয়া ১৯৭৬।

১২. আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার সাধনা : কলিকাতা ১৩৫২।

১৩. খোন্দকার রিয়াজুল হক : লালন সাহিত্য ও দর্শন : ঢাকা ১৯৭৬।

১৪. মৈত্রেয়ী দেবী : পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ : কলিকাতা ১৯৭০।

১৫. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি : ১ থেকে ৮ম খণ্ড।

১৬. Dr. S. Radhakrishnan : Philosophy of Rabindranath.

১৭. Rabidranath Tagore : Creative Unity : Calcutta 1971.

১৮ Prof. M. Mansooruddin The Folk Songs of Lalan : Dacca 1978.

১৯. আবুল আহসান চৌধুরী : কুষ্টিয়া : ইতিহাস-ঐতিহ্য : কুষ্টিয়া : ১৯৭৮।

২০. " ঐ : লোকসাহিত্য পত্রিকা : ১/১ [১৯৭৫]

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানুষের ধর্ম।

২২. শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী : শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ : ১৯৭৪।

বঙ্গ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি মহান সংযোজন

বাঘ ও সংস্কৃতি

বঙ্গের ব্যাঘ্র বিশ্বাস সম্পর্কে এমন সংকলনের কথা
এর আগে কেউ চিন্তাই করেননি

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র